গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র সমগ্র

অদ্রীশ বর্ধন

নাথ পাবলিশিং

আমার দেহান্তরিত স্ত্রী
দীপ্তি-কে

সূচী

যখন কিডন্যাপার

১. ডিভোর্সি ললনা কল্পনা চিটনিস

আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্র, লিখে যাচ্ছি আমার এই কাহিনি, নিজের কলমে। বড় গোপন কাহিনি যে। মৃগাঙ্ককে দিয়ে লেখালে সে তাতে জল মেশাবে অথবা কল্পনার রং মেশাবে। তার ওপর আছে কবিতা বউদির টিটকিরি। সে আর এক জ্বালা।

পুরুষ মানুষ যে ভীষ্ম হয়ে থাকতে পারে, সহজ এই ব্যাপারটা আমার এই অন্তর-টিপুনি দেওয়া বউদিটি কিছুতেই বুঝতে চায় না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা রাখতে হয় বইকি। নইলে কি সমাজের মধ্যে থাকা যায়? মেয়েরা আছে বলেই আমরা এই পুরুষরা টিকে আছি। নইলে কোনকালে ফৌত হয়ে যেতাম। তবে হ্যাঁ, একটু গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। সেটা একটা আর্ট। ঈশ্বরের কৃপায়, আমি সে আর্টে আর্টিস্ট।

কল্পনা চিটনিস গ্যাংটকের মেয়ে। মানুষ হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। বিয়ে করেছিল কলকাতার রবি রে-কে। ওদের একটা ছেলেও হয়েছিল। ছেলেটার নাম সোমনাথ। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সোমনাথের বয়স এখন দশ।

কল্পনা সিকিম-গ্যাংটক-ব্যাঙ্গালোর-কলকাতা-গুজরাতের কালচারে মিশ খাওয়া এক আশ্চর্য কন্যা। তার সবুজ পাথরের মতো আশ্চর্য চোখে যখন তখন সবুজ বিদ্যুৎ নেচে নেচে যায়। ঝকঝকে মুক্তোর মতো সারি সারি দাঁতে ফুটফুটে রোদ্দুর যখন তখন ঝলসে ওঠে। কথায় শোনা যায় জলতরঙ্গ, দেহতরঙ্গে মণিপুরী নৃত্য। বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বড় পোক্ত এই কল্পনা। একটা জীবন্ত প্রহেলিকা।

সে আমাকে ভালবাসে। আমি মনে মনে তা বুঝি। কিন্তু আমি তাকে স্নেহ করি, আমার ছোট বোনের মতো। সে জানে, আমি ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই সীমার বাইরে কখনও পা দেয় না। ফলে, আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কটা বড় মধুর---সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর।

কল্পনা আমার কাছে একদিন একটা প্রবলেম নিয়ে এসেছিল। আমি নাকি প্রবলেম-শুটার ওর চোখে। আমার কাছে আমি একটা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

সে যাক। কল্পনা এসে বললে, দাদা, ঘর তো ভাঙল। এখন ছেলেটাকে তো বড় করতে হবে।

আমি হুঁশিয়ার হয়ে গেলাম। বললাম, তা তো বটে। তা তো বটে!

কল্পনা নিশ্চয় থট-রিডার। মন-পঠন বিদ্যায় পোক্ত। সব মেয়েরাই তাই হয়। আমার মতে, ওদের অগোচর কিছু থাকে না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় শুধু ওদেরই আছে।

মুক্তো দাঁতে কাঞ্চনজঙ্ঘার কিরীট একটু দেখিয়ে আর হাসিতে অল্প কিরণ ছড়িয়ে কল্পনা বলেছিল, পাহাড়ি জায়গায় থাকতে হবে। ছেলেকে নিয়ে একলা থাকা যায়?

হুঁশিয়ার হয়ে গেলাম। বললাম, পাহাড়ি মেয়ে তুমি, পাহাড়ে থাকতে ভয় কিসের?

ও বললে, তা নয়, ইন্দ্রদা। এমনই একটা কাজ নিয়েছি, যে কাজে হামেশাই ঘরের বাইরে থাকতে হবে। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরার কাজ। বাড়িতে সোমনাথ একলা থাকবে কী করে? একা রেখে যাওয়াটা কি সমীচীন?

দেবকন্যা স্টাইলে এমনই ললিত ভঙ্গিমায় প্রস্তাবনাটা উপস্থাপন করেছিল কল্পনা যে, আমি কানাগলিতে আটকে গেছিলাম। স্মার্টলি বলেছিলাম, কী করতে হবে?

আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আলাদা ফ্ল্যাটে। কাছাকাছি দু'টো ফ্ল্যাটে।

ভাইবোনের মতো—ওর চোখের তারায় আমার ছায়া দেখতে দেখতে আমি সাত পাকে বাঁধা না থাকার আভাস দিয়ে গেছিলাম।

মধুর হেসে ও বলেছিল, আপনি বড় ভীতু। তাই হবে।

হ্যাঁ, আমি ভীতু। তাই হোক।

এই হল সূচনা। এই কাহিনির আগের কাহিনি। এবার আসা যাক আসল কাহিনিতে।

তারপর আমাদের এক অঞ্চলে থাকা শুরু হয়েছিল এমন একটা জায়গায়, যার পাশেই একটা গভীর খাদ।

ঘটনার শুরু যে সময়টা থেকে, সেই সময়টায় বড্ড বেশি শব্দহীন হয়েছিল অত গভীর খাদটা। শিকারি পাখি-টাখি ছিল না একটাও। অন্য সময়ে মাথার ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে যায় বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে—সেদিন কোনও আকাশচারীকে দেখতে পাইনি। বুনো কুকুরের মতো দেখতে নেকড়েগুলোর গান-টান শোনা যাচ্ছিল না। দরজার সামনের তালঢ্যাঙা পাইন গাছে যে প্যাঁচাটা থাকে, সেই মহাশয়ও আমার নাম-টাম জিজ্ঞেস করেনি। আমার চাইতে চৌকস যে কোনও মানুষ এই সবই যে আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস, তা আঁচ করে ফেলত নিশ্চয়। কিন্তু আমার ব্রেনে সেই সিগন্যাল আসেনি।

কনকনে ঠাণ্ডাটা বড় ভাল লাগছিল বলেই বুঁদ হয়েছিলাম। বহু নিচের গ্যাংটকের দিকে চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়েছিলাম। হিমালয়ের মহান সৌন্দর্য এমনই একটা আবেশ রচনা করে গেছিল মনের মধ্যে যে, এই নৈঃশব্দ্য যে, আওয়ান ডেঞ্জারের রেড সিগন্যাল, তা বুঝতে পারিনি। অথচ আমার বোঝা উচিত ছিল। আত্মহারা হয়ে যাওয়াটা আমার ধাতে নেই। সেদিন তা হয়েছিলাম। কাজটা ভাল করিনি।

হেঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, খতম হল ক'জন?

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছিল দুমদাম ঘুষোঘুষির আওয়াজ আর গাঁক-গাঁক চেঁচানির মতো গলাবাজি। সোমনাথের গলা ভেসে এল সব আওয়াজ ছাপিয়ে, কী?

তোর হিরোইন জানে মারল ক'জনকে?

কথাটা যার দিকে ছুঁড়ে দিলাম, সে রয়েছে আমার কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে। আমি কিচেনে, সোমনাথ লিভিংরুমে। তাই চেঁচাতে হল ফুসফুস ফাটিয়ে। ওকেও কথা বলতে হচ্ছে চিল-চিৎকার করে। এইভাবেই চলছে পাঁচদিন ধরে। কেন না, সোমনাথের মা সোমনাথকে সামলানোর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। মামা সামলাক ভাগ্নেকে। এর মধ্যে রঙ্গ কিসসু নেই। কিন্তু কঙ্গো ড্যাঙ্গে পোক্ত এই ভাগ্নেকে সামাল দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা।

আমি অবশ্য জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিকে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছি। গোয়েন্দাগিরি করে করে এত হেদিয়ে গেছি যে, লোকালয় থেকে কিছুদিন দূরে থাকতে পারলে বাঁচি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে দাঁড়ালাম লিভিংরুমের সামনে। বললাম, তোর ওই যন্তরে ভল্যুম কন্ট্রোল নেই? •

সোমনাথ তখন যে বস্তুটা নিয়ে তন্ময় হয়ে রয়েছে, তার নাম গেমস ফ্রীক। এতই নিবিষ্ট যে আমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সময়ও নেই। গেমস ফ্রীক এক হাতে, কন্ট্রোল নাড়ছে আর এক হাত দিয়ে। অ্যাকশন ফুটে ফুটে উঠছে বিল্ট-ইন কমপিউটার স্ক্রীনে। বস্তুটা ওকে দিয়েছি গতকাল। সেই থেকে এক নাগাড়ে খেলেই চলেছে। খেলুক। কিন্তু খুব যে একটা আমোদ পাচ্ছে, তা নয়। কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে আমারও।

খেলাটা এনে দিয়েছিলাম ওর খপ্পর থেকে একটু রেহাই পাওয়ার জন্যে। গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আমাকে নিয়ে যেত পাহাড়ি জায়গায়—মার্শাল আর্ট শেখবার মতলবে। আশ্চর্য এই মল্লশিল্প জানা থাকলে আখেরে কাজ দেয়। তাই ওকে কিছু কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছি। আবার সক্কালবেলা স্কুলেও নিয়ে গেছি, বিকেলবেলা স্কুল থেকে নিয়ে এসেছি। বাকি সময়টা সিকিমের রান্না রেঁধেছি। ব্রুস উইলির মুভি দেখেছি। মামা-ভাগ্নের অট্ট অট্ট হাসিতে ঘর প্রায় চৌচির হয়েছে। আর এখন গেছে আমার চোখের আড়ালে—যাতে আমি দেখতে না পাই। বিটকেল গেম যে ওকে খিটকেল করে তুলেছে তা তো মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। বসলাম পাশের সোফায়। বললাম, চল, এক চক্কর ঘুরে আসি।

প্রস্তাবটা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বের করে দিল বিচ্ছু সোমনাথ। আবার এলাম অন্য কথায়, আমার গপ্পো শুনবি? তোর মায়ের কথা?

আমার গপ্পো মানে ডেঞ্জারাস মানুষদের সঙ্গে আমার কাজ কারবারের কথা। এই তো সেদিন, গরমের শেষের দিকে, কল্পনা আর সোমনাথকে খুনের ফিকিরে ছিল ভুটিয়া গুণ্ডা দোঙ্গা জং। মানুষ মেরে বড় উল্লাস পায় দোঙ্গা জং। একেবারে পিশাচ। তার খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্যেই নাকি আমার দ্বারস্থ হয়েছিল কল্পনা। কি করে ফেরাই? জানি ও আমাকে মনে মনে ভালবাসে। ডিভোর্সের আগে থেকেই ওর মনে রং ধরিয়ে ফেলেছি আমার অজান্তে। সোমনাথের বয়স যখন

মাত্র ছ'বছর, তখনই আর পুরোনো বর নিয়ে ঘর করতে পারেনি কল্পনা। এই হিমালয় অঞ্চলেই দ্রৌপদী নামে একটা গোত্র আছে। বাড়ির এক বউ সব ক'টা ভাইকে বিয়েও করতে পারে। তিব্বতী আর নেপালি মেয়েরা তো এ ব্যাপারে অনেক আগুয়ান। রাখঢাক রাখে না সোয়ামি বদল করা বা একাধিক গোপন অথবা প্রকাশ্য সোয়ামি রাখার ব্যাপারে। কল্পনা চিটনিসের রক্তে রয়েছে সেই টান। ফলে, ছ'বছরের ছেলেকে নিয়ে ছেড়েছে এক স্বামীকে। খুনে গুণ্ডা পিছনে লেগেছে সেই থেকে। রঙ্গমঞ্চে আমার আবির্ভাব তারপরেই। ঠেঙারে ঠেকাতে। কিন্তু মালাবদলের ব্যাপারে আমি নেই। আমি যে ভীষ্ম। নির্ভেজাল। ব্যাসদেব নই। এই ভদ্রলোকের 'সৎকর্ম', মায়ের হুকুমে, কারও অজানা নয়। সুতরাং সেই পুণ্য প্রসঙ্গ থেকে বিরত রইলাম।

ট্যাঁটা সোমনাথ মা'কে নিয়েও কথা বলতে চাইল না আমার সঙ্গে। কথা ঘুরিয়ে দিল অন্যদিকে—ওই দ্যাখো, মামা। নষ্টরানি খেপেছে।

নষ্টরানি যাকে বলছে সে একটা কালিকা টাইপের মেয়েছেলে। যেমন কালো, তেমনি মারকুটে। এলো চুল পাকিয়ে পাকিয়ে বহু বল্লমের মতো ঝুলিয়ে রেখেছে পিঠে। ভীষণাকৃষ্ণা করাল রূপে একাই লড়ে যাচ্ছে তিন-তিনজন পেশিপুষ্ট জোয়ানের সঙ্গে। আশপাশে কাঁটা ঝোপ, দূরে দূরে খোঁচা খোঁচা পাহাড়। রুদ্রাণীর গলা চিরে যে হিস-হিস লড়াই-চিৎকার ঠিকরে আসছে, তা ইলেকট্রনিক হুঙ্কার...কিন্তু গায়ের রক্ত জল করে দেয়।

আমি বলেছিলাম, শয়তানের কারখানায় তৈরি মেয়েছেলে মনে হচ্ছে।

সোমনাথ বললে, বদলা নিচ্ছে রানি। ওর বোনকে যে বেচে দিয়েছে বদমাস মেয়ে-কারবারিরা।

বাচ্চাদের ইলেকট্রনিক খেলার মধ্যেও মেয়েপাচারের গল্প। গোল্লায় গেল দেশটা। আমার চোখের সামনেই করালী কন্যার ছুরির কোপে তিন দুশমনের রক্ত ছিটিয়ে গেল কমপিউটার স্ক্রীনে। বীভৎস।

কন্ট্রোলের স্টপ বোতাম টিপে-দিলাম। বন্ধ হল নারকীয় খেলা। বললাম, সোমনাথ, তুই আর তোর মা বিপদের মধ্যে আছিস। কিন্তু আমি তো আছি।

তুমি তো আগলে রেখেছ—আমাকে আর মা'কে।

আমার চোখে চোখে চেয়ে চেয়ে বলে গেল দশ বছরের সোমনাথ। সরল চাহনি। কিন্তু কথাটা বক্র। বহু রকমের অর্থবহ। যার ঔরসে জন্ম, মা তাকে ভালবাসে না। বাসে আমাকে। সোমনাথের তা অজানা নয়। ছোটরা বোঝে অনেক। ওদের মনের তল খুঁজে পায় ক'জন?

মনের ভেতরকার মোচড়টাকে বাইরে টেনে না এনে হাসিমুখে বললাম, মা তো ক'দিন পরেই ফিরবে। চ, খাবি চ।

খেলাটা শেষ করে নিই। নষ্টরানি কি মার মারছে, মামা।

দ্যাখ।

চলে এলাম কিচেন রুমে। শুনে গেলাম নষ্টরানির চিল-চিৎকার। বেধড়ক

পিঠছে। রসিয়ে রসিয়ে রণরঙ্গিনী সেই মূর্তি দেখছে সোমনাথ। নিশ্চয় মাকে কল্পনা করে নিচ্ছে সেই জায়গায়। দুশমন সংহার করছে মা।

মিনিট তিনেক পরেই মোবাইলে ভেসে এল কল্পনার কণ্ঠস্বর। কাজের মধ্যে একটু ফুরসৎ পেয়েই ছেলের খোঁজ নিচ্ছে। সামলাতে পারছি তো দামাল ভাগ্নেকে?

কল্পনা কাজ করে লোকাল টেলিভিশন স্টেশনে। নিউজ কমেণ্টেটর। এখানে সেখানে গিয়ে চালু ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে খবর বলে যায় মুখে মুখে। আইন পড়া আছে। পড়েছে ব্যাঙ্গালোরে। আমার সঙ্গে ওর আলাপ সেইখানেই। ডিভোর্সের আগে একটা কুটিল কেসের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গিয়ে।

ছেলের খবর নিয়ে আর আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেটা মিটিয়ে নিয়ে লাইন ডিস-কানেক্ট করে দিল কল্পনা।

গেলাম লিভিংরুমে, সোমনাথকে খবরটা দেওয়ার জন্যে। কিন্তু ঘর ফাঁকা। বাড়ির বাইরে গেলাম। এখানকার পাইন গাছের তলায় খেলতে ভালবাসে সোমনাথ। কিন্তু কেউ নেই সেখানে। মুখ হাঁ করে রয়েছে পাশের গিরিখাদ। হাঁক দিলাম গলা চড়িয়ে, সোমনাথ?

জবাব দিল না সোমনাথ।

মা টেলিফোন করেছিল। কাজ শেষ। এবার আসছে।

সোমনাথ নিশ্চুপ।

বাড়ির এ পাশ ও পাশ দেখে নিয়ে ফিরে গেলাম ভেতরে। গেস্ট রুমে উঁকি মারলাম। কেউ নেই। বাথরুমেও কেউ নেই। ফের গেলাম রাস্তায়। এ রাস্তায় গাড়ি আসে কম। পাশেই তো খাদ।

সোমনাথ! মা ফোন করেছিল। বাড়ি ফিরছে।

মায়ের ভয় দেখালাম। ছেলে কিন্তু অভিমানী। জবাব দিল না।

গঞ্জালো নামে এক বিদেশি ভদ্রলোক থাকেন পাশের বাড়িতে। এই দেশটাই এখন তাঁর স্বদেশ। মাতৃভূমির নাম মুখেও আনেন না। তাঁর দুই ছেলে সোমনাথের সমবয়সি। তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে সোমনাথ আমাকে বলে যায়। একটু নিচের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গেলেও আমাকে জানিয়ে যায়। খোলা রাস্তায় কদাচ যায়। খাদের ধারের সরু রাস্তার ওপর কল্পনার এই বাড়ি থেকেই খাদ দেখা যায়, তাই খাদের ধারেও ছেলেটা একা কখনও যায় না।

ফোন করলাম পাশের বাড়ির মিস্টার গঞ্জালোকে। সোমনাথ সেখানেও নেই। ঘড়ি দেখলাম। কল্পনা ফোন করেছিল চারটে বাইশে। এখন চারটে আটত্রিশ। এইটুকু সময়ের মধ্যে উবে গেল ছেলেটা। জানলা দিয়ে তাকালাম পাহাড়ের দিকে। কিন্তু পাহাড় তো ফাঁকা।

টেলিফোন এল মিস্টার গঞ্জালোর। তাঁর ছেলেরাও দেখেনি সোমনাথকে। উনি নিজেই বেরোচ্ছেন খুঁজতে। প্রতিবেশী সজ্জন হলেই জগত সুন্দর। সুতরাং আমার চিন্তা কিসের?

চিন্তা কিন্তু কুটকুট কামড় বসিয়ে গেল মনের মধ্যে। একটু পরেই পাহাড় থেকে ফোন করে গঞ্জালো সাহেব জানালেন, সোমনাথ ওখানেও নেই।

এবার আমি নিজেই উঁকি দিলাম খাদের মধ্যে। কিনারা খুব গড়ানে নয়। তবু যদি গড়িয়ে গিয়ে যায়, এই চিন্তায় নরম মাটিতে পা বসিয়ে বসিয়ে নামতে নামতে হাঁক দিলাম আবার, সোমনাথ, কোথায় তুই?

ঢালু খাদের এদিকে সেদিকে ওয়ালনাট গাছ আছে অনেক। ঠিক যেন খাদের বাঁকা আঙুল। সোমনাথকে অনেকবার গল্পচ্ছলে বলেছিলাম, এইসব গাছের গায়ে একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে নিলে খাসা হতো। তাই আবার ডাক দিলাম—সোমনাথ! কোথায় তুই?

মনে হল যেন অনেক দূর থেকে একটা গলা ভেসে এল। পা ভেঙে পড়ে আছে হয়তো কোথাও।

সোমনাথ! সোমনাথ!

গাছের পাতার খসখস আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। তারপরেই আবার গলাবাজি। যান্ত্রিক স্বর। এবার চিনলাম। গেমস ফ্রিক খেলার সেই কালিকারানি চেঁচিয়ে যাচ্ছে। গেলাম সেখানে। পেলাম গেমস ফ্রিক। সোমনাথ নেই।

কল্পনার চোখে মুখে নাকে চিবুকে সিকিমি টান থাকতে পারে, কিন্তু কথাবার্তায় খাঁটি বাঙালি। শিক্ষাদীক্ষা যে এই কলকাতায়। মঙ্গোলীয় বাঙালি ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছে। ফলে, সে সত্যিই একটা বস্তু। নইলে বাঙালি বর জুটিয়ে নেয়। এখন আমাকে কব্জায় আনার ফিকিরে আছে।

সোমনাথ দশে পা দিয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা বাংলা আর ইংরেজিতে চলনসই, কানাড়া ভাষাও জানে। স্কুলে শিখেছে। তাই একটা চিরকুটে বাংলায় লিখলাম, সোমনাথ, এখানে থাকবি। তোকে খুঁজতে যাচ্ছি।

চিরকুট রাখলাম কিচেন ঘরের মেঝেতে। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে গেলাম গিরিপথ দিয়ে ওকে খুঁজতে। সূর্য ঢলে পড়ছে। ছায়ার জগত বেড়েই চলেছে। যেন কালি ঢেলে ভরাট করা হচ্ছে খাদের গভীরতা।

হয়তো গোড়ালি মচকেছে ছেলেটার। খাদ বেয়ে উঠতে পারেনি। পা টেনে টেনে নেমে গেছে আরও নিচে। ঠাঁই নিয়েছে কারও ডেরায়। পাহাড় যে ওর আত্মীয়। পাহাড়েই আছে। উবে যায়নি। দশ বছর যার বয়স, সে এভাবে নিপাত্তা হয় না।

বাড়ির নিচের রাস্তায় পৌঁছে গাড়ি পার্ক করে রাখলাম। রাস্তায় নামলাম। আলো আরও তাড়াতাড়ি চম্পট দিচ্ছে। অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। চোখ চালাতে বেগ পাচ্ছি। হেঁকে ডাকলাম, সোমনাথ?

এখানে বাড়ি আছে তিনটে। প্রথম দু'টোয় নেই সোমনাথ। তৃতীয় বাড়ির মালকিন বললে, পিছনের চত্বরটা দেখে যেতে। না, সেখানেও নেই ছেলেটা!

আবার স্টিয়ারিং ধরলাম। দু'পাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি। একটার পর একটা

আলো জ্বলে উঠছে রাস্তায়। রাস্তা তো একটা নয়, অনেক। ছেলেটা কোন রাস্তায় সেঁধিয়েছে, বুঝব কী করে। মহা মুশকিলে পড়লাম। দু'বার গাড়ি দাঁড় করালাম। দু'জন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম। না, কেউ দেখেনি জিনস আর সোয়েটার গায়ে দেওয়া কোনও ছেলেকে। এদিকে যে ঠাণ্ডা বাড়ছে। সোয়েটার এখন যথেষ্ট নয়।

বাড়ি ফিরলাম। সোমনাথ ফেরেনি। রান্নাঘরের মেঝেতে চিরকুট পড়েই আছে। কেউ ছোঁয়নি।

টহলদার প্রাইভেট সিকিউরিটিকে ফোনে জানিয়ে দিলাম। পাহাড়ি অঞ্চল তো। বেআইনি কারবারের ডিপো। তাই প্রাইভেট সিকিউরিটির বেশ রমরমা।

অনেকটা হালকা হলাম। ওরা ফোনে ফোনে খবর নেবে। সজাগ হয়ে গেল গোটা অঞ্চল।

ঠিক এই সময়ে বাড়ি ফিরল কল্পনা। অনেকটা পথ এসেছে গাড়িতে। ব্ল্যাক বিজনেস স্যুট ধসকে গেছে। মুখে শ্রমক্লান্ত হাসি, সোমনাথ কোথায়?

ঘড়ি দেখলাম। ছ'টা বেজে দু'মিনিট। মোবাইলে কথা বলেছিলাম ঠিক একশো মিনিট আগে। বললাম, সোমনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কল্পনার মঙ্গোলীয় চোখ দু'টো একটু বিস্ফারিত হল। মুখে কথা নেই। মা যে। ভেতরে যে কি হচ্ছে, বাইরে ফোটাচ্ছে না। আমি ছোট্ট করে রিপোর্ট দিলাম। যা-যা করেছি ছেলেটার খোঁজে, সব বললাম। সব শেষে বললাম, এবার পুলিশকে জানানো দরকার।

টেলিফোনটা বেজে উঠল ঠিক এই সময়ে। কল্পনা ছিটকে যাওয়ার আগেই আমি গেলাম। রিসিভার তুললাম। অপর দিক থেকে অমার্জিত কণ্ঠস্বরে বললে, ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিশ্চয়? গুড। সোমনাথ এখন আমাদের খপ্পরে। ফিরিয়ে দেব। দাম চাই।

কত? গলা না কাঁপিয়ে বলেছিলাম।

ডিম, বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল ছেলে চোর।

২. অনিক্স পাথরের ডিম

আগের শীতে কলকাতার শিল্পমেলায় সেই প্রথম চিন আর পাকিস্তান আসর জমিয়ে বসেছিল। ছিল বাংলাদেশও। কিন্তু চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে শুধু পাকিস্তান। পাথরের শিল্পকর্ম দেখিয়ে। অনিক্স পাথর থেকে যে এত রকম জিনিস তৈরি হতে পারে, তা বুঝি জানা ছিল শুধু মোগল আমলে অথবা ভারত ভাগের আগে। এখন সে সব জিনিস আর আসে না। দেখার জন্যে হায়দ্রাবাদের সালারজাঙ মিউজিয়াম অথবা মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মারবেল প্যালেসে যেতে হয়। কিন্তু অনিক্স পাথর কুঁদে এত বিস্ময় সামগ্রী সে সব জায়গাতেও এমনভাবে জড়ো করা হয়নি, যে-ভাবে করা হয়েছিল ময়দানের শিল্পমেলায়।

ব্রিটিশ আমলে বাহারি কিন্তু বিপুল মূল্যের বস্তুগুলো চলে যেত প্রাসাদ সাজাতে। এখন যাচ্ছে গুজরাতি-মাড়োয়ারিদের অট্টালিকায়, আলিপুর-টালিপুর অঞ্চলের অভিজাত পরিবারদের বড় বড় নয়নসুন্দর সৌধগুলো তো তারাই কিনে নিয়েছে। গোটা বড়বাজার হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। উত্তর কলকাতাতেও অনুপ্রবেশ ঘটছে। এই পৃথিবীর সেরা দশ ধনীর নাম করতে গেলে কলকাতার এই আধুনিক ধনীদের নাম এসে যায়। তৃতীয়জনই তো মাড়োয়ারি নন্দন। খাস কলকাত্তাই পিলে। মিত্তাল।

ময়দানের শিল্পমেলায় এরা এসেছিল। ভিড় করেছিল তেহরান, ইরান, মুলতান, বেলুচিস্তান থেকে পাথরের কারিগর ব্যবসায়ীরা। স্টল উপছে পড়েছে তাদের চোখ ধাঁধানো শিল্প সামগ্রীতে—থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল স্টলের বাইরে—মাঠের ওপর।

কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল। কলকাতার নামযশ তো অকারণে হয়নি। মরু উদ্যান যে।

সেই সুনাম রক্ষাও করেছিল কলকাতা। হাত সাফাই বিদ্যায় মহাপটু শিল্পীরা ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দিয়েছিল তাবড় তাবড় রক্ষীদের বোকা বানিয়ে দিয়ে। কলকাতা যে সেরা ম্যাজিশিয়ানের শহর।

উধাও হয়ে গেছিল এক বাক্স অনিক্স পাথরের ডিম।

সাইজে হাঁসের ডিমের মতো, কিন্তু চেহারায় একটু অন্যরকম। সারা গায়ে রকমারি রঙের শিরা-উপশিরা। পাথরের বুক কেটে তৈরি তো, তাই। ঝিকিমিকি দ্যুতি সর্বাঙ্গে। এক-একটা বাক্সে সাজানো ছ'টা করে ডিম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে তাক লেগে যায়। বারে বারে দেখতে ইচ্ছে যায়। ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখতে ইচ্ছে যায়। দাম তো অতি সামান্য। মাত্র পঞ্চাশ টাকা—এক-একটা পিস।

শিল্পরসিক কিন্তু সীমিত রেস্তর বঙ্গতনয় এবং তনয়ারা এই ডিম কিনেছে অনেক। কিন্তু ছ'টি ডিম সমেত একটা প্যাকেট নগদ মূল্য দিয়ে এক ব্যক্তি নিয়ে যায়নি। ম্যাজিক দেখিয়ে মেরে দিয়েছে। ঈগলচক্ষু নজরদারিদের চোখে ধুলো দিয়ে।

বোধহয় ত্রাটক যোগে সিদ্ধ ছিল সেই ব্যক্তি। সেই যোগ, যার অভ্যাসে পুরাকালের মুনিঋষিরা সম্মোহন করতেন বনের পশুদেরও।

যোগী-তস্কর কিন্তু বড় অল্পে তুষ্ট: অনেক মূল্যবান অনিক্স পাথরের সামগ্রী নিচয় থেকে ভ্যানিশ করে দিয়েছিল শুধু ছ'টি ডিম। মাত্র ছ'টি ডিম।

সংবাদ মাধ্যমকে এই চৌর্য পর্ব জানানো হয়নি। তাহলে ঢি ঢি যত না পড়ত, তার চেয়ে বেশি সজাগ হয়ে যেত ডিম-জাদুকর। কিন্তু আমি জেনেছিলাম। কেননা, ডিম ছ'টা অনিক্স পাথরের খোলস ধারণ করে গোপন করে রেখেছিল পৃথিবী সেরা বেশ কিছু হিরে। সিকিউরিটিতে যারা ছিল, এ সংবাদ তাদের জানা ছিল না। জানানো হয়নি। জানতাম শুধু আমি। আমার ওপর সেই ভার দেওয়া হয়েছিল বলে।

না, আমার চোখে ধুলো দেওয়া যায়নি। আমি জানি সেই ডিমের গতিপথ, গন্তব্যস্থল এবং বর্তমান অবস্থান।

এই ডিমই চাওয়া হয়েছিল টেলিফোনে। সোমনাথ গায়েব হয়েছে এই কারণেই। অলমতিবিস্তরেণ। প্রসঙ্গটা নিয়ে সবিস্তার হওয়া যাবে পরে...যথাসময়ে। গুপ্ত রহস্য যে! যতক্ষণ গুপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তো এই কাহিনি পড়বেন। জেনে গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। কারণ, আমি লেখক নই বন্ধুবর মৃগাঙ্কর মতো!

৩. হিরে মাস্টার রবি রশ্মি

রবি রে আমার কলমের ডগায় এসে যাচ্ছে। ওকে নিয়ে দু'চার কথা না লেখা পর্যন্ত আমার এই কাহিনি প্রকৃত গতি পাবে না। ইংরেজিতে যা রে, বাংলায় তা রশ্মি। তার রশ্মি ছড়িয়ে আছে চমকদার এই উপাখ্যানের প্রতিটি পংক্তিতে। তার ছেলে গায়েব হয়েছে, কিডন্যাপার মুক্তিপণ চেয়েছে, আর কিছু নয়—ডিম। পাঠক এবং পাঠিকার, কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে এই ডিম প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ না লিখে পারেনি আমার এই নাছোড়বান্দা লেখনী। হিরেদের আত্মা যেন কলমে ভর করে লিখিয়ে গেল নিজেদের কাহিনি। অনিক্ষ পাথরের ডিম-কাহিনি।

কিন্তু সেইসঙ্গে এসে যাচ্ছে রবি রশ্মি কাহিনি। রবি যখন রায় পদবীকে কেটে ছেঁটে শুধু রে বানিয়েছিল, তার আগে থেকে ওকে আমি চিনি।

অবাক হওয়ার মতো ব্যাপারই বটে। যার ডিভোর্সি বউ এখন আমাকে কব্জায় আনার ফিকিরে গ্যাংটকের তুহিনশীতল পাহাড়ি অঞ্চলে নিবাস রচনা করেছে, আমি সেই রবি রে-কে চিনি এবং জানি তার কৈশোর থেকে।

এই কলকাতায়, আমি সেই আদি কলকাতার কথা বলছি, যেখানে একদা ক্রীক রো'র খাল বেয়ে নৌকো চালিয়ে এসে লর্ড ক্লাইভ সুরীজ ট্যাঙ্ক লেন দিয়ে হেঁটে বৈঠকখানার বটগাছতলায় হুঁকো টানার আসরে বসাতেন, সুপ্রাচীন সেই মধ্য কলকাতায় মুচিপাড়া নামে একটা অঞ্চল আছে। একসময়ে খুবই কুখ্যাত ছিল এই থানা অঞ্চল।

এই তল্লাটেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল রবীন্দ্ররঞ্জন রায়বর্মণ। বিশাল নাম। কিন্তু মানুষটার সাইজ অতবড় নয়। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইটের পাতলা ছিলছিলে একটা মানুষ। অতিশয় ডাকাবুকো। পাড়ার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে বড় হতে হতে সে অনেক কাণ্ড করে ফেলেছে। বোমা বেঁধেছে, বোমা মেরেছে, বেপাড়ার মস্তানদের মুচিপাড়ায় মস্তানি করতে দেয়নি। মেয়েদের সম্মান দিয়ে গেছে, মেয়েরাও ওকে বিপদ-আপদের পরম বন্ধু বলে জেনেছে।

কিন্তু অতবড় নাম নিয়ে কি কেউ বড় হতে পারে? জেট যুগে এ নাম অচল। তাই স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে যখন বেরিয়ে এল দামাল মানুষটা, তখন ওর নাম কাটছাঁট করে এসে দাঁড়ালো রবি রে'তে।

এইবার শুরু হল ওর অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক জীবনের আর এক পর্ব। মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভের কাজ নিয়ে গোটা ভারতে চক্কর মারার সময়ে বোম্বাইয়ের হিরে কারবারিদের সংস্পর্শে এসেছিল রবি রে। ওর মধ্যে যেন একটা ন্যাচারাল ম্যাগনেট আছে। অজানার দিকে ছুটে যাওয়ার ম্যাগনেট। যেখানে রহস্য, সেইদিকে ধেয়ে যাওয়ার প্রবণতা। ভারত ভ্রমণের এই চাকরিতে ঢুকেছিল আতীব্র এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই। বোম্বাইতে ওকে টেনে ধরল এই পৃথিবীর হিরে কারবারিদের আশ্চর্য দুনিয়া। হিরের টুকরো ছিল ছেলেবেলা থেকেই। এখন সে চলে গেল প্রকৃত হিরের জগতে...

সুদীর্ঘ সেই কাহিনি সবিস্তারে লিখতে গেলে, এই উপাখ্যান একটা থান ইঁটের মতো ভারি হয়ে যাবে। হিরের দুনিয়াটাই যে রোমাঞ্চকর। রোমাঞ্চ স্পৃহা যার প্রতিটি রক্তকণিকায় নৃত্য করে যায়, সে তো রোমাঞ্চময় হিরের কারবারের একদম ভেতরে ঢুকে যাবেই। অসম্ভব ডানপিটে, অসম্ভব কৌতূহলি, অসম্ভব উপস্থিত বুদ্ধির মানুষ রবি রে। তাই একটা সময়ে আপন রশ্মি বিকিয়ে দুনিয়া জোড়া হিরে আবাদের নাড়ি-নক্ষত্র আঙুলের ডগায় জড়ো করে নিয়েছিল।

শুরু হয়েছিল লোপাট হয়ে যাওয়া বিশাল এক হীরক খণ্ড থেকে। আকাটা হিরে। ওজন ২৬৬ ক্যারাট। পাঠক এবং পাঠিকার অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি, এক গ্রাম ওজনের এক পঞ্চমাংশ হল এক ক্যারাট।

বোম্বাইয়ের গদি থেকে বিপুলাকার এই হিরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গোপন তদন্ত অভিযানের প্রয়োজন হওয়ায় তলব পড়েছিল আমার। এই হিরে এসেছিল কঙ্গোর খনি থেকে। নিরুদ্দেশ হওয়ার পর সেই হিরেকে খুঁজে বের করেছিলাম নিউইয়র্ক সিটিতে। হিরের খোঁজে থেকেই কোটি কোটি ডলারের খনির খোঁজ পেয়েছিলাম, রক্তাক্ত সংঘর্ষের বিবরণ পেয়েছিলাম।

মূলে শুধু হিরে। কয়লা থেকে জন্ম নেওয়া একটা পাথর। মহাকাল বুঝি স্তব্ধ হয়ে যায় তার রূপের সামনে। রূপশ্রী হীরক। তোমাকে নমস্কার। হিরের ডিমের প্রসঙ্গে এবার ফিরে আসা যাক। এবং সে কাহিনি শোনানো যাক হীরক-কন্যা কল্পনা চিটনিসের জবানিতে।

৪. কল্পনার ছলনা কাহিনি

রবি আমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলত, কল্পনা আমার কল্পনা, ছলনাময়ী ললনা, কামরূপ থেকে কী শিখে এলে, বল না প্রিয়া, বল না!

আমি ওর বিদ্যুৎ চঞ্চল চোখে চোখ রেখে বলতাম, পঞ্চবাণ, পঞ্চবাণ!

ও বলত, কী নাম? কী নাম?

আমি বলতাম, সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন আর স্তম্ভন

ও বলত, তোমার ছোট ছোট চোখে তাই বুঝি এত বিদ্যুৎ।

আমি রেগে যেতাম। ওই একটি ব্যাপারে খোঁচা মারলে মেজাজ খিঁচড়ে যেত।

হ্যাঁ, আমার চোখ ছোট। একটু তেড়চাও বটে। মায়ের দিক থেকে পেয়েছি। মা ছিল হিমালয়ের মেয়ে। হিমকন্যাদের চোখ ওই রকমই হয়। দীঘল চোখ যাদের থাকে, তাদের মনের তল খুঁজে পাওয়া যায়। চোখ যে মনের আয়না। খুদে চোখে সেই মন সবটুকু ভেসে ওঠে না। আমারও ওঠে না। আমি গহন গভীর মনের অতল কোণে লুকিয়ে রেখে দিতাম আমার আসল চাহিদা। আমি চাই হিরে...এই পৃথিবীর জঠর থেকে তুলে আনা কঠোর পাথর, যার জলুস আর যার হিপনোটিক দ্যুতি বাড়িয়ে দিক আমার কামরূপ বিদ্যা।

না, কামরূপ-টামরূপ আমি যাইনি। কিন্তু চলমান চুম্বকের মতো যে কোনও পুরুষকে আমি টেনে ধরে নিংড়ে নিতে পারি। তাতেই আমার আনন্দ, তাতেই আমার আবেশ।

রবি রশ্মিকে আমি টেনে ধরেছিলাম ঠিক এই মতলবেই। সে যে নিখাদ হিরে, তা তো আমার জহুরি চোখ দিয়েই যাচাই করে নিয়েছিলাম। আমরা মেয়েরা এই একটি ব্যাপারে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা রাখি। বিশেষ করে আমি রাখি। কারণ আমি হিমালয়ের মেয়ে। পুরাণ-টুরাণে আমাদেরকেই বলা হয়েছে বিদ্যাধরী। হিমলোক থেকে নেমে এসে মর্ত্যলোকের সুধা পান করে গেছি চিরকাল। করছি এখনও, নিংড়ে নিচ্ছি এই হীরক-যুবক রবি রে'র সত্তা থেকে।

নানান নিভৃত জায়গায় প্রেমালাপের সময়ে রবি আমাকে বলে গেছে ওর হীরক অনুসন্ধানের শিহরণ জাগানো কাহিনি। ওর মুখেই শুনেছি, হিরে ওকে টানে...ওর অণু-পরমাণুতে টান ধরায়। ও বোধহয় আগের জন্মে জহুরি ছিল...মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে হিল্লিদিল্লি ঘুরতে ঘুরতে বোম্বাইয়ের জহর বাজারে যেদিন থেকে ঢুকেছে, সেইদিন থেকে পূর্ব-পূর্ব জন্মের নেশা যেন ওকে পাগল করে দিয়েছে। ও যখন হিরে নিয়ে কথা বলত, তখন সত্যিই যেন ও আর এক মানুষ হয়ে যেত...ওর চোখের তারায় তারায় হিরের জলুস, হিরের কিরণ, হিরের কাঠিন্য দেখতে পেতাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিরের কাঠিন্য। কঠিন কঠোর কুলিশ কালো হয়ে যেত ওর দুই কনীনিকা। ওর অতীত আমি জানি। আমাকে বলেছে। মরণকে ও ডরায়নি। আজও ডরায় না। তাই প্রাণের পরোয়া না করে হিরের টানে ঢুকে গেছিল হিরের জগতে।

ময়দানে বসে একদিন ও পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, কল্পনা, হিরে ছুঁইয়ে তোমাকে বরণ করলাম।

আমি আমার ছোট ছোট চোখে বিপুল বিস্ময় জাগিয়ে বলেছিলাম, হিরে ছুঁইয়ে? ছোঁয়ালে তো রুমাল।

ও বলেছিল, হাত পাতো।

আমি পেতেছিলাম। রুমাল ঝেড়ে একটা হিরে আমার হাতে ফেলে দিয়েছিল দুষ্টু রাজা রবি রে। আমার ওই ছোট্ট ছোট চোখ জোড়া নিশ্চয় সেদিন পদ্মদীঘির মতো বড় হয়ে গেছিল। পড়ন্ত রোদে যেন হাজার সূর্য ঝিকমিকিয়ে উঠেছিল আমার হাতের ছোট্ট তেলোয়।

অপলকে চেয়েছিলাম চৌকোণা ধোঁয়াটে সাদা পাথরটার দিকে। বলেছিলাম, অস্ফুট স্বরে, হিরে! এইরকম!

ঠোঁটের কোণে কোণে ওর সেই বিচিত্র কুহেলি হাসি ভাসিয়ে রবি বলেছিল, আরও আছে। দেখবে? বলে, আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করে ঘাসের ওপর রুমাল পেতে, ছোট্ট একটা ডিবে বের করেছিল পকেট থেকে। নিতান্ত অবহেলায়। ডিবে উপুড় করে দিয়েছিল রুমালের ওপর।

স্তম্ভিত নয়নে দেখেছিলাম রাশিকৃত খুদে হিরে। বিষম তাচ্ছিল্যে খুদে বজ্রমণিদের সাজিয়ে একটা পিরামিড তৈরি করেছিল আমাকে বোবা বানিয়ে রেখে!

'বজ্রমণি' শব্দটা ওর কাছেই শিখেছিলাম। ওষুধের কারবারে নেমে হিরে নিয়ে ওর এই মাতামাতি প্রথম প্রথম আমার ভাল লাগেনি। বেপরোয়া ও চিরকাল, ওর মুখেই শুনেছি, যা ভাল মনে করেছে। তাই করেছে। কারও কথায় কান দেয়নি। কিন্তু হিরের জগতে এইভাবে যে ঢুকে গেছে, তা তো জানতাম না।

আমার ছোট ছোট চোখের বিস্ময়-বিস্ফোরণ দেখতে দেখতে রবি বলে গেছিল—কল্পনা, কুচি কুচি এই হিরেদের প্রত্যেকের একটা করে ইতিহাস আছে।

আমি বিহ্বল গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, পেলে কোত্থেকে?

কঙ্গোর অ্যাংগোলান হিরের খনি থেকে।

কঙ্গোর হিরে! কলকাতার ময়দানে!

ও আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। বলে গেল আপন মনে—অকট্যাহেড্রাল পাথর। প্রত্যেকটায় আছে আটটা দিক—প্রতিটা দিক সমান মাপের। অষ্টহস্ত পাথর—হিরে...আমার হিরে!

যেন আবিষ্ট গলায় কথা বলে যাচ্ছিল রবি রে...সেইদিন...সেই পড়ন্ত রোদের রোশনাইতে দুই চোখের হিরে ঝিকমিকিয়ে পকেট থেকে বের করেছিল একটা ছোট্ট ডিজিট্যাল স্কেল—দাঁড়িপাল্লা আর একটা পরিষ্কার সাদা কাচ। হিরের পিরামিডের পাশে রেখেছিল এক-তা সাদা কাগজ। খুদে চিমটে দিয়ে একটা হিরে তুলে নিয়ে কাচের প্লেটে রেখে, কাচটা রেখেছিল সাদা কাগজের ওপর।

বলেছিল, কল্পনা, এইভাবেই দেখতে হয় হিরের মধ্যে কলঙ্ক আছে কি না।

ফস করে আমি বলে ফেলেছিলাম, যেমনভাবে দেখেছ আমার ভেতরটা?

তুমি? নিষ্কলঙ্ক হিরে...আপন মনে, যেন ঘোরের মাথায় বলে গেছিল হিরে-পাগল রবি রে। প্রেমে পড়লে পুরুষমাত্রই অন্ধ হয়ে যায়। আমার মতো কাচকে তাই হিরে ভেবে নিয়েছিল। মেয়েরা চিরকাল এইরকমই হয়। এই আমার মতো। মুনিঋষিরও মতিভ্রম ঘটে।

মরুক গে। হিরের কথায় আসা যাক।

খুদে চিমটে দিয়ে আর একটা হিরে তুলে নিয়ে আমার পলকহীন খুদে চোখের সামনে নাড়তে নাড়তে আবিষ্ট স্বরে বলে গেছিল হিরে ধুরন্ধর রবি রে—এটার নাম আকবর।

আকবরের হিরে নাকি?

ন্যাকার মতো কথা বলো না। আকবর হিরে-সমঝদার ছিলেন বলেই তাঁর স্মৃতি রাখবার জন্যে এর নাম মাকবর।

দাম?

কথাটা তুলেও তুলল না রবি। বলে গেল আপন মনে—বড় কঠিন...বড কঠিন এই হিরেরা—এদের গায়ে আঁচড় কাটতে হলে চাই আর একটা হিরে...হিরে ছাড়া হিরের গায়ে দাগ কাটতে কেউ পারে না।

কেউ পারে না বললে কেন? চোখের চকমকিতে ঝিলিক ছিটিয়ে আমি বলেছিলাম।—আমি তো পেরেছি।

চোখে চোখে চেয়ে রবি রে বলেছিল, কারণ তুমি নিজেই যে বজ্রমণি।

আমি কিন্তু সেদিন, সেই ময়দানে, সূর্যদেবের পাটে বসার আলোয়, রবির চোখে দেখেছিলাম খুদে খুদে বজ্রমণি।

বজ্রমণি চোখেই আমার দিকে অনিমেষে চেয়ে থেকে ও বলে গেছিল, হিরে মহাশয়দের আর একটা গুণ আছে, কল্পনা।

কি গুণ, হে মোর বজ্রমণি?

বড় ঠাণ্ডা—বড় ঠাণ্ডা। ছুঁলেই হাত থেকে তাপ টেনে নেয়।

যে ছোঁয়, তাকেও পাথর বানিয়ে দেয়?

হ্যাঁ।

আজ, এতদিন পরে সন্দেহ হয়, রবি রে কি নসত্রাদামুস বিদ্যে জানে? ভবিষ্যৎ দেখতে পায়? আমি, এই কবোষ্ণ কল্পনা, একদিন যে কঠিন প্রস্তর হয়ে যাব—তা কি ও দিব্য নয়নে দেখতে পেয়েছিল? নাকি, আলগোছে বলে ফেলেছিল আমাদের নিয়তি! কে জানে!

৫. পেশোয়ারের পাথর

আমার এই ভাঙা কলম উসখুস করছে আমার কথা জবানিতেই লেখবার জন্যে। মৃগাঙ্ক বলে বটে, কলম নাকি নিষ্প্রাণ থাকে না কাগজে চরণ ছোঁয়ালেই। আরবি অশ্বের মতো তখন কলম ছোটে, সূক্ষ্মজগত থেকে অযুত শক্তি এসে কলমে ভর করে। কলমকে প্রাণময় করে দিয়ে তারা লিখিয়ে নেয় অনেক...অনেক মহাসত্য—যা সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়। লেখনীমনস্ক মানুষরা তাই প্রপঞ্চময় দুনিয়া সৃষ্টি করে যায় অনায়াসে—নিজেদের অজান্তে।

ও একটু বাড়িয়ে বলে, একটু কেন, বেশ বাড়িয়ে বলে। যে যার নিজের কোলে ঝোল টানে। তবে হ্যাঁ, মৃগাঙ্ক যখন লেখে, তখন দেখেছি, ও যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। আমাকে চিনতে পারে না, নিজের অমন দশরূপা বউকে চিনতে পারে না—আমি তো ছার।

যে দশা এই মুহূর্তে আমার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমি তো কলমবাজ কস্মিনকালেও ছিলাম না। বকমবাজ আর বন্দুকবাজ বলে বিস্তর দুর্নাম আছে বটে,

বউদি কবিতা আমাকে যখন তখন আর একটা বিষয়ে বিষমবাজ বলে—সে শব্দটা 'মা' অথবা 'মা' দিয়ে শুরু। শরৎ সাহিত্যে এই শব্দটা যখন তখন এসে গেছে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে তা অচল। অশ্লীল। দরকার কি? বিশেষ করে, বিশেষণটা যখন সর্বৈব মিথ্যে! বউদিরা স্নেহের দেওরদের অমন বচন বিশেষণে যখন তখন ভূষণ পরায়।

সত্যিই আমি অ-লেখক। কি লিখতে বসে, কি লিখছি। একেই বলে কুষ্মাণ্ড রচনা।

হিরে নিয়ে রবি রে মেতেছিল বোম্বাইয়ের হিরের বাজারে ঘুর ঘুর করার সময়ে। ওর ব্যক্তিত্ব আছে, বাহাদুরি আছে, কোথাও ছুঁচ ঢোকানো ছিদ্র পেলেও অনুসন্ধিৎসার আকর্ষণে নিমেষে অন্দরে প্রবিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এইভাবেই পেশোয়ারের পাথরের সন্ধান ও পেয়েছিল।

সে পাথর হিরে পাথর। আফগানিস্তানের বর্ডারে, পেশোয়ারের রুক্ষ পর্বতময় এক পরিত্যক্ত দুর্গ প্রাসাদে পড়ে থাকা এক কাঁড়ি আকাটা হিরে পাথর! ধূমল পাহাড়ের বিবর থেকে তুলে এনেছিল নক্ষত্রপ্রতিম পাথরদের।

গায়ের রক্ত চনমনে করে তোলার মতো সেই কাহিনি রবি রে আমাকে শুনিয়েছিল এই কলকাতায় বসে—যখন আর একটা সজীব পাথরের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রয়েছে। কল্পনা...কল্পনা যে কি বস্তু—তা আগের অধ্যায়ে লেখবার চেষ্টা করেছি; মাকবর হিরে ওকেই প্রথম দেখিয়েছিল ময়দানের ঘাসের কার্পেটে বসে। বুকের পাটা আছে বটে। যে মরুদ্যান ময়দানে চোর-ছ্যাঁচোড় থুক থুক করছে, সেই ময়দানে বসে প্রেমিকার চোখে কীর্তিমান হওয়ার জন্যে ফস করে দেখিয়ে ফেলেছিল মাকবর হিরে।

সে যাক, প্রেমে পড়লে সব পুরুষই গর্দভ হয়ে যায়। আমি বাদে। আমি কখনও প্রেমে পড়িনি। পড়িয়েছি অনেককে। কার্যসিদ্ধির জন্যে। যেমন এই কল্পনা চিটনিসকে। বিশেষ মতলবে। এবং তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

এই মুহূর্তে আসা যাক হিরের জগতে।

রবিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—তুই চিরকাল মারকাটারি মানুষ, তা আমি জানি। কিন্তু লোভী নোস। হিরের টানে হঠাৎ পাগল হয়ে গেলি কেন? ছিলিস তো ওষুধ নিয়ে—

রবি রে ওর সেই বিখ্যাত খলিফা হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে বলেছিল, ইন্দ্র, আমি চাই অজানাকে জানতে। আমি চাই অ্যাডভেঞ্চার। হাজার হাজার বছর ধরে হিরে রয়েছে অনেক...অনেক অ্যাডভেঞ্চারের মূলে। অনেক চক্রান্ত, অনেক যুদ্ধ, অনেক যশ, অনেক অর্থ, অনেক অনর্থর মূলে। হিরে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি টানে—

আমি হেসে বলেছিলাম, বুঝেছি।

রবি শক্ত চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। ওর র‍্যামবো মার্কা ফিগারে চোখ দু'টো যেন দু'টুকরো পাথর। সেই পাথরে প্রাণের আভাস নেই। চেহারাখানা জাঁদরেল। কুস্তি, যোগব্যায়াম, যুযুৎসু, সাঁতার—এইসব করে ছেলেবেলা থেকেই

নিজেকে জ্যান্ত কৃপাণ বানিয়ে রেখেছে। ও বেপরোয়া, মরণের ভয় নেই, কিন্তু জানার স্পৃহা অফুরন্ত।

তাই শক্ত চোখে আমার দিকে যখন চেয়ে রইল, আমার মনে হল, হিরে-পিপাসার শেকড়টা রয়েছে অন্যত্র—নিছক রূপসী আকর্ষণের জন্যে নয়।

চোখে চোখে চেয়ে বলেছিলাম, সোজা কথায় বল, ওষুধের মার্কেট ছেড়ে হিরের মার্কেট ধরলি কেন?

সেই প্রথম হিরের ঝলক দেখলাম ওর চোখে।

বললে, মার্কেট? দ্যাটস দ্য ওয়ার্ড! মার্কেট! ইন্দ্র, তুই অনেক জানিস, কিন্তু জানিস না, কি বিরাট মার্কেট গড়ে উঠেছে এই হিরে নিয়ে। হিরে নাকি অভিশপ্ত: হোক। কিন্তু হিরে আনে টাকা। টাকার ডোবা নয়, পুকুর নয়, হ্রদ নয়—টাকার সমুদ্র। আমি সেই সমুদ্র রচনা করতে চাই এই দেশে—এই গরিব ভারতে—যে ভারতের সম্পদ শুষে আজ অন্য দেশগুলো ধনী হয়েছে।

ওর গলা কাঁপছিল। চোখ জ্বলছিল। আমি চুপ মেরে গেছিলাম। উসকে তো দিয়েছি।

আত্মগতভাবে বলে গেছিল রবি—পেশোয়ারের পাথর! পেশোয়ারের পাথর! রুক্ষ পাহাড়ি জায়গায় ভাঙা কেল্লার পাথর চাপা গুহায় আকাটা হিরের স্তূপ। ভাবা যায়?

টুকুস করে বলেছিলাম—গুপ্তধন?

কথার রাশ টেনে ধরেছিল রবি তৎক্ষণাৎ। বুদ্ধদেব স্টাইলে অর্ধনিমীলিত নয়নে আমার দিকে চেয়েছিল। তারপর বলেছিল—সেই প্রসঙ্গে আসবার আগে তোকে বলব, শুধু তোকে বলব, আমি কী দেখে এসেছি, কী শিখে এসেছি—গোটা পৃথিবীটায় চক্কর দিয়ে।

ডেঞ্জারাস ডায়মণ্ড দুনিয়ার অতি শ্বাসরোধী কাহিনি বলে গেছিল তার পরেই।

ডায়মণ্ড! ডায়মণ্ড! ডায়মণ্ড! নিছক কয়লা থেকে তো তোমার জন্ম ধরিত্রীর জঠরে, কিন্তু কল্পনাতীত একী সাম্রাজ্য রচনা করেছ তোমার অকল্পনীয় ঐশ্বর্য দিয়ে?

৬. ডায়মণ্ড কাহিনি ও বর্ণময় রবি রে

দুর্দান্ত ভিলেন হলেও সিনেমায় হিরো হয়ে যেতে পারত রবি। কিন্তু ভাল মানুষের চরিত্র নিয়ে ভিড়ে গেছিল কল্পনা চিটনিসের সঙ্গে।

কিন্তু সেটা পরে। তার আগে...

তরতাজা যুবক রবি রে প্রথম থেকেই নজর কেড়েছিল বম্বের জহুরিদের। ওর চেহারা, ওর গলার আওয়াজ—সব কিছুই মার্কামারা। হীরক বাণিজ্যের অন্ধকার দিকটায় এমন একটা ক্যারেক্টারকে খলনায়ক হিসেবে নামিয়ে দেওয়া যায় কিনা, ভেবেছিল হিরে বাণিজ্যের জাদুকররা।

দুর্দান্ত অভিনেতা রবি রে সেই ভূমিকা নিয়েই ঢুকে গেছিল হিরের আড়ালের অন্ধকার জগতে। এটা ছিল একটা ইমেজ। সেটা ভাঙিয়েছে। বেঙ্গল ব্রেন তো! আবার অন্য ভূমিকায় কল্পনা চিটনিসের মনের জগতে তুফান রচনা করে গেছে। কখনও সে ব্যাডম্যান, কখনও গুডম্যান। বিশাল চেহারা, চোখের অদ্ভুত এক্সপ্রেশন, আর গম্ভীর গলার স্বর দিয়ে নাচিয়ে মজিয়ে ফিনিশ করে দিয়েছে হিমালয় কন্যাকে।

আর, ব্যক্তিত্বের এই চাবিকাঠি কাজে লাগিয়েই ঢুকে গেছিল ঝকমকে হীরক সাম্রাজ্যের তমসাময় নিতল আলয়ে...

হিরে, হিরে, হিরে! পাথর, কিন্তু নিরতিশয় ঘন। এত ঘন যে সবশক্তিমান সূর্যদেবের কিরণকেও অক্লেশে যেতে দেয় না নিজের ভিতর দিয়ে। আলোর গতিবেগ ব্যাহত করবার ক্ষমতা যদি কারও থাকে, তবে তা আছে এই হিরে নামক পাথরের। একটু রুখে দেয় আলোর স্পীডকে...সূর্যালোক তখন তিনভাগে একভাগ গতিবেগ হারায়। তিন ভাগের দু'ভাগ স্পীড নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে যায় অপর দিক দিয়ে—এরই নাম হিরে। আশ্চর্য পাথর হিরে। পৃথ্বী-জঠরের নিরেট প্রস্তর—হিরে...চমকদার হিরে!

সুপ্রাচীন কাল থেকে এই হিরে সাম্রাজ্যকে গড়ে নিয়েছে মা পৃথিবী। মানুষ মায়ের গর্ভে যেমন তিল তিল করে বেড়ে ওঠে মানব শিশু, পৃথিবী জননী সেই প্রক্রিয়ায় না গিয়ে বিপুল চাপের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করেছে গর্ভের ঐশ্বর্যদের। টাইটানিক প্রেসার দিয়ে যায় কার্বনের ওপর। সেই সঙ্গে বিপুল তাপ। পৃথিবী যখন তরুণী, এই কাণ্ড করে গেছে তখনই। রচনা করেছে হিরে। এবং...

লুকিয়ে রেখেছিল গর্ভের গভীরতম স্তরে...কন্দরে কন্দরে...প্রায় দশ কোটি বছর আগে। তারপর উগরে দিয়েছে গলিত পাথরের সঙ্গে। যে পাথরের নাম কিমবারলাইট।

গাজর আকারের বিস্তর সরু সরু ফানেলের মধ্যে গর্ভজাত কিমবারলাইট শীতল হয়েছে একটু একটু করে। ভূ-স্তর থেকে ঠেলে বেরিয়ে থেকেছে গাজর-সদৃশ এই হীরক আধারদের স্থূল গোলাকৃতি দিকগুলো। লক্ষ লক্ষ বছরের বৃষ্টি আর ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য একটু একটু করে ক্ষইয়ে দিয়েছে কিমবারলাইট পাথরের ভূ-স্তরের দিক...

হিরে-প্রসব ঘটেছে তখনই। ধরণীর ওপরের স্তরে ছড়িয়ে গেছে হিরে...জলস্রোতে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে জমা হয়েছে নদীর তলায় অথবা নরম মাটিতে, যে মাটির নাম লুণ্ডাসুল...

চোখের হিরে নাচিয়ে নাচিয়ে হিরে সৃষ্টির কাহিনি শুনিয়ে গেছিল 'বাংলার বাঘ' রবি রে। বলেছিল, লাকি হিরে সন্ধানীরা এই পাথরদেরই খুঁজে খুঁজে ঘরে তুলেছে, খদ্দের জুটিয়েছে। খনি থেকে তুলে এবড়ো-খেবড়ো শ্রীহীন এই পাথরদের জন্যেও হামলা চালিয়েছে হিরে ডাকাতরা। জলুস নেই যেসব পাথরের,

হিরে-জহুরিরা সেইসব শ্রীহীন পাথর কব্জায় আনবার জন্যে অনেক অমানুষদের মোতায়েন করেছে। ইন্দ্র, হিরে তাই বুঝি একাধারে লক্ষ্মী আর অভিশাপ।

গলা কাঁপছিল রবির। আমি বাগড়া না দিয়ে শুনে যাচ্ছিলাম। কথা বলার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছিল—ওর সম্মোহনী কথার তোড়ে...

তারপর রেখেছিলাম ছোট্ট একটা প্রশ্ন—রবি, হিরের মধ্যে আছে রোমান্স, আছে শক্তি, আছে বিউটি, আছে সম্পদ। তাহলে কেন এই পৃথিবীর যে কোনও জিনিসের চেয়ে এই হিরে জিনিসটা মানুষের কল্পনায় এমন আগুন ধরিয়ে দেয়, নিচ স্পৃহাগুলোকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দেয়?

রবি তখন যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। আমার প্রশ্নটা কানের মধ্যে দিয়ে মাথায় ঢুকে সঙ্গত বৈদ্যুতিক ছন্দ নির্মাণ করতে একটু সময় নিল। যা ঘটে নিমেষে, তা ঘটল একটু দেরিতে। হিরে এমনই জিনিস। চিন্তার গতিকেও মন্থর করে দেয়, যেমন করে আলোর গতিকে। তারপর শুনিয়ে গেছিল অনেক..অনেক ব্যাখ্যা। অলৌকিক রহস্য থেকে শুরু করে মানুষের কদর্য লালসা—কিছুই বাদ দেয়নি। হিরে রয়েছে সব কিছুর মূলে। মানুষকে পিশাচ বানিয়ে দিচ্ছে হিরে—যার এক-এক কণায় বিধৃত রয়েছে অসংখ্য সৌন্দর্য-কণা।

হিরে...অব্যাখ্যাত রহস্যের আধার হিরে।

কোনও জবাবই আমার মন ভরিয়ে দিতে পারেনি। রবি নিজেও আজও খুঁজে পায়নি—হিরে মানুষকে কেন এভাবে টানে। এ এক আশ্চর্য আকর্ষণ।

প্যারিস শহরে প্রদর্শনী হচ্ছিল। রবি ছিল সেখানে। রগড় দেখবার জন্যে নয়, মার্কেট যাচাই করার জন্যে। তুমুল বৃষ্টি তখন ধুইয়ে দিচ্ছিল গোটা শহরটাকে। বরুণদেবের বিষম নৃত্যকে উপেক্ষা করে মহিলারা দলে দলে কেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিরে দেখবার জন্যে, সকৌতুকে এই প্রশ্ন করেছিল রবি।

চোখের হিরে নাচিয়ে নাচিয়ে সুন্দরীরা বলেছিল, নক্ষত্র। নক্ষত্র! হিরে যে আদতে নক্ষত্র!

রূপসীদের চোখে হিরে নিছক তারকা হতে পারে, হিরে কারবারিদের কাছে হিরে মানেই টাকা' টাকার পাহাড়! মণি থেকে মুদ্রা—বিপুল পরিমাণে। নইলে বুলডোজার চালিয়ে লণ্ডনের মিলেনিয়াম ডোম তছনছ করতে যাবে কেন হিরে ডাকাতরা? দু'হাজার সালের নভেম্বরে ঘটেছিল পিলে চমকানো এই ডাকাতি। 'খ' করে দিয়েছিল হিরে বণিকদের। রবি রে'র দর বেড়েছিল এই ঘটনার পর থেকেই। ওর ওই র‍্যামবো মার্কা ফিগারটার জন্যে।

৭. যমজ হিরে

অভিশপ্ত এই হিরে জগত বড় বেশি টেনে ধরেছিল রবিকে। তাই বুঝি এমন মন্দ ভাগ্য কৃষ্ণমেঘ রচনা করে গেছে ওর বিবাহিত জীবনে। মনে হয় বুঝি এক

কল্পিত নাটক, যার মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটাও নেই। নিছক মিথ্যানৃত্য নিয়ে বুঝি রচনা করতে বসেছি এই কাহিনি।

কিন্তু তা তো নয়। হে পাঠক, হে পাঠিকা, বিশ্বাস করুন, এই আপাত আজব কাহিনি অলীক নয়। রত্তি পরিমাণেও। শিহরণ যদি জাগ্রত হয়, জানবেন তার মূলে আছে নিখাদ সত্য...এবং তা অবিশ্বাস্য।

হিরে নিয়ে, হিরের জন্মকথা নিয়ে শ্বাসরোধী ঘটনামালা সাজিয়ে যাওয়ার পরেই পকেট থেকে একটা পেপার প্যাকেট বের করে আমার সামনে রেখেছিল হিরে বণিক রবি রে। আদতে হিরে বণিক—মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ তার বহিরাবরণ। ছদ্মবেশ। বড় খলিফা...বড় ধুরন্ধর এই রবি রে।

পেপার প্যাকেটটা আমার সামনে রেখে দ্রিমি দ্রিমি মন্থর স্বরে রবি বলেছিল, ইন্দ্র, অ্যাংগোলায় যারা হিরে খুঁজে বের করে, এদের বলা হয় গ্যারিমপিরোস। জাতে এরা পর্তুগিজ। একদিন মোলাকাত ঘটল এমনই এক গ্যারিমপিরোসের সঙ্গে। পরনে টি-শার্ট আর জিনস। এই যে পেপার প্যাকেটটা তোর সামনে রাখলাম, এটা পেয়েছিলাম তার কাছেই।

প্যাকেট খুলে বের করেছিল একটা হিরের দানা—মুরগিকে যে দানা খেতে দেওয়া হয়—সাইজে চেহারায় সেইরকম।

এই দ্যাখ। বলে, পেপার প্যাকেট খুলে হিরের দানাটা আমাকে দেখিয়েছিল রবি রে। চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছিলাম আমি।

রবি আমার নিথর চক্ষু তারকার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে গেছিল—ইন্দ্র, ছোট্ট এই পাথরটার ওজন সাড়ে তিন ক্যারাট। আদতে হিরে কিনা, তা যাচাই করার জন্যে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল টেন পাওয়ার ম্যাগনিফাইং গ্লাস—হিরে বাণিজ্যে যে জিনিসটা অপরিহার্য। হিরে চিনতে হলে, বিশেষ এই আতস কাচ দরকার। আমি সেই কাচের মধ্যে দিয়ে যা দেখেছিলাম, তা আমার চক্ষু চড়কগাছ করার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি বলেছিলাম, রবি, তুই তো একটা পয়মাল। সহজে তাজ্জব হোস না। কি দেখেছিলি?

দেখেছিলাম দু'টো হিরে গায়ে গায়ে জুড়ে রয়েছে। গলে গিয়ে জুড়ে গেছে। ধরণী তার জঠরের কল্পনাতীত তাপ দিয়ে দু'টো দু'রকমের হিরেদের একসঙ্গে জুড়ে রেখে দিয়েছে।

আজ, এতদিন পরে, সেই কাহিনি লিখতে বসে আমার মনে হচ্ছে, রবি যেন ওর ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেছিল সেই যমজ হিরের মধ্যে। দু'টো দু'রকমের হিরে। একটা ও নিজে, আর একটা ওর ভাগ্যাকাশের শনি নক্ষত্র—কল্পনা!

রোমন্থন থাক। সেদিনের কথায় আসি।

রবি বলে গেছিল—যমজ হিরে নিয়ে শুরু হয়েছিল দর কষাকষি। খনি শ্রমিক গ্যারিমপিরোস যে হিরে বণিকের সামনে যমজ হিরে দেখিয়েছিল, তার নাম কাবেনজেলি। ছোট্ট একটা পকেট ক্যালকুলেটর বের করে সে খুটখাট করে

হিরের দাম ফুটিয়ে তুলেছিল স্ক্রীনে। সাড়ে সাতশ ডলার। টেবিলের ওপর দিয়ে ক্যালকুলেটর ঠেলে দিয়েছিল হিরে যে খুঁড়ে তুলেছে—তার দিকে। সে দাম চেয়েছিল ২২০০ ডলার। ক্যালকুলেটর যাতায়াত করেছে টেবিলের এদিক থেকে ওদিকে। ওদিক থেকে এদিকে। দাম উঠেছে পড়েছে নিঃশব্দে—মুখে কোনও কথা নেই। শেষ পর্যন্ত রফা হয়েছিল ১৬০০ ডলারে। যমজ হিরে আমার পকেটে এল ২০০০ ডলারের বিনিময়ে। মস্ত ঝুঁকি নিলাম। হিরে ব্যবসাতে আজ যে রাজা, কাল সে ফকির হয়ে যেতে পারে, ফকির হয়ে যেতে পারে রাজা।

রবির চোখে চোখ রেখে আমি বলেছিলাম, তুই কি হয়েছিস?

যমজ হিরেকে পকেটে চালান করতে করতে রবি বলেছিল, এই মুহূর্তে রাজা। কেন না, ডবল দামের খদ্দের এসে গেছে হাতে।

বেরসিকের মতো আমি বলে ফেলেছিলাম, রবি, হিরে নিয়ে তুই কি শুধু দালালিই করেছিস? খনি থেকে হিরে তোলা দেখিসনি?

অট্টহেসে রবি তখন বলে গেছিল ওর দুর্ধর্ষ জীবনের অনেক গুপ্ত কাহিনি। যে সব কাহিনি প্রকাশ্য হলে ওর জীবন বিপন্ন হতে পারে। হিরে তোলার জাহাজে চেপে ও পাড়ি দিয়েছে মরুভূমির উপকূল থেকে আঠারো মাইল দূরের সমুদ্রে। সেই মরুভূমির নাম নামিবিয়া। দেখেছে কীভাবে সতেরো ফুট চওড়া ড্রিল ঢুকে যাচ্ছে দক্ষিণ আটলাণ্টিকের তিনশো ফুট গভীরে। টেনে তুলছে প্রতি ঘণ্টায় তিনশো মেট্রিক টন সমুদ্রতল—একটানা—বিরামবিহীনভাবে—দিনে আর রাতে—সাতদিন, সাতরাত।

ভাসমান খনি? নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলেছিলাম আমি।

হ্যাঁরে! গত দশ কোটি বছরে অরেঞ্জ নদী কত হিরে ধুইয়ে নামিয়েছে সাগরের জলে, তার একটা হিসেব করে নেওয়া হয়েছিল আগেই—পরিসংখ্যান হিসেব। সেই হিসেবেই ভাসমান খনি ভেসেছিল সাগরের জলে মাসে উনিশ হাজার ক্যারাটের হিরে তোলার টার্গেট নিয়ে..

উনিশ হাজার ক্যারাট!

আজ্ঞে।

হিরের ঝলকানি চোখ ঝলসে দেয়নি?

দুর! হিরে তো দেখিনি।

তবে?

শুধু পাথর আর সাগরের জঞ্জাল!

৮. লরি বোঝাই হিরে

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই : আমি যে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। চমক দিয়ে যাই, নিজে চমকাই না। কিন্তু সেইদিন, বন্ধুবর রবি রে'র অতি অদ্ভুত জীবন কাহিনি শুনতে শুনতে বিষম চমক খেয়েছিলাম।

বলে কি রবি! সাগর গর্ভ থেকে স্রেফ জঞ্জাল তুলেছে হিরে তুলতে গিয়ে! বিপুল অর্থ ব্যয় করে। বলেছিলাম, নুড়ির মধ্যে থেকে হিরে খুঁজতে?

ও বলেছিল, সত্যিই তাই। ইন্দ্র। আমরা এই ঘরকুনো তাস, দাবা, পাশা বিলাসী বঙ্গতনয়রা এই জাতীয় অ্যাডভেঞ্চারাস সওদাগরি ভেঞ্চার কল্পনাতেও আনতে পারব না—

প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আমি বলেছিলাম, এই বাংলার বণিকরা একদা সপ্ত ডিঙা ভাসিয়ে সপ্তদ্বীপে বাণিজ্য করেছে -

সে সব দিন গেছে। এইভাবে হিরে তোলার ভাসমান খনি ভাসিয়েছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু আমি যে সেই অ্যাডভেঞ্চারের পিপাসা নিয়েই দেখতে গেছিলাম। হিরে চিরকাল রমণী নয়নে মোহ বিস্তার করেছে, আমি সেই হিরে নিয়ে মেতেছিলাম...

একটু বাগড়া দিয়েছিলাম, কল্পনার কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে?

কথাটা বলেছিলাম কিঞ্চিৎ হাস্য সহকারে। হাস্য বিবিধ প্রকারের হয়— এক চিলতে হাসি দিয়ে হাজার কথা বলে ফেলা যায়—মুখে উচ্চারণ না করে হাসি-বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব রসিক পাঠক এবং সুরসিকা পাঠিকার অজ্ঞাত নয়।

আমার বহু অর্থব্যঞ্জক টিপ্পনি যেন কানেই তুলল না চৌকস রবি রে। বললে, রমণীগণ মুগ্ধ হন বলেই তো পুরুষ মহাশয়রা জীবন বিপন্ন করে সাগর ছেঁচে আব পাতাল খুঁজে হিরে খুঁড়ে, হিরে খুঁজে বেড়ান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—কল্পনা আমাকে ইন্সপায়ার করে গেছে। তাই অত ঝুঁকি নিয়েছিলাম। কল্পনার কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো কাণ্ড করে গেছিলাম। সেটা শুধু হিরের লোভে নয়, টাকার খোঁজে নয়—

জানি, কণ্ঠস্বর থেকে পরিহাসকে নির্বাসন দিয়ে শুধিয়েছিলাম, কল্পনার মনের পটে হিরে নয়, হিরে নক্ষত্র হতে। সে কথা থাক। প্রেম পুরুষমাত্রকেই ভেড়া বানায়। তাই আমি ওই বস্তুটাকে পরিহার করি। কিন্তু এবার বল, সাগর ছেঁচা জঞ্জাল নিয়ে কী করা হলো?

লরিতে তোলা হলো। পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের জড়োয়া-জঞ্জাল।

আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্র, মূক থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলাম সেই মুহূর্তে এক বিলিয়ন মানে মিলিয়ন মিলিয়ন। এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ। কত লক্ষ, কত কোটি মুদ্রা মূল্যের জঞ্জাল নিয়ে লরি বোঝাই করা হয়েছিল, বিপুল বেগে মস্তিষ্ক চালনা করতে করতে সেই হিসেব করবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিমগ্ন হয়েছিলাম। বিশেষ করে হিসেব এবং অঙ্কশাস্ত্রে আমি যখন নেহাতই কাঁচা।

আমার মুখভাব নিশ্চয় বিহ্বল আকার ধারণ করেছিল। রবি রে তা অবলোকন করে বিলক্ষণ প্রীত হয়েছিল। সহাস্যে বলে গেছিল, ইন্দ্র, হিরে নামক পাথরটা পাথর-হৃদয়া ললনাদের প্রাণাধিক প্রিয় দোস্ত হতে পারে, কিন্তু হিরে ব্যবসায়ীরা ওই কুহকে ভোলে না। তারা চলে সরল পাটিগণিতের হিসেবে। প্রতি বছর পৃথিবীর

বুক খুঁড়ে তোলা হয় একশো কুড়ি মিলিয়ন ক্যারাট ওজনের আকাটা হিরে। রাফ ডায়মণ্ড।

একটু থ' হলাম। কিন্তু মুখে সেই ব্যঞ্জনা আনলাম না। সপ্রতিভ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কত টন বল, মাথায় ঢুকবে।

চব্বিশ টন।

এবার ঢোঁক গেলার প্রবল ইচ্ছেটাকে প্রবলতর সংযম সহকারে সামলে নিয়ে বললাম, চ-ব্বি-শ টন! হিরে!

আজ্ঞে! যা ধরে যায় একটা মাত্র ট্রাকে। এক ট্রাক হিরে-জঞ্জাল বিক্রি হয় কিন্তু মাত্র সাত বিলিয়ন ডলারে। যে জঞ্জাল তুলতে খরচ হয়েছে দু'বিলিয়ন ডলার—তা বেচে লাভ হয় পাঁচ বিলিয়ন ডলার। লাভের অঙ্কটা কী মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয়?

আমি, চৌকস নামে পরিচিত এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ভ্যাবাচাকা ভাবটাকে ম্যানেজ করে নিয়ে বলেছিলাম সপ্রতিভ স্বরে, খদ্দেরদের কাছে, মানে, হিরে-চোখো মেয়েগুলোর কাছে এই হিরে যখন ঝকঝকে চকচকে হয়ে গিয়ে পৌঁছয়, তখন কামায় কত ডলার?

বেশি না, মুচকি হেসে বলেছিল রবি রে, পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার। অলঙ্কার-টলঙ্কারে সেটিং হয়ে যাওয়ার পর।

এইবার আমার মাথা ঘুরে গেছিল। বুরবক মেয়েগুলোর জন্যেই চলছে হিরে নিয়ে এলাহি কারবার! এক লরি হিরের জঞ্জাল মেয়েদের মানিব্যাগ থেকে বের করে আনছে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার।

মাই গড!

৯. কালাহারি মরুভূমির হিরের খনি

বিচিত্র এবং অতীব বিস্ময়কর এই হীরক আখ্যায়িকা পঠন নিরত অবস্থায় গৃহলক্ষ্মীরা অবশ্যই ভ্রূ-কুঞ্চন এবং বিবিধ আপত্তিকর মন্তব্যের সমাহার ঘটিয়ে চলেছেন। কাহিনির পত্তন ঘটেছিল কল্পনা চিটনিসের পুত্র অপহরণ দিয়ে.. অপহৃত সেই বালকের পুণরুদ্ধার কাহিনির মধ্যে না গিয়ে বেরসিক এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র সহসা হীরক-আবর্তে ঘূর্ণমান হচ্ছে কেন—নাসিকাকুঞ্চন সহকারে এইটাই তো অভিযোগ?

বিশ্বের বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই একটি পরম সত্যে অবহিত থাকেন। মা লক্ষ্মীরা বড়ই ধৈর্যহীনা। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা—এই তিন মহাগুণ থেকে এঁরা বঞ্চিত। ঈশ্বর ইভ সৃষ্টিকালে ধরণীর প্রথম রমণীকে বহুবিধ রঞ্জণী বস্তু দিয়ে আকর্ষণীয়া করে তুলেছিলেন—কিন্তু ভুলক্রমেই হোক বা ইচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই হোক—এই মহাগুণত্রয়ের সন্নিবেশ ঘটাননি জিন গঠনে।

আমি টের পাচ্ছি, আমার এই লতায় পাতায় পল্লবিত কাহিনি পড়তে পড়তে

এই এঁরা বিবিধ প্রকার ভ্রূ-ভঙ্গিমা দেখিয়ে চলেছেন এবং সরস বঙ্কিম কটূক্তি বর্ষণ করে চলেছেন।

কিন্তু হে মা-বোনেরা, আমি নিরুপায়। এ যে ভর পাওয়া কাহিনি। হিরের আত্মা ভর করেছে আমার এই লেখনীতে। হিরে নিয়েই তো যত বিভ্রাট এই দুনিয়ায়। সেই প্রহেলিকাই প্রভঞ্জন আকারে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ভাঙা কলমটাকে। আপনারা স্বচ্ছন্দবোধ করুন, এই আমার মিনতি, কল্পনা চিটনিসের বিচ্ছু পুত্রের প্রসঙ্গে ফিরে আসব যথাসময়ে...

রবি রে বললে আমার দিকে অপাঙ্গচাহনি নিক্ষেপ করে, ইন্দ্র, তুই অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, কিন্তু কালাহারি মরুভূমিতে হিরে খোঁজের অ্যাডভেঞ্চারে অবশ্যই যাসনি। ঠিক বলছি?

আমি অনুক্ষণ সময় ব্যয় না করে বলেছিলাম, না যাইনি। তুই গেছিস?

শ্রীযুক্ত রবি রে তখন শুরু করেছিল অত্যাশ্চর্য সেই উপাখ্যান—ইন্দ্র, পেশোয়ারের পাথরের কথা তোকে একটু আগেই বলছিলাম। এই প্রসঙ্গে পরে তোকে আরও কিছু বলব। এখন শুধু জেনে রাখ, হিরের বাজারে দর তোলবার জন্যে হিরে-কারবারিরা মাঝে মাঝে হিরে লুকিয়ে রাখে...কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে...কোল্ডস্টোরেজে সবজি রেখে দেওয়ার কায়দায়...পেশোয়ারের সেই বন্ধ্যা অঞ্চলে পাহাড় দিয়ে ঘেরা পাহাড়ি দুর্গের গোপন ধনাগারে এইভাবেই হিরে জমানো থাকে। যেমন থাকে এই পৃথিবীর আরও কয়েকটা জায়গায়...নামগুলো পরে শুনিস।

কল্পনা...কল্পনা আমাকে ওর চোখের হিরের জাদু দিয়ে টেনে এনেছিল এই লাইনে। কল্পনা সুন্দরী ওর একটু চাপা আর টানা ছোট চোখের জন্যে...নাক মুখ ঠোঁট সবই ডানাকাটা পরীদের মতো...আশ্চর্য...এত লাবণ্য আর কোনও মেয়ের মুখে তো দেখিনি...তা ওর চাহনি...হিপনোটিক...সত্যিই সম্মোহনী। ঠাট্টা করে আমাকে একদিন বলেছিল, কামরূপের মেয়ে আমার মা, বিয়ে করেছিল ইস্পাহানের বাবাকে...জন্মেছি আমি সিকিমের মাটিতে...তাই আমি সিকিমি মেয়ে...গ্যাংটকের রূপসী...ওগো আমার প্রিয়...আমার আসল রূপ কোথায় জান? এই চোখে...এই চোখে...এই চোখে...আমি যে ত্রাটক যোগে যোগিনী... মায়ের কাছে রপ্ত করা এই গুপ্ত বিদ্যার বলে আমি বশে আনতে পারি মনের মতো মানুষকে...তুমি থাকবে চিরকাল আমার পাশে...আমার এই চোখের টানে...মদনের বান যে আমার এই চোখ!

ইন্দ্র, কল্পনার চোখের চাহনির মধ্যে সত্যিই অসাধারণ কিছু আছে। ত্রাটক যোগ কী বিদ্যা জানতে চেয়েছিলাম। হেসে গড়িয়ে পড়ে কল্পনা বলেছিল, সেকালের মুনিঋষিরা বনের পশুদেরও বশে রাখত মনের যে শক্তি দিয়ে...চোখের যে চাহনি দিয়ে...ত্রাটক যোগ অভ্যেসে তা এসে যায়। আমার অসমিয়া মা আমাকে তাই শিখিয়েছে...তাই তোমার মতো বুনো আমার চোখের টানে বাধা পড়েছ...প্রিয়তম রবি, তুমিই এখন সূর্য আমার এই জগতে, আমি তোমার গ্রহ...

আমি বলেছিলাম, গ্রহ না, গ্রহণী।

কল্পনার বাংলা জ্ঞান তেমন উত্তম নয়। জাদু চোখ নাচিয়ে বলেছিল, তা তো বটেই...তা তো বটেই...মেয়ে গ্রহরা তো গ্রহণীই হবে।

বেচারা কল্পনা! ঠাট্টাও বোঝেনি। আমিও বোঝাইনি। গ্রহণী যে একটা উদরাময় রোগ, ক্ষুদ্রান্ত্রের ব্যায়রাম, তা ও জানবে কী করে? আমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, শারীরস্থান রপ্ত করেছি...আমি জানি।

এই পর্যন্ত শুনে, কল্পনা-সঙ্গীত শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে আমি, শ্রী ইন্দ্রনাথ রুদ্র বলেছিলাম, কী মুশকিল! হচ্ছিল হিরে কাহিনি, চলে এল খণ্ডকাব্য—কল্পনা...কল্পনা...কল্পনা!

তখন কি জানতাম, খণ্ডপ্রলয়ের আভাস পেয়েছিলাম সব কিছুর নিয়ামক নিয়তির নিয়মে!

কল্পনার ইস্পাহানি চোখ আর নাক-ঠোঁটের বাঙালিয়ানা মাদকতা প্রসঙ্গে আসবো পরে। কঠিন ঠাঁই এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র যে অনেক গভীর জলের মাছ... আরাবল্লী-বিদ্যাধরী-গন্ধর্ব কন্যারাও বঁড়শিতে গাঁথতে পারেনি যাকে...সে ছিল কি মতলবে?

ইন্দ্রনাথ রুদ্র যখন মতলববাজ হয়, তখন সে রূপময় পাঁকাল!

কিন্তু কল্পনা যে আমার কলমে ভর করেছে। ঘুরে ফিরে কল্পনা কাহিনি চলে আসছে কলমের ডগায়। ওর ওই চোখ আর নাক-ঠোঁট-চিবুকের গঠনের মধ্যে যে জাদুকরী মিশেল আছে, তা আমার রহস্যসন্ধানী চক্ষু যুগলের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে ঔৎসুক্য সঞ্চার করে গেছে বরাবর। আমি মানব প্রত্নবিদ নই, তবে সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যা নিয়ে মস্তিষ্কচর্চা না করে পারি না মানুষের মুখ, করোটি আর শরীরের গঠন দেখলেই। তাই কল্পনার চোখ নাক চিবুক হনু আমার মনে ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল। যার মুখাকৃতির মধ্যে বংশছবি বিধৃত রয়েছে এরকমভাবে, তার পদবি চিটনিস কেন?

চিটনিস তো ষোলআনা সিকিমি পদবি! তাহলে?

আমার গোয়েন্দা কৌতূহল মিটিয়ে দিয়েছিল কল্পনা নিজেই। ওর বাবা ইস্পাহানি যাযাবর, মা অসমিয়া—কামরূপ কন্যা। বিয়ে-থা' করে নিবাস রচনা করেছিল সিকিমে; কিন্তু পদবি পাল্টে নিয়েছিল। কেউ কারও পদবীকে প্রাধান্য দেয়নি। নতুন রূপের নতুন মানুষ এই কন্যা মিশে যাক সিকিমি সংস্কৃতিতে। তবে, রক্তে বহন করুক ইস্পাহানি উদ্দামতা আর কামরূপী ছলনা...ললনাদের যা সহজাত।

ঘুরে ফিরে কল্পনা প্রসঙ্গ চলে আসছে কাহিনির মধ্যে। সব সঙ্গীতের মূল সুর যেমন একটাই থাকে, বিষম বিচিত্র এই কাহিনির মূল সুরও যে কল্পনা। হিরের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি—কল্পনা যার নাম। সুন্দরী, তুমি শুকতারা!

কিন্তু আমার মাথায় কালাহারি মরুভূমিতে হিরের খোঁজে যাওয়ার কাহিনি-বীজ

বপন করে দিয়েই উদ্দাম সুরের সেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি যেন ঘোরের মাথায় বলে গেছিল বন্ধুবর রবি রে।

ফিকে সবুজ পাথরের পাহাড় উঁচিয়ে দু'পাশে। মাঝে কঙ্কর-আকীর্ণ পথ। যদিও পথ তাকে বলা যায় না। নেচে নেচে ট্রাক চলেছে এই পথে। খনিজ সম্পদের ম্যানেজার মহাভি রয়েছে রবির সঙ্গে। ট্রাক ঢুকছে বিবর পথে—চলেছে বিবরের একদম তলার দিকে। এই বিবরের নাম জবানেঙ্গ—কালাহারি মরুভূমির বোটসওয়ানা অঞ্চলের একদম শেষের অঞ্চল। হিরের খনি রয়েছে এইখানেই। ধরণীর সবচেয়ে রমণীয় ভূ-সম্পত্তি এই অঞ্চল। ধূসর মরু তার ভয়াবহতা দিয়ে আগলে রেখেছিল হাজার হাজার বছর ধরে। এখন তার গোপন দ্বার দু'হাট হয়ে গেছে হিরে-সন্ধানীদের উৎপাতে।

কিমবারলাইট ঠাসা একটা শিরা পাওয়া গেছিল এখানে ১৯৭৩ সালে। পাইয়ে দিয়েছিল ধরণীর নিকৃষ্টতম এক পোকা। উইপোকা।

১০. হিরে খনির পাহারাদার উইপোকা

হ্যাঁ, নিছক উইপোকা। তাদের চক্ষু নামক ইন্দ্রিয় নেই। কিন্তু নিশ্চয় অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, নইলে পাথরের মতো কঠিন কংক্রিট ভেদ করে খুঁজে খুঁজে ঠিক পুস্তক নামক সম্পদের সন্ধান পায় কী করে?

আমি, ইন্দ্রনাথ রুদ্র, নিয়মভাবে ললনা-বৈরাগী। তাই আমাকে টলানো যায় না। এমনকী কল্পনার মতো কুহকিনীও আমার মনের আকাশে আর ধমনীর প্রবাহে সুনামি-নৃত্য জাগাতে পারেনি তার কামনা জাগানো চাহনি দিয়ে, তার সবুজ চোখের সেক্সি দ্যুতি দিয়ে, তার পোর্সিলেন প্রতিম গাত্রবর্ণ দিয়ে, সবার ওপরে—তার নিখুঁত ছাঁদের সঠিক স্থানের উচ্চাবচ দেহরেখা দিয়ে...

ঘুরে ফিরে কল্পনা চলে এল উইপোকা কাহিনি বলতে গিয়ে। কেন এল? হে পাঠক এবং পাঠিকা, সর্বত্র সঞ্চার করবার ক্ষমতা আপনাদের আছে, আপনারা অবশ্যই অবহিত হয়ে গেছেন অকস্মাৎ মনের কোণ থেকে কল্পনা কেন বেরিয়ে এল উইপোকারা মাথার মধ্যে কিলবিল করে উঠতেই?

হ্যাঁ, মশায় হ্যাঁ, উইদের মতোই ওর যেন একটা অতীন্দ্রিয় নয়ন আছে। কার পিছনে ওর ওই সবুজ চোখের দ্যুতি লেলিয়ে দিলে হীরকদ্যুতির খনি-খোঁজ পাওয়া যাবে, ও তা জানে। এটা ওর একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। তাই ঠিক বেছে বেছে, বহু প্রলুব্ধ পুরুষকে বাতিল করে পাকড়াও করেছিল রবি রে'কে...

রবি রে...হিরে পাগল রবি রে...উইপোকাদের সাম্রাজ্য যে অতুলনীয় হীরক-ভাণ্ডার মানুষের ধারণার বাইরে রেখে দেওয়ার জন্যে, সে খবর সঠিক সময়ে এসে গেছিল ওর কাছে...

শুধু কি উই...কঙ্করাকীর্ণ সেই পার্বত্য এলাকায় থুক থুক করছে অজস্র পাহাড়ি কাঁকড়া বিছে...তারা লুকিয়ে থাকে পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে...কিন্তু পিল পিল করে বেরিয়ে আসে মানুষের গন্ধ পেলেই...অনেক...অনেক বছর আগে পেশোয়ারের

পাষণ্ডরা প্রাণদণ্ড দিতে গ্রহণ করেছিল এহেন নিষ্ঠুর উল্লাসের পন্থা...গর্দান না নিয়ে শুধু গর্দান আর মুণ্ডটুকু বের করে রেখে বাকি শরীরটা পুঁতে রাখত মাটির মধ্যে... পিল পিল করে ধেয়ে যেত লোহিত বর্ণের বিভীষিকা জাগানো কাঁকড়া বিছে...

বীভৎসর বর্ণনায় আর যেতে চাই না। ফিরে আসা যাক উইপোকা রক্ষিত হীরক ভাণ্ডারের রোমাঞ্চ জাগানো কাহিনিতে।

ফিকে সবুজ রঙের পাথর-পাঁচিল মাথা তুলে খাড়া ছিল পথের দু'পাশে...পাহাড় দুর্গের এমন রঙের প্রাচীর স্বয়ং প্রকৃতি নির্মাণ করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে...রবি রে আর মাহী বেঞ্জামিনের ট্রাক নাচতে নাচতে ধেয়ে যাচ্ছিল এহেন উপল সমাকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে...

মাহী এই অভিযানের পথপ্রদর্শক এবং নেতা। তার একটা গালভরা পদও আছে—মিনারেল রিসোর্স ম্যানেজার...সরল বাংলায় যার অর্থ—রত্নসম্পদ ম্যানেজার। খনিজ সম্পদ বললে যথার্থ হয়। কিন্তু ঐ খনিতে আছে যে শুধু রত্ন।

রবি রে'র সঙ্গে তার দোস্তি যে সব কারণে, তার সবিস্তার বর্ণনা এ কাহিনিতে নিষ্প্রয়োজন—অতএব তা উহ্য থাকুক।

ওরা চলেছে জবানেঙ্গ রত্ন-গহ্বরের একদম তলদেশ অভিমুখে। হ্যাঁ, ধরণীর সবচেয়ে মূল্যবান রত্নময় খনি এই জবানেঙ্গ খনি। যার ভাণ্ডারে থরে থরে সঞ্চিত রয়েছে অতুলনীয় হীরক সম্পদ—মা-পৃথিবী বানিয়েছেন বহু সংহারক তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে...সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছেন নিজের গভীর গোপন জঠরে...

কিন্তু ধূর্ত মানুষ সন্ধান পেয়েছে সেই জঠর-গহ্বরের, উইয়ের দৌলতে...অযুত নিযুত বছর ধরে ছোট ছোট ডালিম দানার মতো বজ্র মণিদের জুড়ে জুড়ে বৃহৎ সুবৃহৎ প্রকাণ্ড মণি বানিয়েছেন প্রকৃতি-জহুরি, লোহা-টাইটানিয়াম-অক্সিজেনের সমাহারে নির্মাণ করে গেছেন কৃষ্ণকায় খনিজ পাথর ইলমেনাইট—যে সবের মধ্যে গেঁথে গেঁথে লুকিয়ে রেখেছেন হিরে...হিরে...হিরে...পুঁতে রেখেছেন একশো বিশ ফুট গভীরের বালি আর পাথরের মধ্যে...লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা কল্পনাতীত সেই ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দিকে ধেয়ে চলেছে হীরক-অন্বেষীদের এই ট্রাক...

হীরক উত্তোলন অতিশয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ফি বছরে নব্বই বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থ ব্যয় করে যেতে হয় এই খনির পিছনে। এই খনি, সেই সঙ্গে আরও দু'টো খনির সন্ধান পাওয়া গেছে প্রথম কিমবারলাইট পাইপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর.. ১৯৭৩ সালে...তারপর থেকেই আফ্রিকার মানুষদের কপাল ফিরে গেছে...তাদের জীবনযাপনের মান এখন চোখ টাটানোর মতো।

স্রেফ হীরক ভাণ্ডারের দৌলতে! হিরে-নিহিত আগ্নেয়-পাথর কিমবারলাইট সেই ভাণ্ডার...হীরক ভাণ্ডার...দক্ষিণ আফ্রিকার কিমবারলি অঞ্চলে যে হীরক শিরার আবিষ্কার ঘটে সর্বপ্রথম।

ট্রাক থেকে নেমে খনির তলদেশে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল রবি রে—

অবিরাম বিস্ময়ের চোটপাট আঘাতে যে কি না বিস্ময় কি বস্তু, তা একেবারেই ভুলে মেরে দিয়েছিল। গহ্বরের দেওয়াল হাজার ফুট উঠে গিয়ে ছাদ নির্মাণ করেছে অনেক উঁচুতে। হেঁট হয়ে মেঝে পরখ করবার অছিলায় যখন বুট জুতোর ফিতে বাঁধছিল রবি রে, মাহী গর্জে উঠেছে কানের কাছে—খবরদার! মেঝেতে হাত দেবেন না।

কেন? ধরণী স্পর্শ তো নিষিদ্ধ নয় কোনও দেশেই?

মানুষ মাত্রই একদিন না একদিন ধরণীর ধুলোয় মিশে যায়, তাহলে ধরণী স্পর্শ নিষিদ্ধ হতে যাবে কেন?

প্রশ্নটা রবি রে'র দুই চোখে নৃত্য করে ওঠার আগেই 'কেন'র উত্তর জুগিয়ে গেছিল হীরক-প্রহরীদের সর্দার মাহী বেঞ্জামিন।

পাথরের এই সমুদ্রে এক পিস হিরে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। পঞ্চাশ লক্ষ পিস সমান সাইজের নুড়ি ঘাঁটলে পাবে এক পিস হিরে। তা সত্ত্বেও সিকিউরিটি বড় সজাগ। রিমোট ক্যামেরা নজর রাখছে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। আসবার সময়ে তোমাকে যতটা সার্চ করা হয়েছে, এখান থেকে বেরোনোর সময়ে তার চেয়ে বহুগুণ সার্চিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এক রতি হিরে নিয়েও এ তল্লাট থেকে বেরোনোর হিম্মৎ কারও নেই। পুরো কমপ্লেক্সটাকে কিভাবে উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, তা তো নিজের চোখেই দেখে এলে আসবার সময়ে।

হেঁয়ালির ঢঙে বলেছিল রবি রে, কেন, বন্ধু, কেন? অনেক সিকিউরিটি পেরিয়ে এলাম—চোর যে নই, ওপরওলা তা জানে। তবে কেন এত অবিশ্বাস, এত অপমান?

কারণ, হিরে পেলেই মানুষ মাত্রই তা কাছে রাখে। এই স্বভাব রয়েছে যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে। হিরে হাতছাড়া কেউ করে না...কেউ করে না।

রবি রে কি তা জানে না? হিরের টানকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে হিরের দামকে আকাশছোঁয়া করে দিয়ে—দামের এহেন উত্থান কিন্তু সম্পূর্ণ তৈরি করা। আসল দাম যা হওয়া উচিত, নকল দাম তার চেয়ে ঢের বেশি করে রাখা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে—হীরক বাণিজ্যের ঘুঘু বণিকরা জানে, কীভাবে হিরে লোভীদের চক্ষু চড়কগাছ করে দিয়ে ট্যাক থেকে টাকা খসিয়ে আনতে হয়।

এবং সেটা হয় কিভাবে?

ডিম্যাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে ফারাক রেখে দিয়ে। যে জিনিস যত কম পাওয়া যায়, সেই জিনিসের জন্যে মন বেশি লালায়িত হয়। সিম্পল থিওরি।

রবি রে কি তা জানে না? হিরে বাণিজ্যের অবিশ্বাস্য কেনাবেচার খবর-টবর নিয়েই তো অনেক কলকাঠি নেড়ে ঢুকতে পেরেছে পাতাল প্রদেশের এই হীরক ভাণ্ডারে। খনি থেকে তোলা হিরের থলি রাখা হয় মাত্র একশো পঁচিশ জন হীরক-সওদাগরের সামনে। তামাম দুনিয়া ছেঁচে বেছে নেওয়া হয় এই একশো পঁচিশজনকে--- অনেক রকমভাবে হুঁশিয়ার হয়ে। হিরে বেচা আর আলু-পটল বেচা, এক জিনিস নয়। হিরে যে বেচবে, সে খুঁটিয়ে খবর নেয় হিরে যে কিনবে---তার সম্পর্কে। তারপর, তাদের জড়ো করা হয় বছরে

একবার—দু'জায়গায়—লণ্ডনে আর জোহান্নে সবার্গে। তারপর, হলুদ রঙের একটা প্লাস্টিক ব্রিফকেস আনা হয় তাদের সামনে, যার মধ্যে থাকে একটা প্লাস্টিক জিপ ব্যাগ। হিরে ভর্তি। আকাটা হিরে।

উপুড় করে দেওয়া হয় একশো পঁচিশ জোড়া হীরক চক্ষুর সামনে। হিরে দেখে তারা নয়ন সার্থক করবে, মনে মনে দাম যাচাই করে নেবে, কিন্তু মুখে দাম হাঁকতে পারবে না। কেনাবেচার হাটে এ-এক কিম্ভুত ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার অন্যথা হয়নি আজও।

কী সেই ব্যবস্থা?

দাম হাঁকবে হিরের মালিক। খনি ছেঁচে হিরে তুলে এনেছে যে, সে। হিরে নিতে হবে সেই দামেই। দরদামের কারবার নেই। নিতে হয় নাও, নইলে যাও! এই নিয়ম শিথিল হয় শুধু একটি ক্ষেত্রে। বড় হিরের ক্ষেত্রে। যে হীরক-খণ্ডদের ওজন ১০.৮ ক্যারাটের চেয়ে বেশি। •

থ' হয়ে শুনছিলাম হীরক-বাণিজ্যের থরথর কাহিনি। সকৌতুকে আমার মুখপানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হিরে-ধারালো গলায় বলেছিল রবি রে, কি রে ইন্দ্র, চোখ যে ছানাবড়া করে ফেললি!

স্রষ্টানামক ভদ্রলোক আমার চোখেও নাকি দু'খণ্ড কমল হিরে বসিয়ে দিয়েছেন—আমাকে নিয়ে আবোল-তাবোল গল্প লেখবার সময়ে বন্ধুবর মৃগাঙ্ক প্রায়শ সেই উপমা টেনে আনে। আর, ওর বউ, দাপুটে কবিতা বউদি, তো যখন-তখন পিছনে লাগে আমার এই হিরে চোখের জন্যে। বলে, জলুস দিয়ে মেয়ে টানা হচ্ছে, আবার যাচাই করাও হচ্ছে—কাচ, না, পাথর!

আমি, সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র, মূক হয়ে রইলাম হীরক সওদাগরি বৃত্তান্ত শুনে। তারপর, বোধহয় মিনমিন করেই, জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু এই প্রথা যারা ভঙ্গ করে? হেঁকে হেঁকে দাম তোলে?

একশো পঁচিশ জনাকে একসঙ্গে না ডেকে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক-একজনকে ডেকে নিজের জিনিস বেচা অন্যায় তো নয়।

ইন্দ্র, হীরক বাণিজ্যে সেটা ঘোরতর অন্যায়। অলিখিত এই কানুন যে ভাঙে, অতিলোভী সেই হীরক-সওদাগরের কপালে লেখা থাকে অনেক শাস্তি।

কীভাবে?

হাতে মেরে নয়, ভাতে মেরে।

কীভাবে? কীভাবে? সেটা হয় কীভাবে?

একটা পন্থা হলো, বাছাই করা হিরের স্রোতে বাজার ভাসিয়ে দিয়ে।

যাতে দর তোলা হিরের দর পড়ে যায়?

হ্যাঁ, বন্ধু, হ্যাঁ। অভিনব পন্থা। হিরের দাম ফেলে দিয়ে হিরে লোভীর সর্বনাশ করে দেওয়া।

থ' হয়ে গেছিলাম শাস্তি দেওয়ার পন্থা-প্রকরণ শুনে। হিরে একটা সর্বনাশা

পাথর। হিরের মধ্যে আছে ধরিত্রীর অভিশাপ। আমার মূল কাহিনি তার প্রমাণ। কলম ধরেছি তো সেই কথা বলবার জন্যেই।

অনিক্স পাথরের ডিমের মধ্যে ছিল সেই অভিশাপ। যে অভিশাপকে টেনে এনেছিল সবুজ চক্ষু কল্পনা চিটনিস। গায়েব হয়েছিল তার চোখের মণি—পেটের ছেলে—সোমনাথ।

বাজারে হিরে পাথরের ঢল নামিয়ে দাম ফেলে দেওয়ার ফিকির আমাকে চমৎকৃত করেছিল বিলক্ষণ। তাই প্রশ্নাকারে ঔৎসুক্য ঠিকরে এসেছিল মুখ দিয়ে—রবি, এত হিরে আসত কোত্থেকে? কার হিরের গুদোম থেকে?

ঈষৎ হাস্য করে জবাব দিয়েছিল রবি—ডি বিয়ার্স নামক এক হীরক বণিকের কিংবদন্তীসম একটা হিরের গুদোম আছে লণ্ডনের হেড কোয়ার্টারে। কখনও-সখনও হিরের ঢল নামানো হতো এই গুদোম থেকে—বাছাই করা হিরের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো হীরক-মার্কেট—কেঁপে যেত দুনিয়া।

শুধু একটা গুদোম থেকে? আমতা আমতা করেছিলাম আমি—তা কি করে হয়? লণ্ডনের এত ক্ষমতা?

ইন্দ্র, ইংরেজরা জাত বণিক। বণিকেব মানদণ্ড—

ছেঁদো কথা রাখ। প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায়নি? পালটা হিরে গুদোম?

পয়েণ্টে চলে এসেছিস। হ্যাঁ, দাঁড়িয়েছে—কালক্রমে। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া কানাডায়। বিশেষ করে ইজরায়েলের এক জহুরি-চক্র তাসখন্দ থেকে হিরে-ভেলকি দেখিয়ে কোণঠাসা করে এনেছে লণ্ডনের হিরে জাদুকরদের। রুশ হিরের নিয়ন্ত্রণ এখন তাসখন্দের মুঠোয়।

রবি, আমার মস্তক ঘূর্ণিত হচ্ছে।

বেচারা বাঙালি। গোয়েন্দাগিরিই তোর দৌড়। হিরে-দৌড়ে পাল্লা দেওয়া তোর কম্মো নয়। মাই ডিয়াব ডিটেকটিভ, হিরের সঙ্গে সোনা আর রূপোর কোনও তুলনাই হয় না। বাজার একেবারে আলাদা। এক দামে হিরে কিনে সেই জহুরির কাছেই সেই একই দামে হিরে বেচা যায় না, জহুরি তার প্রফিট রাখবেই। সোনার দোকানে ঝোলে দৈনিক সোনার দাম, দৈনিক হিরের দাম ঝোলে না কোথাও। সেই দাম থাকে জহুরির পেটের মধ্যে। ঝোপ বুঝে কোপ মারে। হিরে সেই কারণেই স্রেফ অমূল্য।

অ-মূল্য!

আজ্ঞে। ইরান বিপ্লবের দুঃসময়ে মুহূর্তের নোটিশে দেশ ছেড়ে পয়াকার দেওয়ার সময়ে এক ব্যক্তি কি করেছিলেন? বাড়ি বিক্রি করবার সময়ও পাননি, ব্যাঙ্কে যাওয়ার সময়ও ছিল না—সঙ্গে নিয়েছিলেন শুধু পাথর ভর্তি ব্যাগ।

হিরে পাথর?

হ্যাঁ। যার দাম তিরিশ মিলিয়ন ডলার।

আমি নির্বাক থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলাম। তিরিশ মিলিয়ন ডলার মানে যে কত কোটি রজত মুদ্রা, সে হিসেব সেই মুহূর্তে ভোঁ ভোঁ মাথায় আসেনি।

আমার হতভম্ব মুখভাব তারিয়ে তারিয়ে নিরীক্ষণ করে নিয়ে মুচকি হেসে বলেছিল হিরে-ধুরন্ধর রবি রে, হিরে এক রকমের কারেন্সি। পত্রমুদ্রা, মানে নোট, রজতমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রার মতো হিরেও একটা মুদ্রা। এ মুদ্রার দাম নির্দিষ্ট হয় জহুরির চাতুরির দৌলতে—গভর্নমেণ্টের কোনও হাত নেই হিরের দাম বেঁধে দেওয়ার। হে বন্ধু, তাই মনে রেখ, যার হিরে আছে, তার সব আছে। দুনিয়া তার মুঠোয়। ইণ্টারন্যাশনাল কর্জ, দেনা শোধ, ঘুষ দেওয়া, অস্ত্রশস্ত্র কেনা—এই ধরনের বহু ব্যাপারে অন্য যে-কোনও মুদ্রার চেয়ে বেশি কাজ দেয় হিরে-মুদ্রা।

আমার চক্ষুযুগল নিশ্চয় বিলক্ষণ বিস্ফারিত হয়ে গেছিল হীরক-কীর্তন শুনতে শুনতে। দুই মণিকায় কৌতুক নৃত্য জাগ্রত করে বিষম আমোদে তা নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিল হিরে পাটোয়ার রবি রে।

কিন্তু রবি চলে ডালে ডালে, আমি চলি শিরায় শিরায়। মৃগাঙ্ক লিখিত মদীয় কাহিনি সমুচ্চয়ে নিশ্চয় আমার এই মূল মস্তিষ্ক ক্ষমতাটা যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত হয়ে এসেছে। যতই ছাইপাঁশ লিখুক না কেন মৃগাঙ্ক, চরিত্রের মূল সুর ও ঠিক ধরতে পারে। আমি যে কি মাল, তা কিন্তু জানা ছিল না রবি রে'র। কথার স্রোতে ওকে ভাসিয়ে রেখে, কিছুমাত্র বুঝতে না দিয়ে, কথার উপলখণ্ডে ঠোক্কর খাইয়ে নিয়ে এসেছি এমন একটা বিন্দুতে, যা এই হিরে নিয়ে তথ্যভিত্তিক রহস্য কাহিনির মূল উপপাদ্য...

কেন্দ্রবিন্দু!

আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রবি, আমি আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবর রাখি না।

সবেগে মস্তিষ্ক চালনা করে রবি বলেছিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোর মুরোদ এই বেঙ্গলে—যত্তোসব ছিঁচকে কেস নিয়ে মস্তানি দেখিয়ে—

নিমেষে চলে এলাম সার কথায়। বললাম, ভিজে বেড়ালের মতো, একটা গুজব কানে এসেছে, উদ্ভট গুজব...স্রেফ গুজব...পাকা খবর নয়...আনকনফার্মড রিপোর্ট।

ঝেড়ে কাশলেই তো হয়। তোৎলাচ্ছিস কেন?

চতুর এবং চতুর্মুখ রবি রে বুঝতেই পারেনি ওটা আমার অভিনয়। সাধে কি কবিতা বউদি আমার পেছনে লাগে। মিনমিন করে বলেছিলাম, পাছে অপযশ করা হয়ে যায়, তাই কাউকে বলতে পারি না...সাংবাদিকদের কানেও কথাটা গেছে কি না জানি না...

অসহিষ্ণু স্বরে বলেছিল রবি রে, কথাটা কী?

ইয়ে, মানে, ওসামা বিন লাদেনের টেররিস্ট অরগানাইজেশন—

আল কায়েদা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরা নাকি এই অপারেশনে আছে? ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের মার্চ, ২০০২ সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠায় ২০ এই সংবাদের আভাষ দেওয়া হয়েছে।

অমনি সতর্ক হয়ে গেছিল বকমবাজ রবি রে। গুম হয়েছিল মিনিটখানেক।

তারপর বলেছিল হুঁশিয়ার স্বরে—ইন্দ্র, তুই আদার ব্যাপারি, আমি হিরের ব্যাপারি—ওষুধের জগত থেকে হিরের জগতে চলে এসেছি স্রেফ জ্ঞানবান হওয়ার জন্যে...যে জ্ঞান আখেরে কাজ দেবে...কিন্তু গুপ্ত সংগঠনের ব্যাপার-ট্যাপার—

গুপ্তই থাকুক, ঝটিতি বলেছিলাম আমি। কেন না আমার যা জানবার, তা জানা হয়ে গেছিল।

১১. আট লাখ হিরে শ্রমিকের দেশ—এই ভারত

উইপোকা আর লাল কাঁকড়া বিছে পাহারা দিয়ে চলেছে হিরের যে খনি অঞ্চল, তা নিয়ে আরও কথা বলতে ভুলেই গেছিল কুশলী বক্তা রবি রে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ লাইনটাই তো বকমবাজদের লাইন—আজকাল অবশ্য মেয়েরাও এই লাইনে লাইন দিয়ে নামছে। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাম-টামও করে ফেলেছে। কেন না, সুধী ব্যক্তি মাত্রই জানেন, ঈশ্বর মহোদয় নারীজাতিকে জিহ্বা সঞ্চালনের ক্ষমতা কিঞ্চিৎ অধিক দিয়েছেন, সেই সঙ্গে দিয়েছেন কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা। বুদ্ধিমত্তার ক্ষিপ্রতা এর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় দশভূজা হতে পারে শুধু তারাই...

যাচ্চলে, আবার কল্পনা-কাহিনিতে চলে আসছি নাকি? যত নষ্টের গোড়া অবশ্য সেই সবুজনয়না—কিন্তু তার আগে আরও কিছু বলে নেওয়া যাক..., যা-যা জেনেছিলাম মহা ডানপিটে রবি রে'র পেট থেকে...

হিরের খনির ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে হেঁট হয়েছিল বলে ধমক খেয়েছিল রবি রে। তারপর কি হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে আর না গিয়ে চলে এসেছিল এই পৃথিবীর ডায়মণ্ড বাজারে হৃৎপিণ্ড যেখানে, সেইখানে—অ্যাণ্টওয়ার্প রেলরোড স্টেশনের পাশের তিনটে রাস্তায়—কালাহারির কথা আধাখ্যাচড়া রেখে দিয়ে এমন একটা জায়গায়—হিরে যেখানে উড়ছে। খনি থেকে তোলা এবড়ো-খেবড়ো অতিশয় অসুন্দর হিরেদের শতকরা আশিভাগের লেনদেন হচ্ছে সরু সরু তিনটে রাস্তায়— আর এই বিশাল হিরে বাজারের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের অন্য অন্য শহরেও।

আমি প্রকৃতই জ্ঞান বুভুক্ষুর মতো জানতে চেয়েছিলাম, রবি, সে শহরগুলো কোথায় রে?

নিউইয়র্কে, লণ্ডনে, তেল আভিভে, আর বোম্বাইতে।

বোম্বাইতে!

অপেরা হাউস ডিসট্রিক্টে কখনও যাসনি?

সেটা কোথায়?

বোম্বাইতে।

বম্বে যে একটা ডায়মণ্ড সিটি, আমার তা অজানা ছিল না। এত বুরবক নয় এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র। বম্বে একা এখন আর ডায়মণ্ড সিটি নয়, এই গৌরব ছড়িয়ে পড়েছে ইণ্ডিয়ার অন্য অন্য শহরেও।

যেমন, ব্যাঙ্গালোরে।

ব্যাঙ্গালোরের সুনাম অনেক দিক দিয়ে। ছিল গার্ডেন সিটি, হল আইটি সিটি, এখন হতে চলেছে ডায়মণ্ড সিটি...শুধু একজনের উদ্যমে। তার নাম শ্রীযুক্ত রবি রে। এত লম্বা কাহিনি সেই কাহিনিরই ভূমিকা।

রবি অনেকদিন ধরেই স্বপ্ন দেখেছিল, এই পৃথিবীর সেরা সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, ভারতকে আবার সেই রত্নময় ভারতের জায়গায় নিয়ে যাবে।

বাঙালির ব্রেন যখন খেপে ওঠে, তখন সে পারে না, এমন কিছু নেই। ওষুধ বিক্রির সুযোগকে হাতিয়ার করে ও ঢুকে গেছিল হিরের জগতে...এই ভারতের হীরক দুনিয়ায়...যে দুনিয়ায় আট লাখ শ্রমিক নানা শহরে বসে আকাটা হিরে কেটেকুটে খাসা হিরে বানিয়ে চলেছে...সাইজে এক ক্যারাটের কম হলেও ঝকমকে হিরের কণা বের করেছে...রমণীর নাকের জেল্লা বাড়িয়ে দিচ্ছে...ফলে, শুধু নাক নেড়েই কেল্লা মেরে দিচ্ছে মেয়েরা।

মূলে রয়েছে আট লাখ হিরে কারিগর!

আমি হাঁ হয়ে গেছিলাম রবির হিম্মৎ কাহিনি শুনে। কি অসাধারণ বুকের পাটা। যে বাজারে গুজব ভাসছে হাওয়ায়, যেখানে হিরের দাম ঠিক হয়ে যায় শুধু চোখের ইশারা আর একটি মাত্র হিব্রু শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে, সেই বাজারে বাংলার ছেলে জাঁকিয়ে বসেছিল শুধু ব্রেন আর ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে।

আমি আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হিব্রু শব্দটা কী রে?

মজল।

মা-মানে?

গুড লাক।

সিক্রেট শব্দটা ডায়মণ্ডের সমতুল্য। একটু-আধটু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, ডায়মণ্ড মহোদয়রা কক্ষনো জানতে দেয় না কোন ডায়মণ্ড কোন খনিতে আবির্ভূত হয়েছিল। চেহারা দেখে চেনা যায় না। কোন মুলুকের মাল। চেহারা দেখে চরিত্র বুঝতে হবে—জন্মস্থান জানা যাবে না। পাঁকেও তো পদ্ম ফোটে।

রবি রে ওর ডায়মণ্ড চক্ষুর নৃত্য দেখিয়ে বলেছিল, মাই ডিয়ার ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ওই যে একটা কথা আছে না, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি, ডায়মণ্ডদের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে। জলুস দেখে কেউ বলতে পারবে না—কোন মুলুকের মাল। তুই তো সূত্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ রুদ্র—

ক্ষীণ স্বরে বলেছিলাম, মৃগাঙ্ক থাকলে তোর এই বিশেষণটা লুফে নিত।

বাগড়া পেয়ে থমকে গিয়ে চোখ পাকিয়ে রবি বলেছিল, কোন বিশেষণটা?

সূত্রান্বেষী। একদা আমাকে ছিদ্রান্বেষী বিশেষণ দিয়ে একখানা জম্পেস গল্প বানিয়েছিল। সূত্রান্বেষী...সূত্রান্বেষী...গুড অ্যাডজেক্টিভ।

বিরক্ত হয়েছিল রবি। এটা আমার ইচ্ছাকৃত। কথার টানা স্রোতকে হঠাৎ হঠাৎ ঘুলিয়ে দিতে হয়! আচমকা আচমকা বাগড়া পড়লে অনেক অনিচ্ছার কথা ফুসফাস করে বেরিয়ে আসে। চতুর পাঠক এবং চতুরা পাঠিকা, আপনারা এই টেকনিক

বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে দেখতে পারেন। রতিপতির বাণ যখন মানব মনকে শিথিল করে দেয়, তখন এইভাবে আলটপকা ঢিল মেরে দেখতে পারেন—অনেক কদর্য কাহিনি বেরিয়ে এলেও আসতে পারে। এই জগতের যারা মাতাহারি, তারা জানে এই গুপ্ত কৌশল। জানে কল্পনা চিটনিস...

যাচ্চলে, ঘুরে ফিরে সবুজনয়না ফের চলে এসেছে লেখনী অগ্রে...

এবার টেনে কলম চালাচ্ছি। কী বলছিলাম? ও হ্যাঁ, হিরে দেখে অতি ওস্তাদ জহুরিও বলতে পারে না, ধরণীর কোন খনন ভূমিতে ঝিকিমিকি পাথরটির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে। আদিভূমি অজানা থেকে গেলেও হিরের টুকরোর সার্টিফিকেট দিতে কসুর করে না ডায়মণ্ড এক্সপার্টরা। লক্ষ কোটি হিরে-পাথর এই মুহূর্তে পাইপলাইন দিয়ে স্রোতের আকারে বয়ে চলেছে, অথচ তাদের প্রত্যেকেই উৎসবিহীন। এবড়ো-খেবড়ো আকৃতি ঝেড়ে ফেলে ঝকঝকে চকমকে হয়ে উঠছে, কিন্তু কোনমতেই জানতে দিচ্ছে না ধরণীর কোন কোণ থেকে তারা এসেছে।

উৎস অজানা, কিন্তু ঔৎসুক্য কারোরই কম থাকেনি। অ-রূপ পাথরটাকে রূপময় করে তোলার ব্যাপারে। সার্টিফিকেট না পেলে বুনো পাথরে দাম চড়বে কী করে? স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো রবি বলে গেছিল এবড়ো-খেবড়ো অতি কদাকার একখানা পাথরকে মেজে ঘষে কেটে কুটে কীভাবে ৫৮ দিকওলা হিরে বানানো হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য ওর হয়েছিল নিউইয়র্কে—মানহাট্টান ডিসট্রিক্টের ঠিক মাঝখানে—কড়া পাহারায় রাখা ওয়ার্ক রুমে এক অপরাহ্নে। হিরে কারিগর ঘুরিয়ে যাচ্ছিল একটা চাকা—পুরনো দিনের গানের রেকর্ড গ্রামোফোনের ওপর বাঁই বাঁই করে ঘুরত যেভাবে—সেইভাবে। ঘুরন্ত চাকায় তেল আর হীরক-চূর্ণের আস্তরণ...কুমোরের চাকা ঘুরছে বলে মনে হয়েছিল রবির...বাংলার ছেলে তো...হিরে-কারিগরের সঙ্গে কুমোরের মিল খুঁজে পেয়েছিল মনের মধ্যে...মিল থাকার কারণও ছিল যথেষ্ট...এক তাল মাটিকে যেমন টিপে টুপে মূর্তির অবয়ব ইত্যাদি এনে দেয় কুমোর, প্রায় সেই একই পন্থায় হিরে-কারিগর আকাটা হিরেকে কেটেকুটে খাসা হিরে বানাচ্ছে...একপাশের ক্ল্যাম্পে আটকানো রয়েছে অধরা হিরে...দু'মাস ধরে সাজাচ্ছে বদখৎ বৃহৎ হীরকখণ্ডকে—খনি থেকে যখন এসেছিল কাটাই-ঘরে, তখন সেই হিরে ছিল অস্বচ্ছ, অর্ধ-আয়তাকার একটা চাঁই...একপ্রান্ত আর এক প্রান্তের চেয়ে থ্যাবড়া...

অস্বচ্ছ? এই পর্যন্ত শুনে আমি মুখ খুলে ফেলেছিলাম, হিরে আবার অস্বচ্ছ হয় নাকি?

হয় বন্ধু, হয়। ভেতরের ত্রুটি চেপে রেখে দেওয়ার জন্যেই হীরকজননী সন্তানতুল্য হিরেকে ঈষৎ ধোঁয়াটে রেখে দেয়।

ধোঁয়াটে হিরে!

আজ্ঞে। মনে হয় যেন এক তাল কুয়াশা জমাট হয়ে রয়েছে ভেতরে। ঘুরন্ত সেই হিরেকে কয়েক মিনিট অন্তর চোখের সামনে তুলে ধরে অন্তর্ভেদী চোখে

চেয়ে থাকে হিরে-কাটিয়ে...আমি যাকে দেখেছি, এ ব্যাপারে তার মতো ওস্তাদ খুবই কম আছে এই দুনিয়ায়...তিরিশ বছর ধরে শুধু হিরে কাটছে...কাটছে...কাটছে। যে হিরেটাকে দেখেছিলাম গ্রামোফোন ডিস্কের মতো চাকার ওপর ঘুরতে, সেটার পিছনে লেগেছিল মাস দেড়েক...একখানা হিরে কাটতে দেড় মাস।

বিড় বিড় করে বলেছিলাম, সাধারণ হিরে নিশ্চয় নয়।

একেবারেই নয়। সত্যিই অসাধারণ। জীবনে এমন হিরে আমি দেখিনি, ইন্দ্র। আর আমাকে তা দেখানোর জন্যে, আমার চোখ তৈরি করার জন্যে—দেওয়া হয়েছিল দুর্লভ এই সুযোগ।

যোগ্য বলেই প্রশংসাটা করেছিলাম অন্তর থেকে। রবি রে অকারণে রবি রশ্মি হয়নি। হীরক রশ্মির জগতে ও দুম করে চলে আসেনি। জীবন বিপন্ন করে দেখেছে, অন্তরশক্তিকে জাগ্রত করেছে—তবেই না, অধুনা ব্যাঙ্গালোরের ডায়মণ্ড কমপ্লেক্সের জনক হতে পেরেছে। হৃদয়জাত শক্তি দিয়ে চিনেছে পৃথ্বীজাত পাথরকে...

কিন্তু চিনতে পারেনি ত্রাটক যোগসিদ্ধা কল্পনা চিটনিসকে।

দম নিয়ে ফের শুরু করেছিল রবি—এই যে দিনের পর দিন একটা মাত্র হিরে পাথরকে অনবরত মেজে ঘষে কেটেকুটে যাওয়া ,এর মধ্যে আসল আর্টটা কি জানিস?

অপচয় যাতে কম হয়, আলটপকা বলে দিয়েছিলাম আমি।

দ্যাটস রাইট। খুশি উপচে পড়া চোখে বলেছিল রবি রে, কাটতে গিয়ে, পালিশ করতে গিয়ে যেন বেশি হিরে ধুলো হয়ে না যায়—

টুক করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই ধুলো থেকে কি হিরে ভস্ম তৈরি হয়?

হিরে ভস্ম!

যা খেয়ে নাকি নবাব-বাদশারা হারেম ম্যানেজ করে যেত।

স্টুপিড! হচ্ছে হিরে-কথা, চলে গেল হারেমে। ইন্দ্র, তোর মতিগতি বিশুদ্ধ নয়।

নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

সেকেণ্ডে কয়েক ব্যাজার থাকবার পর ঝেড়ে উঠল রবি। বললে, ইন্দ্র, যে হিরেটাকে সেদিন রিভলভিং স্টেজে নেচে নেচে কাটাই হতে দেখেছিলাম, মামুলি হিরে সেটা নয়। একখানা পাথরে আটান্নটা দিক—এক-একদিকে এক-রকম জলুস। সে যে রোশনাই, না দেখলে তুই ধারণায় আনতে পারবি না।

আনতে চাইও না। তুই বলে যা।

জুল জুল করে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল রবি। চোখে চোখে কথা যখন হল না, অর্থাৎ আমার হিরে-নিরেট মাথায় যখন ওর মনের কথা জাগ্রত হল না, তখন বাচন আকারে যে কথাটা বলেছিল রবি, তা এই—

ইন্দ্র, হিরেটা সাইজে ঠিক একটা ডিমের মতো।

অশ্বডিম্বের মতো নয় নিশ্চয়।

নিতান্ত অসময়ে নেহাৎই অপ্রাসঙ্গিক এইরকম অনেক রসিকতা আমি করে

ফেলি। বাক্য বীরাঙ্গনা কবিতা বউদি তখন আমার ওপর তেড়ে ওঠে। হে সুবুদ্ধি পাঠক এবং হে জ্ঞানবতী পাঠিকা, আপনারা দয়া করে সেই ইচ্ছা সম্বরণ করুন। কথার খই অনেক সময়ে খেই ধরিয়ে দেয়।

রবি একটু বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু হীরক-উপাখ্যানে নিমগ্ন থাকার ফলে তা নিমেষে কাটিয়েও উঠেছিল। বলেছিল, ডিম। হিরের ডিম। হিরে-ইতিহাসে এমন অতিকায় ডিম আর জন্মায়নি।

বলতে বলতে স্মৃতির কুয়াশার আবিল হয়ে গেছিল হীরক উপাধ্যায় রবি রে।

আমি ওর ঘোর কাটানোর জন্যে আলতোভাবে বলেছিলাম, অজ্ঞর অজ্ঞতা ক্ষমাঘেন্না করে একটা প্রশ্নের জবাব দিবি?

প্রশ্নটা যে রকম, জবাবটা সেই রকম হবে।

তেড়ে উঠছে দেখে, আলতোভাবে পেশ করেছিলাম কৌতূহলটা, হিরে কি চেঁচায়?

অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রবি। তারপর বললে, সত্যিই তুই ভাল গোয়েন্দা।

থ্যাঙ্কস ফর দ্য সার্টিফিকেট। কিন্তু...হিরে কি চেঁচায়?

হ্যাঁ, চেঁচায়...মাঝে মাঝে...কাটাই করার সময়ে। জননীর জঠর থেকে বেরিয়ে এসে শিশু যেমন কেঁদে ওঠে, হিরে তেমনি কাঁদে...রূপান্তর ঘটানোর সময়ে।

অ, বলে নিশ্চুপ রইলাম সেকেণ্ড কয়েক।

আর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম তারপরেই—হিরে কি খানখান হয়ে যেতে পারে বেমক্কা ঠোক্করে?

বিপুল বিস্ময়ে চেয়ে রইল রবি। বললে তারপরে, আঁচ করলি কী করে? হিরে তো কঠিনতম পদার্থ এই পৃথিবীতে...হিরেকে ভাঙা যায় না—এইটাই তো সবাই জানে। ইন্দ্র, তুই একটা জিনিয়াস। হ্যাঁ, হিরেও খান খান হয়ে যেতে পারে—বেঠিক জায়গায় ঠোক্কর খেলে।

হিরে কঠিন মানুষদের মতো—আমি দার্শনিক হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

হীরকপ্রতীম রবি রে কিন্তু দর্শন-ফর্শনের ধার ধারে না। বললে, এই জন্যেই একজন ঘুরন্ত চাকার নিচে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। হিরে হাত ফসকে গেলে যেন মাটিতে না আছড়ে পড়ে—লুফে নিতে পারে তার আগেই।

মুখখানাকে বোক চন্দরের মতো করে আমি জানতে চেয়েছিলাম, মস্ত হিরেকে কি কেটে খানকয়েক করা হয়েছিল?

হ্যাঁ...হ্যাঁ...তেড়াবেঁকা ছিল যে আকাটা হিরে।

ক'টা হিরে বেরিয়েছিল?

ছ'টা।

ছ'টা! খনির হিরের মূল ওজন তাহলে ছিল কত?

দু'শ পঁয়ষট্টি দশমিক বিরাশি ক্যারাট।

পেল্লায় হিরে যে। ডায়মণ্ড মার্কেট কাঁপানো হিরে। বন্ধু, এবার বল তো, এ হিরে কোথাকার হিরে?

কঙ্গোর হিরে।

এই আখ্যায়িকার নামকরণে একটু ভুল করেছি। নাম রাখা উচিত ছিল 'হিরের ডিম'।

তবে হ্যাঁ, ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগে পাঠক এবং পাঠিকা নিশ্চয় আঁচ করে ফেলেছেন, অনিক্স পাথরের ডিমের সঙ্গে হিরের ডিমের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

সবুর...সবুর...আর একটু।

১২. হিরেময় বিগ্রহ—বালাজি

হিরের মধ্যে আছে কসমিক পাওয়ার—অলৌকিক শক্তি—এই বিশ্বাসের বনেদের ওপর গড়ে উঠেছিল এই ভারতের হিরে বিগ্রহ...হিরের দখল নিয়েই রক্তক্ষয়ী লড়াই লেগেছে রাজ্যে রাজ্যে, হিরের লোভেই ছুটে এসেছে লোলুপ বিদেশিরা।

এইসব বৃত্তান্ত আমার কিছু কিছু জানা ছিল, পুরোটা জানতাম না। শুধু বুঝেছিলাম সব অনর্থ এবং অকল্পনীয় আর অভিশপ্ত অর্থ ভাণ্ডারের মূলে রয়েছে হিরে। এবং, একদা এই ভারত ছিল হিরের মূল উৎস।

কঙ্গোর হিরের গল্প শুনতে চেয়েছিলাম রবির কাছে। জানতে চেয়েছিলাম ওষুধের সাম্রাজ্য ছেড়ে কেন এল সে হিরের মার্কেটে। তখন হিরে প্রোজ্জ্বল চোখে আবিষ্ট স্বরে হিরে-ইতিহাস শুনিয়েছিল আমাকে—এই রবি রে...

হিরে নাকি সৌভাগ্যের প্রতীক? তবে কেন ঘনিয়ে এল এমন কালো মেঘ তার ভাগ্যাকাশে?

আমি...ইন্দ্রনাথ রুদ্র...শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকা দিয়ে বিশ্বাস করি, হিরে একটা ঘণীভূত রক্তঝঞ্ঝা ছাড়া কিস্সু নয়...

কিন্তু সেই কথা টেনে শেষ করে দিতে চাই...স্বপ্নিল চোখে যেসব কথা দুর্মদ রবি রে সেদিন আমাকে বলে গেছিল। ওর জীবনের নিবিড় তমসার সঙ্গে হয়তো সেই কাহিনীর কোথাও না কোথাও সংযুক্তি আছে...নাও থাকতে পারে...কিন্তু ঝড়ের বেগে হিরে ইতিহাস শুনিয়ে আমাকে যেভাবে বিহ্বল চমকিত বিমূঢ় করে তুলেছিল রবি রে...তার কিছুটা অন্তত না লিখে যে পারছি না...একটা অদৃশ্য শক্তি আমার কলম টেনে ধরে লিখিয়ে নিচ্ছে...আমি চাইছি না সবুজাভ নয়না কল্পনা চিটনিসের কিডন্যাপড পুত্রের কাহিনির অবতারণা ঘটিয়ে হীরক-উপাখ্যানে আসতে...কিন্তু রুখতে পারছি না...আমার সে শক্তি নেই...কিছু একটা আমার কলমকে ভর করেছে...আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে, লিখতে আমাকে হবেই...লিখতে আমাকে হবেই...যা শুনেছি, বর্ণে বর্ণে তা লিখে যেতে হবে...রবি রে'র জবানিতে।

রবি বলছে—

ইন্দ্র, আমি নাকি বেঁকা চোখের এক বক্রমানব? এমন বিশেষণ জীবনে প্রথম শুনেছিলাম কল্পনার কণ্ঠে। অথচ আমাকে অতিমানব রূপে মন মঞ্জিলের

অন্দরমহলে ঠাঁই দিয়েছে এই কল্পনা। কেন? আমার চেহারার বর্ণনায় হয়তো ও কিছুটা অতিরঞ্জন করেছে। এমনটাই হয়। তাই না? ভাবাবেগ যখন ভালবাসার আবেগে হোমকাষ্ঠ জুগিয়ে যায়, তখন মানুষমাত্রই সোজা চোখে না দেখে বঙ্কিম চোখে নিরীক্ষণ করে যায় নিজের নিজের মনের মানুষদের...নয়ন পথের পথিক যখন মন পথের পথসাথী হয়ে ওঠে, ঠিক তখন...তাই না?

আমার চোখ...হ্যাঁরে...আমার এই চোখ নাকি বিশ্বকর্মা বিশেষ পাথর কুঁদে বানিয়ে তবে আমার চক্ষুকোটরে সেট করেছেন। ইন্দ্র, তুইও দেখেছিস, আমার ভুরু দু'টো সরল রেখায় নেই—দু'টো ভুরু ঢালু হয়ে নেমে গেছে দু'দিকে...ভুরু দু'টোর নিচে চোখের গড়ন দু'টোও সেই রকমভাবে বানানো হয়েছে...দু'টো চোখই একটু ঢালু—দু'প্রান্তে। যা দেখে কল্পনা আমাকে বলত, তোমার চোখে মেয়ে টেঁকে না...গড়িয়ে পড়ে যায়!

কী কথা! চোখের ঢালু গড়ন আমার মনকে তো ঢালু করেনি। এ মন যে কি মন, আজও তা বুঝে উঠলাম না। আমার বাইরের চেহারার সঙ্গে সমতা রেখে চলেছে এই মন। তাই তো হয়, তাই না রে, ইন্দ্র?

হ্যাঁ, আমার চেহারাটায় একটু পাঠান-পাঠান ভাব আছে। হয়তো আগের জন্মে আমি পাঠান ছিলাম। কাবুল কান্দাহার আফগানিস্তান ইরান-টিরানে রক্তঝঞ্ঝা তুলেছিলাম। আমার নাক চোখা, আমার বাটালি চিবুক সামান্য সামনে ঠেলে থাকে, আমার গালের হনু-হাড় একটু উঁচু—তার নিচে সদা জাগ্রত থাকে দু'টো খোঁদল, আমার চোয়াল রীতিমতো চৌকোণা আর মারকাটারি মার্কা, আমি লম্বায় পাক্কা ছ'ফুট, আমার শরীরে পেশি বেশি—চর্বি কম।

এক কথায়, আমাকে এক নজরে অভারতীয় মনে হয়। সেটাই আমার কর্মজীবনে প্লাস পয়েন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এই ভাবালু বাঙালিদের মতো কলি-কবি নই—জিদও ষোলআনা। তবে হ্যাঁ, বোগাস বাঙালি আমাকে বলা যায় না। বাঙালি যে কতখানি বেপরোয়া হতে পারে, তা বিজয় সিংহই শুধু দেখাননি, মহা রহস্যের নায়ক মহামতি সুভাষচন্দ্র বসুও দেখিয়েছেন...

কিন্তু আমার একটা মহাদোষ আছে। আমি একটু বেশি বকি। ব্রাদার, এই কোয়ালিফিকেশনটার জোরেই তো দাপিয়ে বেড়াচ্ছি মেডিক্যাল লাইনে...কথার ফুলঝুরি ঝরিয়ে যাই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত চিকিৎসক মহলে...তাঁদের ভেতর পর্যন্ত ধোলাই করে দিয়ে চালু করে দিই আমার প্রোডাক্ট...

একটু ভুল বললাম। এখন আর দিই না। আগে দিতাম। এখন তো আমি হিরের জগতের তারকা...স্টার...তবে হ্যাঁ, গোটা ভারতবর্ষটার শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে টহল দেওয়ার সুযোগ তো পেয়েছিলাম এই প্রফেশনে এসে..

আর দেখে গেছিলাম আমার এই ঢালু চোখ দিয়ে...জেনেছিলাম হিরে নিয়ে কত কাণ্ডই না হয়ে গেছে এই ভারতে...এখন সেই কাণ্ড আর কারখানা ছড়িয়ে পড়েছে তামাম পৃথিবী গ্রহে!

লোকে বলে বটে, আখাম্বা চেহারা থাকলেই কি সব হয়, মাথায় ঘি থাকা

চাই। আমার মাথায় ঘি আছে কি গোবর আছে, সেটা বিশ্বকর্মা জানেন। তবে আমার এই পাঠান-পাঠান চেহারাটা কাজ দিয়েছে অনেক। এই চওড়া কাঁধে, আমাদের লেখক বন্ধু মৃগাঙ্ক রায় কাঁধকে বৃষস্কন্ধ বলে—অর্থাৎ ষাঁড়ের কাঁধ। এই কাঁধে যখন মার্কিনি কাস্টিংয়ের কোট ঝোলাই, তখন আমাকে মার্কিন মুলুকের মানুষ বলেই মনে হয়। তার ওপর ম্যারিকান ঢঙে ইংরেজি বলার কায়দা। ফলে, বিদেশি বাজারে পথ করে নিতে পেরেছি সহজে। এই ঢালু চোখ, এই উঁচু হনু, এই চওড়া কাঁধ প্রশস্ত করে দিয়েছে আমার পথ।

হিরের জগতে প্রবেশ করেছিলাম স্রেফ জানবার তাগিদ নিয়ে। আমি সাউথ ইণ্ডিয়ার অনেকগুলো ভাষা গড় গড় করে বলে যেতে পারি। কোঙ্কানি, তামিলিয়ান, তেলেগু, কানাড়া, কেরালা বচন আমার জিভের ডগায়। তার ওপর এই ড্যাশিং পুশিং ফিগার। কেটে বেরিয়ে গেছি সর্বত্র।

হিরে আমাকে টেনেছিল অথবা বলতে পারিস, আমার টনক নড়িয়েছিল সর্বপ্রথম যেদিন বালাজির বিগ্রহ দেখেছিলাম। মঠ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা আমাকে কস্মিনকালেও ভক্তি বিহ্বল করে তোলে না, তা তুই জানিস। বিধর্মী আমি সবার কাছেই। কিন্তু বচনে দর বলে পথ করে নিই সর্বত্র। এইভাবেই একদিন দর্শন করতে গেছিলাম তিরুপতির বালাজিকে—এত ভক্ত সমাগম কেন হয়, তার হেতু অন্বেষণ করতে।

ইন্দ্র, বালাজি বিগ্রহ দর্শন করে আমার এই বেঁকা চোখ ট্যারা হয়ে যায়নি, এই যথেষ্ট। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, তুই নাকি বহু বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষ, লোকে তাই বলে, অবশ্য এহেন বচনসুধার পিছনে কলকাঠি নাড়ায় আমাদের লেখক বন্ধু মৃগাঙ্ক, ওর কলমকে যদি বাণিজ্যিক কলম বলি, তাহলে ও ক্ষেপে যায়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি কিঞ্চিৎ বাণিজ্য নির্ভর না হলে কোনও শিল্প এবং সাধনাক্ষেত্র কালজয়ী হতে পারে না।

এটা আমার নিজস্ব জীবন দর্শন। আর এই কাঠখোট্টা একান্ত পার্থিব দর্শন নিয়ে বালাজির বিগ্রহ দর্শন করতে গেছিলাম।

হিরে পাথরটা নিছক পাথর নয়। এই পাথরের মধ্যে একটা অপার্থিব শক্তি নিহিত আছে, এমন কথা আমি অনেকদিন ধরে অনেকজনের কাছে শুনে আসছি। ব্যবসাবাজ-জহুরিরা এই প্রবাদের সঙ্গে আর একটা মাত্রা যোগ করেছে। হিরে নাকি প্রেম টেনে আনে, মনের মধ্যে হিরের খনির মতো ভালবাসার খনি বানিয়ে দেয়, বিপুল আবেগ সহজাত করে মনের মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লাখো উপহারেও যা হয় না, এক কণা হিরে তা করতে পারে।

এটা কিন্তু জহুরিদের, হিরে ব্যবসায়ীদের একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। হিরের দর তোলার ব্যবসায়িক চাল। তাই কথায় কথায় সব জহুরিই বলে, হিরে! সে তো চিরকালের! হিরে থাকলে সব থাকবে! হিরে স-ব টেনে ধরে রাখে!

ফলটা কি হয়েছে জানিস, ইন্দ্র—আমেরিকান, ইউরোপিয়ান জাপানিজ, চাইনিজ মেয়েরা আরও বেশি করে হিরে বসানো আংটি কিনে পরিয়ে দিচ্ছে মনের মতো পুরুষদের আঙুলে...যুগ যুগ ধরে এই রীতিই যে চলে আসছে...মনের

মানুষকে যদি পায়ের জুতো বানিয়ে রাখতে চাও,পরিয়ে দাও তার অনামিকায় হিরে গাঁথা একটা আংটি...অপার্থিব কুহেলি রচিত হবে সেই পুরুষের মনের অন্দরে কন্দরে...মনের আকাশ ছেয়ে যাবে একটিমাত্র রমণীর লালসা মদির মেঘপুঞ্জে!

জহুরিদের এই ব্যবসায়িক বুকনির পিছনে সত্যিই কি কোনও অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব আছে?

এই ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে খোঁচা মেরে চলেছিল অনেক...অনেকদিন ধরে! আমি একটু ইনকুইজিটিভ মাইণ্ডেড, অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী, তা তুই জানিস। হিরে নামক অতি-কঠিন একটা পাথরের সঙ্গে কিংবদন্তী জড়িত রয়েছে কেন যুগ যুগ ধরে, সেই গবেষণায় মন ঝুঁকে পড়েছিল বড় বেশি।

তাই ডুব মেরেছিলাম এই ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনি সাগরে। ইন্দ্র, আজব দেশ এই ভারতবর্ষ। এত পৌরাণিক সম্পদ তুই আর কোনও দেশে পাবি না। এ দেশের লোকগুলো আর কিছু না পারে, লিখতে পারে বটে। মাথা খাটিয়ে বিস্তর ব্যাপার লিখে একালের ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকদেরও মুণ্ড ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে,পুরাণের রূপকের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে বহু বৈজ্ঞানিক সত্য...দর্শন আর কিছুই নয়, এক এবং অদ্বিতীয় মহাবিজ্ঞানের ঈষৎ আভাস...

কী বলছিলাম? হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ান পুরাণ। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে, রত্নমাত্রই কসমিক পাওয়ার বিধৃত। ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক বিশেষ বিশেষ রত্ন ধারনের পরামর্শ দিয়ে আসছেন জোতিষী মহাশয়রা সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত। বিষয়টা আমার কৌতূহলী মনকে খুঁচিয়ে গেছিল বলেই আমি গেছিলাম হায়দ্রাবাদে। বসেছিলাম এক জহরত দক্ষ জ্যোতিষীর সঙ্গে। তেলেগু ভাষাটায় যৎকিঞ্চিৎ দখল আছে বলেই তার ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম। শুনেছিলাম সেই একই কথা।

প্রেম এবং পরিণয়, সহবাস আর সন্তান উৎপাদন, এমনকী অমরত্ব এনে দেওয়ার ব্যাপারেও জহর মহাশয়দের অব্যাখ্যাত ভূমিকা রয়েছে।

হাসছিস? আমিও হেসেছিলাম—মনে মনে। জহর যদি অমর করে রাখতে পারে, তাহলে আওরঙ্গজেব প্রমুখ জগৎ কুখ্যাত মানুষগুলো আজও বেঁচে থাকত।

এই দ্যাখ! হিরের ঘোরে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছি। ইন্দ্র, হিরে এমনই একটা বস্তু। সর্বনাশ করে! সর্বনাশ করে!

কিন্তু এই বিশ্বাসটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস—স্রেফ আমার। কারণ আমি কুসংস্কার মানি না। কিন্তু মানত সেকালের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মহাগুরুরা। ধর্মের সঙ্গে হিরে পাথরটা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, এ তত্ত্ব তারা মনে মনে বিশ্বাস করত কি না জানি না, তবে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিল সাধারণ মানুষদের। তাই, আজও পিল পিল করে মানুষ ছুটে যায় মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিমের তিরুপতি পাহাড়ে—যেখানে রয়েছে সোনার পাতে মোড়া বালাজি বিগ্রহ। আগাগোড়া হীরক-আকীর্ণ প্রস্তর দেবতা।

আমি অবশ্য মুগ্ধ হয়ে চোখের পাতা না ফেলে চেয়েছিলাম ন'ফুট হাইটের বিশাল সেই বিগ্রহের দিকে। ন'ফুট হাইট কম কথা নয়, তার ওপর মিশমিশে

কালো পাথর কুঁদে গড়া। একটা সরু গলিপথের শেষপ্রান্তে রাখা সেই বিগ্রহের দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—এমনই আকর্ষণ তাঁর প্রতিবর্গ সেন্টিমিটারে। লক্ষ্য করেছিস, 'তাঁর' বললাম? ভক্তি নিবেদন করলাম। কিছু একটা আছে ওই বিগ্রহর মধ্যে। তা নাহলে আজ আমি হীরক সাম্রাজ্যের একটা কেউকেটা হলাম কী করে!

আজকের ইন্ডিয়ায় সবচেয়ে পপুলার বিগ্রহ হতে চলেছে এই বালাজি। আমি চোখের পাতা ফেলতেও বোধহয় ভুলে গেছিলাম। আমার পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল...মাইল কয়েক লম্বা লাইনে...হাজার হাজার ভক্ত...প্রত্যেকের কণ্ঠের বালাজি বন্দনায় গলিপথ যেন ফেটে চৌচির হতে চাইছিল...থর থর করে কাঁপছিল ওপরে নিচে দু'পাশের পাথর..., সেইসঙ্গে মিশেছিল ঝনঝন ঝনঝন ঝনঝন শব্দ...মেশিনের গজরানি...কেন? আরে বাবা, অত রেজকি...দর্শনার্থীদের চাঁদা...না... না...প্রণামী...মেশিন চলছে...বাছাই করে যাচ্ছে...রেগুলার বিজনেস...আওয়াজ হবে না? কান ফেটে যাওয়ার মতো কোলাহল! চাঁদা...ইয়ে, প্রণামী মিটিয়ে, তবে দেখতে হয় বালাজিকে। ধারে কারবার নেই। আশ্চর্য! গণতন্ত্রের দেশে এ কি জুলুম। পয়সা দিয়ে দেবতাকে দেখতে হবে?

যাকগে, হচ্ছিল হিরের কথা, এসে গেল পয়সার কথা। বালাজির মাথার মুকুটটার দিকে চেয়ে আমি চোখের পাতা ভুলে গেছিলাম নিশ্চয়। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। আগাগোড়া হিরে দিয়ে গড়া এমন মুকুট আমি জীবনে দেখিনি, দেখব বলেও মনে হয় না। ওজনে যাট পাউণ্ড...প্রায় তিরিশ কেজি...হিরের সংখ্যা কত জানিস? শুনলে মুণ্ডু ঘুরে যাবে। আঠাশ হাজার।

১৩. হিরের শঙ্খ, হিরের চক্র

চেহারা আর চোখ দেখে যাকে নিরেট পাথর বলেই মনে হয়, সেই রবি রে যে হিরের মুকুট দেখে এভাবে গলে গেছে, তা তো জানতাম না। কথা তো নয়, যেন হিরের ফুলকি ঠিকরে ঠিকরে আসছিল ওর গলার মধ্যে থেকে...হিরের পরশমণি ছুঁয়ে গেছিল ওর দুই চক্ষুকেও...মুহুর্মুহু বিদ্যুৎবহ্নির আভাস জাগছিল ওর বিশেষ গড়নের দুই চোখে...বালাজি-প্রভাব ওকে অবশ্যই উদ্দীপ্ত করেছিল, নইলে ওর মতো চাপা স্বভাবের মানুষ আচম্বিতে এমন উচ্ছল হয়ে উঠবে কেন?

বালাজির মুকুটে আছে আঠাশ হাজার হিরে। একটা নয়, আঠাশ হাজার হিরের সন্নিবেশ সম্ভব হয় কি করে, আমি (যাকে আমার প্রিয় লেখকবন্ধু মৃগাঙ্ক রায় বলে হীরক চক্ষু) যখন তাই নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছি আমার খুদে মগজের মধ্যে,তখন রবি রে ফের শুরু করেছিল বালাজির অন্য অন্য হিরের সম্ভার প্রসঙ্গ। বলেছিল—

ইন্দ্র, আমার চিত্ত চমৎকৃত হয়েছিল যখন শুনলাম আঠাশ হাজার হিরে সমেত

বালাজির মুকুটের ওজন...কত হতে পারে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই বলছি...ষাট পাউণ্ড! প্রায় সোয়া সাতাশ কিলোগ্রাম! ভাবা যায়? সোয়া সাতাশ কেজি ওজনের হিরে বসানোর মুকুট মাথায় নিয়ে সিধে রয়েছেন বালাজি! তিনি কি নারায়ণ? কেন না, তাঁর হাতে আছে শঙ্খ আর চক্র। দু'টো হাতিয়ারকেই ঝকমকে করে তোলা হয়েছে হিরের পর হিরে বসিয়ে। হাত দু'টোতেই শুধু হিরে আর হিরে বসিয়ে যেন নক্ষত্র জাঁকানো দু'টো ছায়াপথ বানানো হয়েছে। কানের লতিতে ঝুলছে প্রকাণ্ড কর্ণ-অলঙ্কার—হীরকময়। ইন্দ্র, ইন্দ্র, থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল আমাকে এত হিরের একত্র সমাবেশ দেখে। এক অঙ্গে এত হিরে! জড়োয়ার জেল্লা যে কি পরিমাণে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে, চোখের রন্ধ্র দিয়ে রোশনাই মগজে ঢুকে চিন্তা বুদ্ধিকে অসাড় করে দিতে পারে, ব্রেনকে বিকল করে দিয়ে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অসাড় করে দিতে পারে—বালাজির বিগ্রহ তার সেরা নিদর্শন—এই পৃথিবীতে...মাত্র ন'হাজার মাইল ব্যাসের এই পৃথিবীতে বুঝি থরহরিকম্প জাগাতে পারে শুধু এই বালাজি বিগ্রহ তাঁর শ্রীঅঙ্গের এত হিরের অলৌকিক প্রতাপ বিকীর্ণ করে।

ইন্দ্র... সেই থেকে... সেই মুহূর্ত থেকে... হিরে আমাকে টেনেছিল, হিরে আমাকে জাদু করেছিল..., হিরে আমাকে হিপনোটাইজ করেছিল... হিরে... হিরে... হিরে... এই হিরে কোত্থেকে আসছে... কোথায় যাচ্ছে... কত কি কাণ্ড করে চলেছে... তা আমাকে জানতে হবে... জানতেই হবে... যে ভাবেই হোক।

বলতে পারিস আমি অলৌকিকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলাম। হিরের মধ্যে নিশ্চয় একটা অতিপ্রাকৃত আকর্ষণ আছে... ম্যাগনেটিক আকর্ষণ সে তুলনায় কিছুই নয়... এই টান... হিরের এই আকর্ষণ নিয়ে গবেষণা করা দরকার। ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে আছে।

ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, বৈদিক যুগ থেকে হিরে কেন বিস্তর বিস্ময়কর কেন্দ্রবিন্দু দখল করে রয়েছে... কী শক্তির মহিমায়... তা নিয়ে গবেষণা একদিন আমি করবই... তার আগে গড়ে তুলব নিজের হিরের কারখানা। ইন্দ্র, ব্যাঙ্গালোরের জহর কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছি এই প্রেরণা নিয়েই। হয়তো বালাজি'র মহিমায়... হয়তো!

ধরনা দিয়েছিলাম নন্দিতা কৃষ্ণা'র কাছে। তুই তো জানিস, অনেক রঙ্গ রসের গল্প করেছি তোকে আমার এই মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ লাইনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে। ডাক্তারদের সঙ্গে দহরম মহরম রাখতে গিয়ে আপনা থেকে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে যে সব ডাক্তাররা মহিলা সেবিকা রাখেন—তাদের সঙ্গে। নার্স... নার্স... মেট্রন... সেবিকা বললে হয়তো মাথায় ঢুকবে না, তাই ইংলিশ করে দিলাম। ডাক্তারি একটা বিজনেস... উকিল ব্যবসার মতো... অনেক উকিল যেমন লেডি জুনিয়র রাখেন, অনেক ডাক্তারও তেমনি লেডি সাগরেদ রাখেন... মহিলা পেসেণ্ট এলে যাতে অসুবিধা না হয়... ডাক্তার ভিজিট করতে গিয়ে এই সব অ্যাট্রাকটিভ নার্স-মেট্রনদের সঙ্গে অটোমেটিক্যালি আমার একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠত... নো, ম্যান, নো... অন্য সম্পর্ক গড়ে তোলার চান্স দিতাম না... তাহলে

তো শ্রীকৃষ্ণের মতো হাজার ষোল গোপিনী গড়ে উঠত এতদিনে... ওই একটা ব্যাপারে আমি খুব সজাগ... এমন কি নন্দিতা কৃষ্ণা নাম্নী সেই মেট্রনটির ক্ষেত্রেও... ভদ্রমহিলা যুবতী, রূপসী, টান-টান শরীরের অধিকারিনী, কিন্তু নিয়মিত রতিতৃপ্তি দিয়ে যেত ইহুদি ডাক্তার মহাশয়কে... বয়স যাঁর সত্তর... ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে ইয়োহিমবাইন হাইড্রোক্লোরাইড ইঞ্জেকশনটা নিতেন আমার কাছ থেকে... তখন তো ভায়াগ্রা বাজারে আসেনি... ভুরু কুঁচকোস্‌নি... মূল কথা থেকে অমূল কথায় যেতে গেলে একটু-আধটু রসের কথা এসে যাবেই...

চেন্নাই... মানে, মাদ্রাজের এই নন্দিতা কৃষ্ণা যে কি টেরিফিক ব্ল্যাক বিউটি, তা তোকে ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। মিশমিশে পাথর কুঁদে গড়া বললেই চলে। বালাজি বিগ্রহ যে পাথর থেকে তৈরি, অনেকটা সেই রকম পাথরের মতো। কিন্তু পাথরের জেল্লার জন্যে তার সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্ক গড়ে তুলেনি। ভদ্রমহিলা ব্যক্তিগত জীবনে কি ছিল, তা নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করিনি—আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার জহর জ্ঞানের জন্যে। *

নিছক জহর নয়, হিরে নামক পাথরটা সম্বন্ধে নন্দিতা একটা লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া বললেই চলে। জীবন্ত বিশ্বকোষ। একদিকে বালাজির প্রায় সেবাদাসী। অষ্টপ্রহর বালাজির নাম সংকীর্তন করত বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। আর ঠিক এই একটা কারণেই আমি নিবিড় নৈকট্য রচনা করেছিলাম নন্দিতার সঙ্গে।

ইন্দ্র, কল্পনার সঙ্গে ভাব হওয়ার পর কথায় কথায় নন্দিতা প্রসঙ্গ এসে যেত। ঈর্ষার ফুলকি দেখতে পেতাম কল্পনার ফিকে সবুজ চোখের তারায়। এই মেয়েরা একটা জাত বটে। বিশেষ জীব। এদের ছাড়া জগত অচল। অথচ এরা এত ঈর্ষাকাতর যে কহতব্য নয়।

উল্টোপাল্টা বকছি? মেয়েদের ম্যাটার এলেই আমি একটু টলে যাই, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড...আফটার অল, আই অ্যাম আ হিম্যান..

যাকগে... যাকগে...নন্দিতা... নন্দিতা নাটকে আসা যাক। নন্দিতা .. কৃষ্ণা কামিনী নন্দিতা.. হিরে নিয়ে গুলে খাওয়া কন্যা নন্দিতা... আমার ভেতর পর্যন্ত গুলিয়ে ছেড়েছিল শেষ পর্যন্ত, স্রেফ হীরক শক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়ে...

বালাজি যার ধ্যান-জ্ঞান... শয়নে স্বপনে যে শুধু বালাজি নিয়েই ভাবে আর পাঁচজনকে ভাবায়, সে যে তার কালো চোখের বিদ্যুৎ দিয়ে আমার ভেতর পর্যন্ত তোলপাড় করে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! হিরে নিয়ে তড়বড়িয়ে কথা বলতে গিয়ে হয়তো একটু বাড়িয়েই বলেছিল... তা বলুক... আমি তো ক্রিমটুকু তুলে নিয়েছিলাম ওর ফেনাময় কথার স্রোতের মধ্যে থেকে..

বালাজি কালো পাথরের বিগ্রহ হতে পারে, কিন্তু বড় সজীব বিগ্রহ, পাথর দিয়ে গড়া বলেই বোধহয় তিনি পছন্দ করেন পৃথিবী গ্রহের সেরা পাথর... হিরে. পছন্দটা এমনই প্রবল যে ভক্তের আঙুল থেকে হিরের আংটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নেন।

আমি এই পর্যন্ত শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়ে বলে ফেলেছিলাম, সে কী! পাথরের বিগ্রহ কি রক্তমাংসময় আঙুল থেকে আংটি কেড়ে নিতে পারে?

নন্দিতা বলেছিল, ঠিক এই রকম আপাত অসম্ভব ব্যাপারটাই যে ঘটে গেছিল একদিন।

আমি বলেছিলাম, বালাজি বেদি থেকে নেমে, ভক্তের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরে, ফের বেদিতে উঠে গিয়ে বসে পড়েছিলেন?

তা কেন? তা কেন? মুখর হয়ে উঠেছিল আবলুস মেয়ে নন্দিতা কৃষ্ণা—ভক্ত এক সময়ে বালাজির সামনে এসে কথা দিয়ে গেছিল, তার অমুক মনোবাঞ্ছা যদি পূর্ণ হয়, তাহলে আঙুলের এই ঝকমকে মস্ত হিরের আংটি দিয়ে যাবে বালাজিকে।

ঘুষ?

প্লীজ, রসিকতা নয় বালাজিকে নিয়ে। মানৎ করলে তা দিতে হয়, হিন্দুধর্মের রেওয়াজ। বালাজি ভক্তের ইচ্ছে মিটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছাপূরণের শক্তি দিয়ে... ভক্ত কিন্তু কথা রাখেনি... আংটিটা আঙুলে পরে এসে যখন জোড় হাতে প্রণাম করে, আংটি আঙুলে রেখেই, সরে পড়তে যাচ্ছে... তখনই ঘটে গেল অলৌকিক কাণ্ডটা।

আঙুল থেকে আংটি খুলে বেরিয়ে গেল?

আজ্ঞে। হাওয়ায় উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল... বলুন তো কোথায়?

বালাজির চরণতলে?

প্রণামী নেওয়ার থলিতে।

অদৃশ্য শক্তির টানে?

আজ্ঞে।

এমনও তো হতে পারে, আমি ধীরে সুস্থে বলেছিলাম—পুরো ব্যাপারটাই রটনা।

রটনা! কথাটার অর্থ?

অতীব সরল। মানৎ করা আংটি আঙুল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাণ্ডারা ফেলে দিয়েছিল প্রণামীর থলিতে।

তিরুপতির মন্দিরে পাণ্ডারা গুণ্ডা নয়, সব্বাই তা জানে।

আমি আর কথা বাড়াইনি। হিরে প্রসঙ্গে চলে গেছিলাম। নন্দিতার মুখ থেকেই শুনেছিলাম, তিরুপতির রত্নগর্ভে সঞ্চিত হয়ে এসেছে অমূল্য অনেক হিরে সুদূর অতীতকাল থেকে –ইণ্ডিয়া যখন ছিল ডায়মণ্ডের একমাত্র উৎস—এই পৃথিবীতে। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্যের উত্থান আর পতন ঘটেছে এই হিরে সম্পদকে কেন্দ্র করে। সাম্রাজ্য শক্তি বাড়িয়েছে, শক্তি হারিয়ে ধুলোয় বিলীন হয়েছে—মূলে রয়েছে খনি থেকে উঠে আসা হিরে। যত হিরে উপহার দিয়েছে খনি, তার বেশির ভাগ গেছে তিরুপতি আর অন্য অন্য মন্দিরে—ভক্ত শাসকদের প্রণামী হিসেবে। বিগ্রহদের তুষ্ট রাখবার পর নৃপতিরা নিজেদেরকে হিরে দিয়ে সাজিয়েছে নর-দেবতা হওয়ার অভিলাষে। হিরে এনে দিয়েছে দেব-দ্যুতি, মুগ্ধ থেকেছে প্রজারা। ইউরোপের দূর দূর অঞ্চল থেকে পর্যটকরা এসেছে, রাজসভায় হিরের ছড়াছড়ি দেখে হতভম্ব হয়ে ফিরে গিয়ে সেই গল্প শুনিয়েছে স্বদেশে। হিরে,

হিরে, হিরে—হিরেময় দেশ এই ভারতবর্ষ। ষোড়শ শতাব্দীতে এমন এক পর্যটকের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেছিল বিজয়নগরের রাজার ঘোড়ার গায়ে হিরের সাজ দেখে। এত হিরে দিয়ে তো একটা মস্ত শহর মুড়ে দেওয়া যায়!

হায়দ্রাবাদের প্রান্তে পাহাড়ের ওপর রয়েছে গোলকোণ্ডার রাজাদের কেল্লা প্রাসাদ। তিনশো বছর আগে সেই প্রাসাদ লুঠ করে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে মোগল লুঠেরা-রা। পরিত্যক্ত সেই প্রাসাদ এখন চিল আর মাছরাঙাদের রাজত্ব। তাদের কলরবেই মুখর হয়ে থাকে একদা বিপুল ঐশ্বর্যের কেন্দ্র—আর জেগে থাকে অশ্রুত দীর্ঘশ্বাস—হিরে নিয়ে যারা একদা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল—এই দীর্ঘশ্বাস সেই বিদেহীদের।

ভারতবর্ষের সবচেয়ে নামজাদা হীরক রাজত্ব ছিল এই গোলকোণ্ডায়। এত বছর পরেও হিরে-ঐশ্বর্য নিয়ে কথা বলতে গেলেই গোলকোণ্ডার নাম এসে যায়। সম্পদ আর গোলকোণ্ডা—সমার্থক হয়ে এখানকার হিরে বর্ষণ করেছে রক্তাক্ত অভিশাপ! কোহিনুর, হোপ ডায়মণ্ড, রিজেন্ট—ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই হিরেদের প্রথম আবির্ভাব তো গোলকোণ্ডায়, এ ছাড়াও আরও অনেক চোখ ধাঁধানো হিরে এই গোলকোণ্ডা থেকে বেরিয়ে এদেশে বিদেশে রক্তঝরানো অনেক নাটকের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা... এই রক্তলোভী হিরেরা... এদেশ থেকে গেছে ভারতবর্ষের বাইরে হাত বদল হতে হতে... বিক্রি, উপঢৌকন, উৎকোচ, চুরি, লুঠ। আজও ইণ্ডিয়ার বহু পুরোনো বড়লোকের প্রাসাদে পাওয়া যাবে এমন সব হিরে, যাদের কাটাই করা হয়েছে সেকেলে পন্থায়—যে কাটিং পদ্ধতির মডার্ন অনুকরণ আজকের হিরেদের গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। হিরে কাটিংয়ের এহেন অভিনবত্ব থেকে আঁচ করে নেওয়া যায়, কি পর্যায়ে পৌঁচেছিল হীরক সমৃদ্ধ ইণ্ডিয়ার হিরে কারিগরেরা।

আজ তাঁরা নেই। ইন্দ্র, ভাগ্যের বিপুল পরিহাসে চাকাও ঘুরে গেছে। ইণ্ডিয়ার হিরে-খনিগুলোয় হিরে ফুরিয়ে যাওয়ার অনেক... অনেক বছর পরে... গোলকোণ্ডার শেষ হিরে কারবারি গোলকোণ্ডা ছেড়ে চলে যাওয়ার বহু... বহু বছর পরে.. বিশ্বের হিরেরা ফের এই ভারত দিয়েই যাচ্ছে আর আসছে।

ইন্দ্র, তুই কি ধৈর্য হারাচ্ছিস? হিরে নিয়ে বেশি ফেনিয়ে যাচ্ছি? আমি নিরুপায় ইন্দ্র, আমি নিরুপায়। হিরে এমনই একটা পাথর যার মধ্যে আছে একটা সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার... হিরে নিয়ে কথা শুরু করলে তাই তো তা শেষ করা যায় না... এই পৃথিবীতে অনেক ভেল্কি অনেক উত্থান পতন দেখিয়ে গেছে ঝকমকে এই পাথরেরা... দেখাচ্ছে এখনও... আমি বড্ড বেশি জড়িয়ে গেছি এই বিজনেসে—লক্ষ্য একটাই... ইণ্ডিয়ার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবই।

কি বলছিলাম? এই পৃথিবীর বেশির ভাগ হিরের প্যাসেজ এখন এই ইণ্ডিয়ার ভেতর দিয়ে। চাকা ঘুরছে, ইন্দ্র, চাকা ঘুরছে... ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে... ইয়ে... নেবে।

তবে হ্যাঁ, বেশির ভাগ হিরেই কিন্তু একেবারে খুদে... এক ক্যারাটের ফ্র্যাকশন... ভগ্নাংশ। তিরিশ বছর আগেও খুদে খুদে এই হিরে মহাশয়দের দরকার ছিল শুধু

একটাই ব্যাপারে... ড্রিলের ডগায় সেঁটে কাটাই করার জন্যে। বালির মতো ছোট ছোট হিরে কেটে রত্ন বানাতে যে লেবার খরচ হতো নিউইয়র্ক, অ্যান্টওয়ার্প, তেল আভিভে—তাতে দরে পোষাত না।

ভেলকি শুরু হয়ে গেল ১৯৭০ সাল থেকে। একদল জৈন জহুরিদের উদ্যোগে। এঁরাই কোমর বেঁধে লাগলেন। অতি ছোট হিরে মহাশয়দের কাটাই পালিশ করে এক্সপোর্টের ব্যবস্থা করলেন। শুরু করেছিলেন বোম্বাই শহরে, সরে গেলেন সুরাট শহরে... আরও কয়েকটা শহরে... অন্য অন্য প্রদেশে... শুরু হয়ে গেল হীরক বাণিজ্য নতুন চেহারায়।

১৪. হিরে! হিরে! হিরে! আসছে সুদিন ফিরে!

হিরের কথায় এমনই আবিষ্ট হয়ে গেছিল রবি রে যে, আমি শ্রীহীন ইন্দ্রনাথ রুদ্র মুখ খোলবার কোনও চান্সই পাচ্ছিলাম না।

দম নেওয়ার জন্যে ও বোধহয় সেকেণ্ড খানেক বিরতি দিয়েছিল। আর ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ফেটে পড়েছিল আমার কৌতূহল।

রবি, ইণ্ডিয়া কি হিরে-কাটিং শিল্প চাতুর্যে আজও জগত সেরা?

দু'চোখ প্রায় কপালে তুলে ফেলে বলেছিল অসাধারণ স্মার্ট রবি—ইণ্ডিয়ার আর্টিস্ট্রি, এক কথায়, তুলনাবিহীন। বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। জিন এফেক্ট! জিন এফেক্ট! জহুরিদের জিন এফেক্ট যাবে কোথায়?

বলে, চোখের ফ্ল্যাশ মেরে চেয়ে রইল আমার কথার ফ্ল্যাশ শোনবার জন্যে। আমি কিন্তু উস্‌কে দিয়েই বোবা মেরে গেছিলাম।

হিরে জিনিসটা সত্যিই একটা উত্তেজক পদার্থ। নইলে রবির মতো ধীর স্থির বচন দক্ষ পুরুষ এত কথা খরচ করতে যাবে কেন আমার মতো হিরে-আকাটে মানুষের কাছে?

ইন্দ্র, সুরাটের জহুরিরা দিনে ক'ঘণ্টা হিরে-পালিশ করে জানিস? লেবার-ল অনুসারে তো আট ঘণ্টা কাজ করার কথা। ওরা খাটে ক'ঘণ্টা? জানিস না। জেনে রাখ। টানা দশ ঘণ্টা। বিশ্বাস না হয়, দেখে আয় সুরাটের ব্লু-স্টার প্ল্যাণ্টে। বেঙ্গল পিছিয়ে যাবে না কেন? ওয়ার্ক কালচার নিয়ে খালি লেকচার মারলেই হয় না।

এই রে! এ যে পলিটিক্স এনে ফেলছে! ওতে আমি নেই। একেবারে সাইলেণ্ট হয়ে রইলাম।

হিরের নেশায় তড়বড় করে বলে গেল রবি—আট লাখ... শুনছিস? আট লাখ ইণ্ডিয়ান ডায়মণ্ড কারিগর এখন অতি পুঁচকে হিরে কেটেও খাসা হিরে বানিয়ে দিচ্ছে। খুদে খুদে হীরক-কণাদের গায়ে ৫৮টা দিক তুলে তবে ছাড়ছে।

কথাটা আমার কর্ণ-কুহরের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে কুহক সৃষ্টি করে গেছিল আমার মগজের কোষে কোষে। যে হিরক-কণা সাইজে প্রায় বালুকাদানার মতো

তার গায়ে আটান্নটা দিক খুদে খুদে তোলা তো আলিবাবার আশ্চর্য প্রদীপের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। একি জাদুবিদ্যা!

আমার মনের প্রশ্নটা টেলিপ্যাথি দিয়ে জেনে নিয়ে মুখে মুখে জবাব দিয়ে গেছিল রবি—জহর বিদ্যা... জহর বিদ্যা... একেই বলে ইণ্ডিয়ান হিরে কাটিং। ফলটা কি হয়েছে জানিস? ওয়ার্ল্ডের নানান অঞ্চল থেকে, এমনকী আমেরিকা থেকেও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড নামে বাতিল হিরে চলে আসছে ইণ্ডিয়ায়—খুবসুরৎ হয়ে ফিরে যাচ্ছে জড়োয়ার জেল্লা বাড়াতে।

আমি চুপ।

রবি বলছে, ইন্দ্র, এই হিরে জিনিসটার সঙ্গে শনি গ্রহের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সেটা নিয়ে ভাবতে পারিস। না, না, তুই জ্যোতিষী নস, কিন্তু তুই ডিটেকটিভ। ডিটেকশনের ডিডাকটিভ মেথড প্রয়োগ করে ভেবে দেখতে পারিস, মস্ত গ্রহের অশুভ আকর্ষণ কেন মন্দ ভাগ্য রচনা করে যায় মানুষের জীবনে। জ্যোতিষশাস্ত্র একেবারে উড়িয়ে দিসনি। যা জানা নেই, তার অস্তিত্ব নেই--এমন ধারণা মাথার মধ্যে পোষণ করলে বিজ্ঞান আজ অদৃশ্য জগতের অনেক রহস্যময় শক্তির হদিশ পেত না।

আমি মুখ খুলেছিলাম রবি যেই একটু আনমনা হয়েছে--হিরের প্রতাপ অদৃশ্য অবস্থায় শক্তি খাটিয়ে তোকে নিয়ে এল সুরাটে। তারপর?

সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল রবি। এতক্ষণ যেন ঘোরে ছিল—হিরের ঘোর। সত্যিই একটা আশ্চর্য পাথর।, এমন মোহ সৃষ্টি করতে পারে...

রবি বললে, হিরেময় ধুলো ইণ্ডিয়ার প্রাচীন যে শহরের গলিতে উড়ছে, পদার্পণ করলাম সেই শহরে!

হিরেময় ধুলো!

আজ্ঞে! পুরনো সুরাটের বিশেষ কয়েকটা গলির মধ্যে ঢুকলে ঠিক এই রকমটাই তোর মনে হবে। ধুলো পর্যন্ত হীরকিত... বিশেষণটা বাংলায় নতুন... তাই না? হোক। সরু রাস্তায় পা দেওয়ার জায়গা অথচ কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়ে চলেছে নিমেষে নিমেষে। বহু রঙের, বহু চেহারার হিরে ঝকমকিয়ে যাচ্ছে সেখানে পলকে পলকে। মানুষে মানুষে গিজগিজে সেই সব গলিতে চার চাকার গাড়ি ঢোকা বন্ধ সরকারি নির্দেশে। আমি, এই ছাপোষা বাঙালি, ঢুকেছিলাম সেই হিরের গলিতে। শুনেছিলাম হিরে কিনিয়ে গুজরাতিদের র‍্যাপিড-ফায়ার গুজরাতি বুকনি। দেখেছিলাম, এক ভিখিরি ছেলে কিভাবে গলির ধুলো বুরুশ দিয়ে চেঁচে তুলছে কৌটোর মধ্যে—যদি আসমান প্রসন্ন হয়, কুচো হিরে পেয়ে যেতে পারে—হাত ফসকে পড়ে যাওয়া হিরের কণা।

হিরে পাথরটার সত্যিই বোধহয় একটা অদৃশ্য প্রভাব আছে। মেপে আর ওজন করে কথা বলার পারিপাট্যে যাকে জহুরি বিশেষ বলা যায়, সেই রবি'র সেদিনকার আচ্ছন্ন অবস্থা দেখে আমি আর বাগড়া দিইনি।

হিরে-জ্বর বড় ভয়ানক জিনিস। নইলে বাক্য-বিশারদ রবি এত কথা সেদিন

বলবে কেন? বলেছিল বলেই অবশ্য এই রহস্য উপাখ্যানের মূল সূত্রটা ধরে ফেলেছিলাম।

হিরের গলিতে সেদিন কত রকমের আর চেহারার হিরে ঝলসে উঠেছিল রবির চোখের সামনে, সে সব কাহিনী রোমাঞ্চকর নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না। পাতলা কাগজের মতো কালো হিরেও নাকি ও দেখেছিল—অবিশ্বাস্য কাটিং দেখে ওর চোখ ঠিকরে গেছিল। দেখেছিল ক্যানারি হলুদ হিরে। গুঞ্জন শুনেছিল পিছনে গুজরাতি ভাষায়—হুঁশিয়ার! এ যে ঝেঁটিয়ে হিরে কিনতে এসেছে!

রবি তখন গুজরাতিতেই বলেছিল, ঝেঁটিয়ে কিনতে আসিনি। হলুদ হিরে, কালো হিরে, কমলা হিরে, লাল-বেগুনি-সবুজ হিরেতে আমার দরকার নেই।

তবে কি দরকার?

ছোট হিরে! খুব ছোট সাদা হিরে!

বালুকা-সদৃশ আশ্চর্য হীরক কণিকাদের দর্শন পেয়েছিল রবি তখনই। জহুরি দণ্ডপথের দৌলতে!

১৫. জহুরি দণ্ডপথ আর রঙিন হিরে

রবি বুঝি সেদিন হীরক-মদিরায় হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিল। নইলে অত গোপন কথা অমন গড়গড়িয়ে বলে যাবে কেন?

গুজরাতি জহুরিদের বাক্য-বর্ষণকে ও র‍্যাপিড-ফায়ার বচনমালা বলেছিল। কিন্তু ওর নিজের মুখবিবর থেকেই কথার বুলেট বেরিয়ে আসছিল মেশিনগানের বুলেট বর্ষণের মতো।

ইন্দ্র. জহুরি দণ্ডপথ লোকটা যে বালি-হিরের কারবারে এক্সপার্ট, সেটা জেনে গেলাম দালালের মারফত। এই এক যুগ এসেছে ইণ্ডিয়ায়। দালালদের যুগ। তুই যা চাস, তাই পাবি, শুধু দালাল নামক শিবানুচরদের খুশি রাখতে হবে। শিবের অনুচর বলতে কাদের বোঝাচ্ছি, তা নিশ্চয় তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

যাগগে, যাকগে, জহুরী দণ্ডপথ লোকটা গলির গলি তস্য গলির মধ্যে একটা ছোট কিন্তু যেন গান-মেট্যাল দিয়ে সুরক্ষিত ঘরে বসেছিল মেঝের লিনোলিয়াম কার্পেটে। সামনে একটা মামুলি কাঠের ডেস্ক—রাইটিং ডেস্ক—যে রকম ডেস্ক আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলে দেখেছি—তবে এই ডেস্কে রাইটিং মেটিরিয়াল কিসসু থাকে না—শ্বেতভুজা সরস্বতীর প্রবেশ এখানে নিষেধ—থাকে শুধু মা লক্ষ্মীর চরণ বন্দনা করবার মতো অবিকল বালির সাইজে রঙিন হিরে।

আসছি, আসছি, রঙিন হিরের অবিশ্বাস্য বর্ণনায় আসছি। সে বর্ণনা শুনলে তোর প্রত্যয় হবে না জানি, তবুও বলে যাব। তার আগে শুনে রাখ, ছোট্ট এই ঘরটার প্রতিবর্গ ইঞ্চির ওপর নজর রেখে চলেছে বেশ কয়েকটা ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা আর টিভি। চার দেওয়ালের ওপরের কোণে শুধু দেখা যাচ্ছে তাদের লেন্সের ঝিকিমিকি। বুঝে নিলাম, বিবররাসী এই ব্যক্তির চারদিকে ত্যাগ করে

রয়েছে বেশ কয়েকটা আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্র—সাইলেন্সারের দৌলতে যারা বুলেটের ঝড় বইয়ে দিতে পারে—নীরবে নিঃশব্দে।

অধীর না হয়ে কান পেতে শুনে যা, ইন্দ্র। আমার জীবন বড় বাঁক নিয়েছিল এই ঘরে... অথবা, এই ঘরের পিছনকার জহর কারখানায়।

জহুরি দণ্ডপথ লোকটাকে মূর্তিমান ইন্দ্র বলা যেতে পারে... চমকে উঠলি? আরে বাবা, ইন্দ্র যে সহস্র চক্ষুর অধিকারী, তা তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে.. এই মানব-ইন্দ্র, ইয়ে, মানবেন্দ্রর হাজার চোখ গজিয়েছে মেয়েছেলে দেখে দেখে নয়—স্রেফ হিরে দেখে দেখে।

বয়স যথেষ্ট হয়েছে। অথচ সুপুরুষ। গুজরাতিরা বোধহয় যাদবকুল থেকে এসেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি পেয়েছে পুরোমাত্রায়। তবে মনে হয় শ্বেতসুধায় স্নান করে আসার দরুণ অর্জন করেছে অমন ধবল বরণ। দণ্ডপথ সদাহাস্যময় জহর বণিক। হাসি তাঁর চোখের তারায়—যা কালো হিরে বলেই মনে হয়—হাসি ঠোঁটে. কথাবার্তা এতই মিষ্টি যে, মনে হয় শুকনো চিঁড়েও ভিজিয়ে দেওযার ক্ষমতা রাখে।

আমার এই মারকাটারি ফিগার দেখে এতটুকু ভড়কে না গিয়ে আমার বচন আর অভিপ্রায় ধৈর্য সহ শ্রবণ করলেন। তারপর ওই কাঠের ডেস্কের ডালা খুলে, আমাকে ভেতরের বস্তু না দেখিয়ে, একে একে বের করলেন রুপোর বাটি।

এক-একটা বাটিতে এক-এক রঙের হিরে। সাইজে বালির দানার চাইতে বড় নয়। কিন্তু প্রতিটা বাটি থেকে ঠিকরে আসছে রামধনুর এক-একটা রং। সংক্ষেপে যাকে আমরা বলি ভিবগিওর—ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়োলো, অরেঞ্জ, রেড।

আমি, ইন্দ্রনাথ, আমি শ্রী রবি রে, চোখের তারা নিশ্চয় স্থির করে ফেলেছিলাম সেই অবর্ণনীয় বর্ণচ্ছটা দেখে।

জহুরি দণ্ডপথ তখন ঈষৎ হাস্য করেছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাদা হিরে কোথায়? আসলি হিরে? এ তো সব রঙিন কাচ।

জহুরি দণ্ডপথ তারিয়ে তারিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলেছিলেন, মাই ডিয়ার বেঙ্গলি ফ্রেণ্ড, সাত রঙের হিরে মিশিয়ে দিলেই সাদা রঙের হিরে হয়ে যায়। এই দেখুন, বলে, ডেস্কের ভেতর থেকে বের করেছিলেন অষ্টম বাটি—যে বাটিতে রয়েছে শুধু সাদা বালি—হিরের বালি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কালো হিরে কই?

অমনি নবম বাটি বেরিয়েছিল ডেস্কের অন্দর থেকে। তাতে থই থই করছে, থুক থুক করছে কালো হিরের বালি।

হিরের চোখ নাচিয়ে জহুরি দণ্ডপথ তখন আমাকে যে হিরে-বন্দনা শুনিয়েছিলেন, তার সবটা গুছিয়ে তোকে বলতে পারব না। শুধু শুনে রাখ, এই বিশ্বে, এই

ব্রহ্মাণ্ডে অযুত নিযুত সূক্ষ্ম শক্তি অজস্র বর্ণ নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। মানুষের শরীর-মন-ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই সূক্ষ্ম শক্তিদের এক-একটা হিরের কাঠামোয় ধরে রাখা হয়েছে। এ শক্তি আছে শুধু জহুরি দণ্ডপথের। তিনি তা অর্জন করেছেন প্রাচীন পুঁথিতে লেখা মন্ত্রশক্তি দিয়ে। সে পুঁথি তিনি পেয়েছেন তিব্বতে।

আমি নিজে সেলসম্যান। সেলস টক দিয়ে আমাকে ভাঁওতা মারা যায় না। আমরা দুঁদে সেলসম্যানরা, বলেই থাকি, এক সেলসম্যান আর এক সেলসম্যানকে ঠকাতে যায় না।

তাই মনে হল, জহুরি দণ্ডপথ সত্য বলছেন।

কথা বাড়ালাম না। শুধু জানতে চাইলাম, এমন খুদে হিরে কাটাই হচ্ছে কোথায়? আটান্ন দিক তুলছে কারা?

জহুরি দণ্ডপথ আমার চোখে চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর মধুর হেসে বললেন, ইয়ংম্যান, যদি তাদের কাউকে পছন্দ হয়, তাহলে দেখাতে পারি।

আমি অবাক গলায় বলেছিলাম, আমি হিরে পছন্দ করতে এসেছি, হিরে কাটিয়েদের নয়। কিন্তু আটান্ন দিক কেটে বের করছে যারা, তাদের দেখার ইচ্ছেটা আছে।

দণ্ডপথ বললেন, তারা মনের মানুষদের মন কেটে আটান্ন দিক বের করতে পারে।

হেঁয়ালি বুঝলাম না। শুধু চেয়ে রইলাম।

দণ্ডপথ তখন যা বললেন, তা পরে বলছি। তবে... কল্পনা চিটনিসকে প্রথম দেখলাম সেই হিরে কারখানায়।

১৬. মানিক দানার কারখানায়

ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আমার অদ্ভুত কাহিনি তোর কাছে উদ্ভট মনে হচ্ছে—তোর চোখে অবিশ্বাসের রোশনি দেখছি, তাই ছোট করে আনছি। মূল কাহিনি থেকে একটু-আধটু ফ্যাকড়া বেরয়। বড় গাছের শেকড় যেমন অনেক, ডালপালাও তেমনি অনেক। সুপুরি, নারকেলগাছের ছোট গপ্পো এটা নয়। এ বড় জাঁকালো-জমাটি ব্যাপার।

জহুরি দণ্ডপথকে চোখে চোখে রেখে কথায় কথায় কেটে কেটে যে ব্যাপারটা কারখানায় ঢোকবার পূর্বাহ্নে জেনেছিলাম, তা অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি।

এই ব্যাপার আমি হো চি মিন শহরে দেখেছিলাম। ফের দেখলাম সুরাটে। ভিয়েতনামের মিস্টার কিউপিড ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচমেকার্স সার্ভিস সাড়ে তিন হাজার কুমারী... ইয়ে... অক্ষতযোনি, মেয়েদের কাজ দিয়ে একটা বাড়িতে রেখে

দেয়... মাইনে দেয় না... কিন্তু বর জুটিয়ে দেয়... ফরেনার বর... অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি... গরিব মেয়েরা রীতিমতো দরখাস্ত পাঠিয়ে সেখানে আসে বর জোটাতে... রিয়াল ভার্জিন কি না, তার পরীক্ষা দিতে হয়... ভার্জিনিটি টেস্ট... হাইমেন ছিন্ন হয়েছে কিনা... হাইমেন মানে যে সতীচ্ছেদ, তা তোর মতো চিরকুমারকে বোঝানো দরকার বলেই বললাম... তলপেটে রেখা পড়েছে কিনা অথবা, সিজারিয়ান অপারেশনের কাটা দাগ আছে কিনা, তাও দেখা হয়—আগে পেটে বাচ্চা এসেছিল কিনা জানবার জন্যে... জঘন্য... কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ... আজও এই সংস্থা চালু রয়েছে... তোর যদি সতী বধূর দরকার হয় যেতে পারিস... হাসছিস?

জহুরি দণ্ডপথ ঠিক এই সিস্টেম চালু করেছেন নিজের মাণিক কারাখানায়। স্বয়ংবরা হতে ইচ্ছুক মেয়েদের এনে কাজ শেখান... কাজ করান... বর জুটিয়ে দেন... ভার্জিনিটি টেস্ট করেন কিনা, সেটা জানতে চাইনি... হিমালয়ে আজও দ্রৌপদী গোত্রের মেয়েরা পাঁচখানা বর রাখতে পারে... বিয়ের আগে বা পরে... জানিস না? জেনে রাখ। সেলুকাস, বড় বিচিত্র এই দেশ।

এইসব বাগাড়ম্বর শুনিয়ে মানিক কারখানায় আমাকে ঢুকতে দিয়েছিলেন জহুরিমশাই। ফিকে সবুজ হিরে চোখ দিয়ে একটি মেয়ে আমাকে টেনেছিল। তার নাম কল্পনা। মা নেই, অভাবে পড়ে বদ পথে না গিয়ে বর খুঁজতে এসেছিল জহর কারখানায়।

কল্পনা কাহিনি এখন থাক। জহর কাহিনি হোক।

জহুরি দণ্ডপথ আমার মনের কৌতূহল মিটিয়ে দিয়েছিলেন হিরে পাথরের অলৌকিক শক্তির উৎস শুনিয়ে। ব্যাপারটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে রেখে শুনে রাখ, ইন্দ্র, আখেরে কাজ দিতে পারে।

ফোর্থ ডাইমেনশন নাকি টাইম। আইনস্টাইন এ রকম একটা আভাস নাকি দিয়েছেন। যাকগে...যাকগে... ভুল হলে শুধরে দিস। জহুরি দণ্ডপথ তিব্বত থেকে চিনেদের চোখে ধুলো দিয়ে, শিখে এসেছেন... অজস্র ডাইমেনশন রয়েছে এক-একটা হীরক খণ্ডের মধ্যে। এক-একটা দিক এক-একটা কিউব... ঘনক... রচনা করেছে হিরের মধ্যে... অনেক ঘনক ভেতরে ভেতরে ঢুকে কল্পনাতীত ডাইমেনশন সমষ্টি রচনা করে রয়েছে... শেষ নেই... শেষ নেই... এক-একটা ডাইমেনশনে এক-একটা শক্তি... সূক্ষ্ম শক্তি... আধুনিক কোয়ান্টাম থিওরি তো সবে বলছে, ন'টা ডাইমেনশন থাকলেও থাকতে পারে... তিব্বতি জ্ঞানীরা বলছেন— এই ব্রহ্মাণ্ড যেমন অনন্ত, এক-একটা হিরে, তেমনি অন্তহীন শক্তিপুঞ্জের আধার... হীরকশক্তির মূল সূত্রটা এইখানেই।

ইন্দ্র, কল্পনাকে পেলাম, রঙিন হিরেদের সৃষ্টি কীভাবে, তাও জানলাম। তিব্বতি প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম শক্তিদের সংহত করেছেন জহুরি দণ্ডপথ। শুধু জেল্লা দেখানোর জন্যে নয়, বিশেষ বিশেষ শক্তির আধার সৃষ্টি করবার জন্যে...

সেলস টক? হয়তো তাই। হিরে বেচতে জানেন দণ্ডপথ।

আমি কিন্তু হিরে-বুঁদ হয়ে গেলাম। নন্দিতা, কল্পনা, দণ্ডপথ—এই তিনজনের

কাছ থেকে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলাম, যে প্রেরণা পেয়েছিলাম—তার তাড়নায় হিরেদের উৎস সন্ধানে টহল দিয়ে গেছিলাম দেশে দেশে... জেনেছিলাম বিস্তর রক্তাক্ত কাহিনি...

অ্যাডভেঞ্চার... অ্যাডভেঞ্চার... অ্যাডভেঞ্চার...

১৭. হিরের খনি! হিরের খনি!

তার আগে শুনে নিয়েছিলাম জহুরি দণ্ডপথের মুখে— হিরে, কত রকমের অভিশাপ টেনে এনেছে দেশে দেশে, কত রক্ত ঝরিয়েছে... কত রাজ্যের উত্থান আর পতন ঘটিয়েছে...

মানুষটা নিজেই একটা হীরক-ইতিহাস... আশ্চর্য! আশ্চর্য!

শুধু কি তিব্বত, হিরে তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে যেখানে খনি, যেখানে হিরের কারবার... সেইখানে, সেইখানে... কি জানি কেন আমার মতো উজবুককে উনি স্নেহের চোখে দেখে ফেলেছিলেন অথবা কিঞ্চিৎ কৃপাবর্ষণ করেছিলেন—কারখানার কল্পনাকে জীবনসঙ্গিনী করবার পথে পা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম বলে... না করেও পারিনি, ইন্দ্র... যা কারও কাছে বলা যায় না, তা প্রিয় বন্ধুর কাছে বলা যায় .. কল্পনা আমাকে টেনেছিল কেন? ওর চোখ দিয়ে... ওর চোখ দিয়ে... চিরকাল জুলিয়েটেরা রোমিওদের যেভাবে টেনে ধরে... সেইভাবে... যে পন্থায় চুয়া মোহন করেছিল চন্দনাকে... লায়লা-মজনুর কাহিনি রচিত হয়েছে যেভাবে, সেইভাবে... সেইভাবে..স্রেফ চাহনিবাণ মেরে... মোহন চাহনি দিয়ে আমাকে মগ্ন করে দিয়েছিল.. যাচ্চলে... হিরের কথা বলতে বলতে ফের মানবী-হিরের কথায় চলে এলাম... হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কল্পনা একটা হিরের টুকরো কন্যা...

ভুরু নাচাচ্ছিস? নাচা, নাচা, প্রেমে তো কখনও পড়িসনি... যেদিন পড়বি, বুঝবি কত ধানে কত চাল। কি কথা হচ্ছিল? জহুরি দণ্ডপথ আমাকে স্নেহের চোখে দেখে ফেলেছিলেন। জহুরি যে, মানুষ চিনতে পারেন... আমি অমানুষ নই বলেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন মেকি আর আসলি হিরে কি করে চিনতে হয়... কি করে বালির দানার সাইজের হিরের আটান্ন দিক সত্যিই আছে কিনা, দেখে নিতে হয়... যা দিয়ে দেখতে হয়, আতস কাচের মতো সেই জহুরি যন্তরটার নাম ইংরেজিতে লউপ... অথচ কোনও ইংরেজি ডিক্সনারিতে এ নাম খুঁজে পাইনি...তাতে কিছু এসে যায় না... জহরবিদ্যা বড় বিদ্যা, এ বিদ্যা যায় না মারা... দণ্ডপথ আমাকে শিখিয়ে দিলেন বালির সাইজের খুদে হিরের ঝকঝকে আটান্নটা দিক যাচাই করে নেওয়ার বিদ্যে...হিরেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে নিয়ে ওই লউপ-এর ফোকাস মেরে...

আমি তখন হিরে কেনার কারবার শুরু করেছিলাম। একশো আটষট্টিটা বালি সাইজের হিরে কিনেছিলাম... ছ'হাজার টাকা ক্যারাট দামে... খুদে হিরে... খুদে হিরে... এ যুগটা মিনিয়েচার করার যুগ... হিরে-মিনিয়েচার শিল্প দখলে রেখেছেন

দণ্ডপথ নিজের কারখানায়... এক-একটা খুদে হিরের আটান্ন দিক তুলতে সময় লাগে মাত্র তিনঘণ্টা...

তোর চোখ দেখে বুঝছি, ইন্দ্রনাথ, তুই হীরক সমাচ্ছন্ন হয়েছিস... একেই বলে হিরের নেশা... মদের নেশার চাইতেও মারাত্মক... এই নেশায় পাগল হয়ে গিয়ে আমি দেশে দেশে ঘুরেছি... সাউথ আফ্রিকার বিশাল হিরের খনি দেখেছি... আণ্টওয়ার্প, নিউইয়র্ক, তেল-আভিভ-এর হিরে কেনাবেচার বাজারে টহল দিয়েছি... হিরে নিয়ে লড়তে গিয়ে যেসব দেশ ধ্বংস হয়েছে, সেই সব দেশ পরিক্রমা করে এসেছি... কিন্তু সুরাট শহরের মূল ডায়মণ্ড এলাকা ভারাচা রোড-এর মতো হীরক-হাট কুত্রাপি দেখিনি... কি বললি? কুত্রাপি মানে কি? ইডিয়ট... কুত্রাপি মানে, কোথাও, কখনও... আধুনিক বাংলায় গুলি মার... সাধু বাংলা ছাড়া মনের ভাব বোঝানো যায় না..

ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে নাকি? আমি নিরুপায়... হিরে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে... হিরে, হিরে, হিরে.. শয়নে স্বপনে জাগরণে উত্থানে এই হিরে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে... সব লিখতে গেলে একটা মহাভারত লেখা হয়ে যাবে... সুরাটের ব্লস্টার ডায়মণ্ডস ফ্যাক্টরি দেখবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন জহুরি দণ্ডপথ... আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন সেখানকার দুই মালিক অনুজ আর অক্ষয় মেটা'র সঙ্গে... আশ্চর্য কি জানিস, ইন্দ্র? ...যে বালি হিরে ছ'হাজার টাকা ক্যারাট হিসেবে কিনেছিলাম, দশহাজার টাকা ক্যারাট হিসেবে এদের কাছেই বেচেছিলাম... হিরের দালালিতে সেই আমার প্রথম লাভ...

তারপর অনেক ঘুরেছি, অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি... একদিনে হইনি ডায়মণ্ড এক্সপার্ট... কঙ্গোর ডায়মণ্ড অঞ্চলে মুবুজি মায়ি খনি দেখেছি, হিরেবাজ কাসাঞ্জির সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্ক গড়ে তুলেছি.. সেখানকার একখানা হিরের দাম তিরিশ লক্ষ ডলারে উঠে যাওয়ার পরেও সেই হিরে নিয়ে রক্ত ঝরানো খেলা শুরু হয়ে গেছিল... কঙ্গোয় তখন গৃহযুদ্ধ চলছিল একটানা দু'বছর ধরে.. উভয় পক্ষই যুদ্ধের খরচ জুগিয়ে যাচ্ছিল হিরে বেচে.. মাসে মাসে হিরের কারখানা থেকে আড়াই কোটি ডলার খাজনা আদায় করে যাচ্ছিল গভর্নমেণ্ট। আর্মি আদায় করছিল তোলা—হিরের খনি থেকে। হাত মিলিয়েছিল বিপ্লবীরাও। সে এক নয় ছয় কাণ্ড।

দু'হাজার সালের আগস্টে কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট নিরুপায় হয়ে, যুদ্ধের খরচ জোগাতে, হিরের খনির এক্সক্লুসিভ রাইট বেচে দিয়েছিলেন ইজরায়েলের একটা কোম্পানিকে দু'কোটি ডলারে। কাসাঞ্জির রত্নখনি থেকে হিরে স্মাগলিং শুরু হয় তখন থেকেই—চলে যায় বর্ডারের ওপারে।

শুরু হয়েছিল হীরক যুদ্ধ। বহু আগে যেমনটা হয়েছিল এই ভারতে। অ্যাংগোলান বিপ্লবী সাভিমবি আকাটা হিরে সাপ্লাই দিয়ে গেছে হরদম, ইউনিতো আর্মি পাঠিয়ে দখল করেছে কুয়ানগো উপত্যকার হিরের খনি... যার দাম চার বিলিয়ন ডলার। হিরে অভিশাপে মরতে বসেছিল অ্যাঙ্গোলা .. রক্তাক্ত হিরে নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে আফ্রিকার অন্য অন্য অঞ্চলেও... শুরু হয়েছে হিরে লুঠ... সাঙ্কো সৈন্যরা অসহায় কারিগরদের

লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে হাত আর পা কেটে দিয়েছে—দেশের লোককে ভয় দেখাতে... বাচ্চাদেরও বাদ দেয়নি... নরপিশাচ... মানুষখেকো... এই ভাষায় খবর বেরিয়ে গেছিল 'নিউইয়র্ক পোস্ট' কাগজে ১৯৯৯ সালে... ইন্দ্র, পড়ে নিস... যদি এখনও অবিশ্বাস থাকে অভিশপ্ত হিরে বাণিজ্যের কাণ্ডকারখানায়। নেলসন ম্যাণ্ডেলা তো বলেইছিলেন—হিরে বয়কট করলে বোটসওয়ানা আর নামিবিয়ার অর্থ ব্যবস্থা... আই মিন, ইকনমি ভেঙে পড়বে। আমেরিকান কংগ্রেস আইন প্রণয়ন শুরু করেছিল 'ক্লিন' ডায়মণ্ডের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে—যে হিরেতে লেগে নেই রক্ত... লেগে নেই চোখ ধাঁধানো হিরের নেকলেসে।

এত সত্ত্বেও, এত রক্তাক্ত ব্যাপারের পরেও, হিরে পরশ পাথর হয়ে রয়েছে বহুত মানুষের কাছে।

অভিশপ্ত পাথর কিছু মানুষের কাছে। আমার এই কাহিনির অবতারণা সেই জন্যেই... হিরে মানুষকে অমানুষ করে তোলে... ছেলেদের পিশাচ আর মেয়েদের পিশাচি বানিয়ে দিতে পারে।

ইন্দ্র, কল্পনা এই হিরে বাণিজ্যে গা না ভাসালেই ভাল করত। তাই ওকে আমি তুলে এনেছিলাম সুরাট থেকে। বিয়ে করেছিলাম! ডায়মণ্ড কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছিলাম ব্যাঙ্গালোরে। তবে হ্যাঁ, ওর ব্রেন আমাকে হেল্প করেছিল... এখনও করছে...

তারপর?

উধাও হয়ে গেল হিরের ডিম।

১৮. পাথরের মন্ত্রশক্তি আর ক্রিস্টাল কুহেলিকা

ইন্দ্র, আমি বুঝতে পারছি, তোর হিরে-চোখের চাঞ্চল্য দেখে টের পাচ্ছি, তুই অধৈর্য হচ্ছিস। কিন্তু হে বন্ধু, আমার মুখের আগল যখন খুলে যায়, তখন যে উনপঞ্চাশ পবনের ধাক্কায় ফুলে ওঠে মন-বজরার পাল। সুখ-দুঃখের এলোমেলো ভিড়ের কথা উপছে ওঠে মনের মতো দোস্তের কাছেই। এই জীবনের গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে আচমকা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম একটা হিরে। সে আমার কল্পনা... সে আমার কল্পনা... পাহাড়ের মেয়ে কল্পনা... আশ্চর্য এক পাথরে গড়া তার মন... কখনও কোমল... কখনও কঠিন...

আমি যেন কি রকম হয়ে গেছিলাম তার সবুজ পাথর চোখ... অথচ পাথরের মতো নিষ্প্রাণ নয় সেই চোখ.. যেন সবুজ আকাশ... অন্য এক গ্রহের অন্য এক আকাশ... সবুজ... সবুজ... সবুজ...

আমার মোহাবিষ্ট চোখ দেখে মৃদু হেসে জহুরি দণ্ডপথ বেশ কিছু উপদেশ মন্ত্র আমার কানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন। জাত জহুরি তো... পাথর দেখে চেনেন... মানুষ দেখে বোঝেন... বিশেষ করে মেয়েমানুষ...

হাজারো কথার মধ্যে একটা ব্যাপার আমার মাথার মধ্যে কথার পেরেক ঠুকে ঠুকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাপু হে, হিরে যখন তোমাকে টেনেছে, ওষুধের

কারবারে থেকেও হিরের কারবার নিয়ে মেতেছ, তখন একটা ব্যাপার সদা জাগ্রত রাখবে তোমার মনের পটে। ব্যাপারটা মানব মনের মূল প্রকৃতি নিয়ে—হিরের টান এড়াতে পারে না। হিরে একটা ক্রিস্টাল প্রহেলিকা... ভাগ্যবিধাতার সেরা সম্পদ। প্রচ্ছন্ন থাকে হিরের ক্রিস্টাল দুর্গে... হিরে হাতে নিয়ে তাই হাতছাড়া করতে চায় না কোনও মানুষ... রাখতে চায়... সঙ্গে সঙ্গে... হিরের মন্ত্রশক্তি যেন ঘুরিয়ে দেয় তার ভাগ্যচক্র... মনোরথ ধেয়ে যায় চক্রনির্দিষ্ট বিজয় পথে...

ইন্দ্র, জহুরির এত কথার কাব্য আমার মাথায় ঢোকেনি। আমি চিরকাল নীরস, কাঠখোট্টা। তাই পষ্টাপষ্টি জানতে চেয়েছিলাম, হিরের আবার মন্ত্রশক্তি কি? হিরে তো একটা পাথর!

চোখ নাচিয়ে হাস্য করেছিলেন জহুরি দণ্ডপথ। অট্টহাস্য নয়, মৃদু হাস্য। যাকে কবি-কবিরা বলে স্মিতহাসি! বৃদ্ধের কেউ নেই। না পুত্র, না কন্যা, না ঘরণী। হিরে ছাড়া তাঁর দুনিয়ায় আর কিচ্ছু নেই। আমাকে তাঁর হিরে চোখ দিয়ে দেখেছিলেন, হিরে চোখ দিয়ে মেপেছিলেন, হিরে চোখ দিয়ে কাছে টেনেছিলেন, হিরে চোখ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন।

তাই, ইন্দ্রনাথ, অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি, হিরের গুপ্ত শক্তির গোপন মন্ত্র অর্পণ করে গেছিলেন শুধু আমাকেই। হয়তো... না, না, হয়তো কেন, উনি নিশ্চিতভাবে জানতেন ওঁর শেষদিন আর দূরে নেই, তাই মন্ত্রশক্তির মহাকথা বলে গেছিলেন শুধু আমাকে...

জেনেছিলেন তিব্বতের যে পর্বত কন্দর থেকে, যে গুম্ফার গায়ে পাথরে আকীর্ণ সংস্কৃত মন্ত্রশ্লোক থেকে, সেই গুম্ফা এখন পৃথিবীর জঠরে।

তিব্বত যে গুটিয়ে যাচ্ছে... সরে যাচ্ছে এশিয়ার দিকে... বছরে বত্রিশ মিলিমিটার হিসেবে... সরছে ইণ্ডিয়ান প্লেট— গ্লোব্যাল পজিশনিং স্যাটেলাইটের হিসেবে...

অন্য কথায় চলে যাচ্ছি... বিজ্ঞানের কথা এখন থাক... আসুক অপবিজ্ঞান.. যুক্তি বিজ্ঞানের ধ্বজা তুলে যারা পাড়া মাতাচ্ছে... অপবিজ্ঞান শব্দটা তাদের কাছ থেকে ধার করে এনে তো শোনালাম। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তা তো অপবিজ্ঞান হোক... মন্ত্র রচনার যুগে জন্ম হয়নি যে হিরে পাথরের, অমৃত নিভৃত শক্তির আধার সেই হিরে পাথরের শক্তিকে জাগ্রত করা যায় যে মন্ত্রশক্তি দিয়ে, জহুরি দণ্ডপথ আমাকে তা শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন... তারপর আচমকা দেহ রেখেছিলেন।

রসময় রহস্যের সে কথা আসবে পরে। এখন শোন হিরেকে জাগাতে হয় কী করে। কিন্তু, হে বন্ধু, এ কথা যেন পাঁচকান না হয়, তত্ত্ববিজ্ঞানীরা... যাকে তোরা বলিস অকাল্টসায়েন্টিস্ট .. পরাবিজ্ঞানী... তাঁরা কিন্তু লাফিয়ে উঠেছিলেন . হীরক শক্তি জাগরণের পন্থা-প্রকরণ জানবার জন্যে আমার পেছনে আঠার মতো লেগেছিল... কাউকে বলিনি... কাউকে বলিনি... সবাই তো আর ইন্দ্রনাথ রুদ্র নয় . সে যে একটা সচল সিন্দুক!

ইন্দ্র, সুনামির বিধ্বংসী ক্ষমতার আভাস কিন্তু টের পেয়েছিল মনুষ্যেতর প্রাণিরা— তাদের দৌলতেই আন্দামানের অনুন্নত মানুষরা কেউ মরেনি। পালিয়ে বেঁচেছিল।

তাহলে তো দেখাই যাচ্ছে, অত্যুন্নত মানুষ যন্ত্রবিজ্ঞানের দৌলতে যে প্রলয়ঙ্কর শক্তির পূর্বাভাস ধরতে পারে না, জীবজন্তু প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় তা জেনে ফেলে।

তাহলে, অদৃশ্য জগতে এমন কিছু আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যশালায় এখনও ঠাঁই পায়নি... কিন্তু আছে, আছে, সেই সব শক্তি বিলক্ষণ বিদ্যমান রয়েছে... জেনেছে পরাবিজ্ঞান... প্রাচীন বিজ্ঞান... গুপ্ত বিজ্ঞান... গুহ্য থেকে গেছে সেকালের তত্ত্ববিজ্ঞানীদের গোপনীয়তার দরুন।

এই ব্যাপারটা নিয়েই প্রথমে একটা ছোটখাটো লেকচার দিয়েছিলেন জহুরি দণ্ডপথ। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ জানি, তাই অল্পবিদ্যার দৌড় দেখাতে যাইনি। জানি বলে যে-জন করে অভিমান, কিছুই জানেনি তারা, জেনেছে যে-জন সেজন জানিবে হয়েছে বাক্যহারা। আমি যে একটা নাথিং, এই জ্ঞান যার থেকে, সে কিন্তু সামথিং জানতে পারে। যে বলে আমি জানি এভরিথিং, সে একটা নট, মানে, জিরো।

তোর অসীম ধৈর্যের তারিফ না করে পারছি না, ইন্দ্র। আমার এত বকুনি যে একটা মস্ত আশ্চর্য বিষয়ের গৌরচন্দ্রিকা, তা তুই তোর প্রিমনিশন, আই মিন, পূর্বাভাস-জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করেছিস।

তাহলে এখন আসা যাক হিরে প্রসঙ্গে। জ্যোতিষশাস্ত্র যা জানে না, সেই প্রসঙ্গে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে রেখে যা উদ্ভট এই তত্ত্বকে।

কাগজ কলম কোথায়? এই যে... এই আঁকছি একটা নক্ষত্র—এক টানে। কলম না তুলে।

লক্ষ্য করেছিস নিশ্চয়, কলম যেখানে বসালাম, সেখান থেকেই তুললাম। পাঁচ পয়েন্টের নক্ষত্র। তার ওপরে, নক্ষত্রের ডগায় ডগায় পাঁচ পয়েন্ট ছাড়াও, ভেতরে ভেতরে রয়েছে আরও পাঁচটা পয়েন্ট। বুঝলি না? বুঝিয়ে দিচ্ছি...
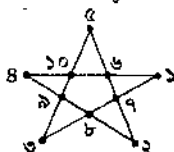
মোট দশটা পয়েন্ট পাওয়া গেল। দশটা বিন্দু। বিন্দু রহস্যের সূত্রপাত এইখান থেকেই। শক্তির দুর্গ। এ শক্তির আদি নেই, অন্ত নেই। অজানা অনন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে এই দশটা বিন্দুতে। এইবার আহরণ করতে হবে এই বিন্দু শক্তিকে—দশ বিন্দুতে দশটা হিরে বসিয়ে।

কীভাবে? গুপ্ত প্রকরণ এইখানেই, কিন্তু খুব সোজা। জহুরি দণ্ডপথের কাছে আগেই জেনেছিলাম, জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছিলাম, মোট ন'রঙের ন'টা হিরে তাঁর কাছে আছে—সাদা আর কালো প্লাস বর্ণালির সাত রঙের সাতটা হিরে... মনে পড়ছে?

উনি ন'টা পয়েন্টে বসালেন ন'খানা হিরে... দশম বিন্দু তখন হিরেহীন ...আমার চোখে চোখে চোখ রেখে বললেন, শক্তিস্রোত বইছে ন'টা হিরের মধ্যে দিয়ে... সূক্ষ্ম শক্তি... বর্ণশক্তি... আটকে আটকে যাচ্ছে দশম বিন্দুতে...ওই বিন্দুতে এখন যে হিরে বসানো হবে... গুপ্তশক্তির আধার হয়ে দাঁড়াবে সেই হিরে...

ইন্দ্র, এই মুহূর্তে তোর চোখে যে অবিশ্বাস দেখছি, আমার চোখেও সেই অবিশ্বাস দেখতে পেয়েছিলেন গুহ্যতত্ত্বজ্ঞানী জহুরি দণ্ডপথ। রাগ করেননি। দশম হিরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে দশবার একটা উৎকট সংস্কৃত মন্ত্র জপ করে গেছিলেন—আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে... আমার তা মুখস্থ হয়ে গেছে... কিন্তু তোকে তা বলতে পারব না... কথা দিয়েছি গুরু দণ্ডপথকে... পা ছুঁয়ে শপথ করেছি... তবে তুই প্রাণের বন্ধু... কাব্য দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি... মন্ত্রশক্তির যে অনুকম্প... ভাইব্রেশন... শব্দশক্তি... বিপুল এনার্জি... তা থাক শুধু আমার মগজে...

অধৈর্য হয়েছিস? তবে শোন আনাড়ির কবিতা...,

> সাত রঙের ছটা...
> খেলেছে নাচের উড়নিতে..
> নবম দশা পেয়েছে আমার মন্ত্রশক্তিতে..
> দশম পাথর ভিন্ন তখন মহাশক্তিতে।

ছন্দ মিলল না? দুঃখিত। আমি কবি নই। কিন্তু এটা তো জানিস, নয় সংখ্যাটা হিব্রু সংখ্যা বিজ্ঞান অনুযায়ী অসীম শক্তিধর? সেই শক্তি চলে আসে দশম বিন্দুর হিরেতে... তখন, ইন্দ্র,' শুধু তখন, ভাগ্যবিধাতার সেরা সম্পদ... নিয়তির নতুন লিখন হীরকের ক্রিস্টাল দুর্গে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। সেই হিরে যার অধিকারে আসে, সে হয় অসীম শক্তিধর। হিরে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ঘটে গেছে যুগে যুগে এই কারণেই... পাওয়ারফুল হিরেদের শুধু জবরদখল করে রাখলেই হয় না... তাদের শক্তি জাগানোর প্রক্রিয়াটাও শিখতে হয়... ইন্দ্র, আমি সেই প্রক্রিয়া জানি... জানি বলেই কোনও পুঁজি না নিয়ে আমি আজ ডায়মণ্ড কমপ্লেক্সের মালিক... ন'খানা পাথরের ডিমের দৌলতে।

পাথরের ডিম বৃত্তান্ত তোকে বলা হয়নি? গুছিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই—তোর মতো। এখন বলছি—পাঁচ কান যেন না হয়। সাত রঙের বালির সাইজের হিরে আমাকে দেখিয়েছিলেন জহুরি দণ্ডপথ, মনে আছে? উনি সেই রঙিন হিরেদের রেখে দিতেন পাথরের ডিমের মধ্যে... পেশোয়ারের পাথর কারিগরের গড়া পাথরের ডিম... দেখতে হাঁসের ডিমের মতো... তবে সাদা নয়... সারা গায়ে পাথরের রেখা... এমনভাবে গড়া যে পেঁচিয়ে খুলে ফেলা যায়... রেখাগুলো ঢেকে রেখে দেয় প্যাঁচের দাগ... এ ছাড়াও অবিকল ওই রকম আরও দু'টো ডিমের মধ্যে রাখতেন সাদা আর কালো হিরে... বালির সাইজের হিরে... দশম হিরেকে তুক... ইয়ে..., মন্ত্রপূত করে শক্তিধর করার জন্যে...

শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উনি ন'খানা হিরেই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

কল্পনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার পর... বিয়ের যৌতুক অথবা পণ হিসেবে... যা খুশি বলতে পারিস...

কিন্তু যে রহস্যটার আজও কোন কিনারা করতে পারিনি, তা তোকে আগে বলেছি... মানে, ছুঁয়ে গেছি...

পরের দিন সকালে জহুরি দণ্ডপথের শরীরটা পাওয়া গেছিল বিছানায়... কিন্তু প্রাণ ছিল না সেই শরীরে...

হে পাঠক, হে পাঠিকা, প্রায় দম বন্ধ করে শুনে গেছিলাম রবি রের অবিশ্বাস্য কাহিনি। ন'টা পাথরের ডিম যে তার হেপাজতে... জেনেছিলাম তখনই।

তার অনেক... অনেক পরে... ছ'খানা ডিম হল নিরুদ্দেশ। নিপাত্তা। নিখোঁজ। আর তার ঠিক পরেই বিয়ে ভেঙে গেল রবির। ছেলেকে নিয়ে আলাদা নীড় রচনা করেছিল কল্পনা। এক পয়সাও খোরপোস না নিয়ে। আমার দিকে কল্পনার সবুজ চোখের লেহন শুরু হয়েছিল এর পর থেকেই। কিন্তু সে অনেক পরের কথা... যদিও সেই ব্যাপার দিয়েই শুরু হয়েছে এই কাহিনি।

১৯. উৎকণ্ঠার মন্ত্র আর মত্ততার নৃত্য

কল্পনা নাম্নী কন্যা যে বিশেষ কঠিন পদার্থ দিয়ে নির্মিত, এই তত্ত্ব আহরণ করতে বিলক্ষণ সময় লেগেছিল রবি রে নামক দুঁদে সেলসম্যানের; যে নাকি মানুষ চরিয়ে খেয়েছে, দেশে দেশে ঘুরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তার মতো চৌকস সেয়ানা ধুরন্ধর চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকেও ঘোল খাইয়ে দিয়েছে এই কল্পনা... কল্পনা চিটনিস।

প্রিয় বন্ধু বলেই প্রথম মধুরাতের মধুকথা আমার কানে যৎকিঞ্চিৎ উপুড় করেছিল রবি। সখীদের নিয়ে, হীরক কারিগর বান্ধবীদের নিয়ে, কল্পনা সেই রজনীতে রমণ নৃত্য নেচে গেছিল রবির সামনে।

রমণীয় শব্দটাকে ইচ্ছে করেই একটু ছোট করলাম—এক কথায় লাখো কথা বলার জন্যে।

জহুরি দণ্ডপথ মানুষটা ছিলেন সত্যিই হিরের টুকরো। এই সংসারের পাথর-নুড়ির মধ্যে এমন হিরের কণা আচমকা এসে যায় বরাতে। রবি রের বরাত এই দিক দিয়ে বিরাট। জহুরি দণ্ডপথ হিরে চেনেন। তাই রবি নামক হিরের টুকরোকে বেছে নিয়েছিলেন। যে মন্ত্র কানে কানে বর্ষণ করেছিলেন, তা যুগ যুগ ধরে আতীব্র উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে গেছে মন্ত্রধারীদের মনের মধ্যে। ব্যতিক্রম ছিলেন না জহুরি দণ্ডপথ। তিনি দারপরিগ্রহ করেননি। চিরকুমার। এবং জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু হয়তো অনুক্ষণের উৎকণ্ঠার নিরসনের জন্যে নিশীথে শয়নকালে কিঞ্চিৎ অহিফেন সেবন করে যেতেন। নিয়মিত মাত্রা ছাড়িয়ে।

কল্পনার লকেট রবি রের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়ার আগে, বৈদিক বিবাহের

মাধ্যমে, কানে কানে অন্য মন্ত্র শুনিয়ে গেছিলেন আশ্চর্য এই বৃদ্ধ। যার সংক্ষিপ্তসার—বৎস রবি, যে মন্ত্র তোমাকে দান করে গেলাম, এ মন্ত্র তুমি দান করবে শুধু তোমার ঔরসজাত সন্তানকে।

রবি অবাক গলায় বলেছিল—তাহলে আমাকে শেখালেন কেন?

বৃদ্ধ বলেছিলেন, কারণ তুমি আমার পূর্বজন্মের পুত্র।

আপনি জাতিস্মর?

নিগূঢ় হেসেছিলেন জহুরি দণ্ডপথ। বলেছিলেন, বেশি জানতে চেও না। আশীর্বাদ করছি, রহস্যে রহস্যে রসময় হোক তোমার জীবন। নিজেই উদ্ধার করবে অনেক গুপ্তজ্ঞান। কিন্তু সাবধান। যা জানবে, তা পাঁচ কান করবে না। কল্পনার কানেও ঢালবে না।

এই বাণী তিনি রবির কানে বর্ষণ করেছিলেন মধুরাত শুরু হওয়ার কিছু আগে। শুতে চলে গেছিলেন—যথারীতি অহিফেনের কৌটো হাতে নিয়ে।

আর, রঙ্গিণী নৃত্য শুরু হয়েছিল তারপরেই। কল্পনার কাজের সহচরীরা গানে আর নাচে মাতিয়ে তাতিয়ে দিয়েছিল রবিকে। সেই আসরে আলো ছিল নিভু-নিভু, কিন্তু আলো জ্বলছিল প্রতিটি মেয়ের চোখে। বুঝি নক্ষত্র ঝলসে যাচ্ছিল প্রতি কন্যার কটিদেশের রত্ন আভরণে—প্রায় অনাবৃত চারু অঙ্গের প্রতিটি প্রদেশ ঝলকিত হচ্ছিল উদ্দাম উচ্ছল উদ্বেল নৃত্যের বিপুল ছন্দের মহাতালে। রঙ্গিণীদের কেন্দ্রে ছিল স্বয়ং কল্পনা। বরতনুতে আভরণ যত ছিল, আবরণ ছিল না সেই অনুপাতে। চকিত কটাক্ষের অব্যক্ত চাহিদা ফুটে ফুটে উঠছিল, ঠিকরে যাচ্ছিল প্রতিটি স্পন্দিত রোমকূপ থেকে। ফুলে ফুলে উঠছিল নাকের পাটা—নাসিকারন্ধ্রে বয়ে যাচ্ছিল বসন্তবনের হরিণীর দীর্ঘনিশ্বাস... গানে আর কথায়, উল্লোল ছন্দ আর দেহভঙ্গিমায় যেন বলে যাচ্ছিল কল্পনা—আমি বীর্যবতী, আমি বীরভোগ্যা, ডান হাতে নাও আমার সুধা, বামহাতে চূর্ণ করো আমার দেহপাত্র... অট্টহেসে পূর্ণ করো আমার শূন্য গর্ভ... ও গো মধুপ্রিয়... পান করো আমার শরীরের মধু... আদিম বর্বরতায় কঠিন হোক তোমার শরীর.. নিষ্ঠুর নিপীড়নে নিংড়ে নাও আমাকে...ঝড় হেঁকে উঠুক তোমার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, কামনার ঘূর্ণিপাকে এসে যাও তুমি আমার মাঝে... তোমার শরীরের লৌহদূর্গে আমি হতে চাই বিবরবাসী... বাজুক দামামা তোমার রুধিরে পেশিতে... মেতে যাও নির্মাণ নেশায়... ঝংকারে টংকারে ক্রেংকারে হুঙ্কারে মত্ততার এই নৃত্যের অবসান ঘটুক মহামিলনে।

মধুরাতের এ রকম প্রলাপ পাঠক এবং পাঠিকার অজানা নয়। যুগ যুগ ধরে এমন মধু মত্ততা চলে আসছে বিয়ের বন্ধনে নর এবং নারী কাছাকাছি হওয়ার পর থেকেই। ফুলকিতে ফুলকিতে ছেয়ে যায় উভয়ই. . দাবানলের পর আসে প্রশান্তি...

রবি বললে, ইন্দ্র, আমি হিসেব করে দেখেছি, সেই রাতেই আমি বাবা হওয়ার বীজ বপন করেছিলাম।

আমি অট্ট অট্ট হেসে বলেছিলাম—হে বীর, লহ মোর প্রণাম।

রবি বললে, এসব কথা সবাইকে বলা যায় না। তুই একটা ট্যাড়শ, তাই বললাম। পরের দিন সকালে দেখা গেল জহুরি দণ্ডপথ বডি ফেলে রেখে পালিয়েছেন।

আফিং বেশি খেয়ে?

কি করে বলি? ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে তো কোনও কথা ওঠেনি। আমি খবর পেয়েই দৌড়েছিলাম।

রণক্লান্ত যোদ্ধার মতো?

নো ইয়ার্কি, মাই ফ্রেণ্ড। ঘরে ঢুকে দেখলাম, প্রশান্ত মহিমায় দেহত্যাগ করেছেন এ কালের ভীষ্ম। ব্রহ্মতালুর কাছে উড়ছে মাছি। চোখের পাতা খোলা।

একটু থেকে আমি বললাম, তারপর?

তারপর?

গুম হয়ে গেছিল রবি। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়নি। আমি গুঁতিয়ে গেছিলাম—ডিম চুরি হল কবে? কীভাবে?

থেমে থেমে সেদিন যা বলেছিল রবি, তা নিগূঢ় রহস্যে আবৃত এক কষ্ট-কাহিনি।

২০. কী ছিল পাথরের ডিমে?

ইন্দ্র, জহুরী দণ্ডপথ জীবন্ত জহর ছিলেন বললেই চলে। তিব্বতের মন্ত্র উনি আমাকে দান করেছিলেন, জহুরী চোখ দিয়ে কল্পনাকে যাচাই করে নিয়ে আমার জীবনসঙ্গিনী করে দিয়েছিলেন, আর.. আর.. আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছিলেন...

হিরে চরিত্র যেমন ছিল তাঁর নখদর্পণে, তেমনিই নারী চরিত্র ছিল না তাঁর অজানা... সেই কারণেই হয়তো ঘরণী আনেননি ঘরে... কুবেরের মন্ত্র সংগুপ্ত রেখেছিলেন মনের কন্দরে... কিন্তু জীবন যখন ফুরিয়ে আসছে, তখন উপলব্ধি করেছিলেন একটা মহাসত্য... মানবজীবনের মোদ্দা কথাটা কী?... ধারাবাহিকতা... বহমানতা... দিয়ে যাও... হাত বদল করে যাও... শিক্ষক দিক ছাত্রকে... পিতা দিক পুত্রকে... আমরা, এই মানুষরা, দিতে দিতেই চলে যাই... দিতেই হয় ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।

আমি দার্শনিক হয়ে পড়ছি। বিল ক্লিনটনের একটা কথা মনে পড়ছে। স্মৃতির বোঝা যখন স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়, মানুষ তখনই বৃদ্ধ হয়। আমিও বোধহয় বুড়িয়ে যাচ্ছি। এত স্মৃতি ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে... অথচ কত কাজ এখনও বাকি...

বন্ধুর কাছে মন হালকা করাতে গিয়ে একটু-আধটু অপ্রাসঙ্গিক কথা তো বলবই। অথচ, একেবারে সঙ্গতিবিহীন নয়। ইন্দ্র, তোর ঘটে বুদ্ধি আছে। তুই বুঝবি।

আমি পলিটিক্স এড়িয়ে চলি। কিন্তু কল্পনা, আমার কল্পনা, শয্যার যে শরীরী প্রহেলিকা... সংকটে যে মহাসচিব... সেই কল্পনাকে টেনে ধরেছিল পলিটিক্স...

পলিটিক্স! ইন্দ্র, আমি ডিক্সনারির পর ডিক্সনারি হাতড়ে পলিটিক্স শব্দটার

আসল মানে খুঁজে বেড়িয়েছি। জেনেছি, শব্দটা আসলে দু'টো আলাদা শব্দের সংযুক্তি... পলি মানে অনেক, টিক্স মানে ব্লাডসাকারর্স... রক্তশোষকবাহিনি...

এই পলিটিক্স এমনিতেই আমার কাছে বিভীষিকা... দূরে দূরে থাকি... কিন্তু একটু আঁচ তো গায়ে লাগবেই... বিশেষ করে ঘরণী যদি ব্লাডসাকারদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে...

ধৈর্য হারাসনি, প্লীজ। ভেতরের এত কষ্ট আর কাকে বলব?

কল্পনা পাথরের দেশের মেয়ে। সে ত্রাটক যোগ জানে, চোখে চোখে সম্মোহন করতে পারে... আমাকে ছাড়া... একটু ভুল হল... একবারই টেনেছিল আমাকে... সবুজ চোখের বাণ মেরে... প্রথম দর্শনেই মরেছিলাম... তারপর থেকে হুঁশিয়ার হয়েছিলাম... ওর তৃতীয় চোখের দিকে তাকিয়ে দুই ভুরুর মাঝের অদৃশ্য ত্রিনয়নের দিকে তাকিয়ে মনের কথা ধরতে চেষ্টা করে যেতাম... তাই... ইন্দ্রনাথ... তাই আমাকে ঘায়েল করতে পারেনি কল্পনা... পাথরের দেশের মেয়ে কল্পনা... শয্যায় যে রক্তমাংসের বিদ্যুৎ বল্লরী... সেই কল্পনা...

ইন্দ্র, তুই জানিস. . নিশ্চয় জানিস... জগত জুড়ে সন্ত্রাসের জাল ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল... এর মধ্যে ধর্মের গন্ধ ছড়ানো রাজনৈতিক উসকানি আছে... সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায় নিয়ে দূরাত্মা দমনের অছিলায় পরদেশ দখলের মতলববাজি আছে...

তোর কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ছে দেখতে পাচ্ছি। তাই বিশদে আর গেলাম না। কামরূপ কামাখ্যার মেয়ে যার মা, সে যে শেষকালে মাতাহারি হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

কল্পনা হিরের লেনদেনে হাত মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করে যেতে আরম্ভ করেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে... আবার বলছি, ও পাথরের দেশের মেয়ে... তার ওপরে হিরে পাথরের কারবারে জড়িয়ে গিয়ে জেনেছে এক অঞ্চল... এক দেশ থেকে... আর এক অঞ্চল আর এক দেশে কারেন্সি কীভাবে যায়... হিরে রূপে... মনে পড়ছে? রক্ত ঝরেছে দেশে দেশে... ঝরছে এখনও... কল্পনাতীত অর্থের জোগান দিয়ে যাচ্ছে হিরে... পাথর রূপী মুদ্রা...

পলিটিক্স... রক্তচোষাদের খপ্পরে পড়ে কল্পনা নজর দিয়েছিল আমার হিরে বাণিজ্যের দিকে। আমি তো হিঁয়া কা মাল হুঁয়া করতাম... এখনও করি... একদামে কিনি, আর এক দামে বেচি... কোথায় সারপ্লাস হিরে... আর কোথায় হিরে মুদ্রার বড় দরকার, এ খবর আমার মগজে থাকে... কমপিউটারে নয়... যন্ত্রকে আমি বিশ্বাস করি না... আমার বোধহয় মেক্যানোফোবিয়া আছে... হাইটেক ক্রাইমে দুনিয়া ছেয়ে গেছে... ই-মেল, ইণ্টারনেটকে তাই বিশ্বাস করি না... খবরের খনি আমার এই মগজ...

বেশি বকছি? ক্ষমিও মোরে। কষ্টের কথা প্রিয় বন্ধুকেই বলা যায়। তোকে আগে বলেছি, জহুরি দণ্ডপথ আমাকে ন'টা পাথরের ডিম দিয়েছিলেন। নক্ষত্র এঁকে ন'টা পয়েন্টে বসানোর জন্যে। কাউকে তা বলিনি। কল্পনাকে তো নয়ই। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। তাছাড়া গুরুদেবের নিষেধ ছিল। চুটিয়ে হিরে

চালান করে যখন টু-পাইস কামিয়ে যাচ্ছি, একটা অদ্ভুত আর আশ্চর্য খবর চিন্তায় ফেলার মতো খবর, আমার কানে এল।

স্বস্তিকা দেখেছিস? এই চিহ্ন আদতে হিন্দুদের অতি সৌভাগ্য চিহ্ন না, জার্মানদের আদি সৌভাগ্য প্রতীক, এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠেছে এখন। আমি সেই ঝড়ের মধ্যে ঢুকছি না, হিন্দুদের স্বস্তিকা এইরকম—

এই স্বস্তিকার মধ্যেও দ্যাখ, ন'টা পয়েন্ট আছে। আচ্ছা... আচ্ছা... দেখিয়ে দিচ্ছি...

স্বস্তিকা শুভশক্তিকে হিরের মধ্যে সংহত করা যায়, আর সেই শক্তিমান হিরে দিয়ে অনেক অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়—এই বিশ্বাসটা এসে গেছে বিশেষ একটা গুপ্ত সমিতির মধ্যে... না, না, সেই সমিতির নাম আমি বলতে পারব না... এই রক্তশোষকদের নাম যত অজানা থাকে, ততই পৃথিবীর মঙ্গল...

ইন্দ্র, খুব কষ্টের সঙ্গে বলছি, কল্পনা এই গুপ্ত সমিতিতে ভিড়েছে... অথবা গুপ্ত সমিতি কল্পনাকে টেনেছে...

ফলটা দাঁড়াল কী? স্ত্রী যদি মনে করে, স্বামীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে, কেউ তা রোধ করতে পারে না... খোদ মহাদেবও ভড়কে গেছিলেন পার্বতীর দশরূপ দেখে... মেয়েরা মনে করলে সব করতে পারে... সব করতে পারে... গড়তে পারে... ভাঙতে পারে... অবলীলাক্রমে...

তবে কেন কল্পনার সঙ্গে আমার গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে গেছিলেন জহুরি দণ্ডপথ? অবশ্যই কল্পনাকে টাইট রাখার জন্যে... ভেঙে গড়বার জন্যে... উপাদান তো ভাল...

যাক গে... যাক গে.. আবার ছেঁদো কথায় চলে আসছি...

স্বস্তিকা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। লক্ষ্য করেছিস নিশ্চয়, এই চিহ্নে নবম বিন্দুটা উত্তম হিরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর... আর, এই হিরে যে ধারণ করবে, সে শুভ শক্তি পরিবৃত থাকবে...

কল্পনার নজর গেল জহুরি দণ্ডপথের দেওয়া ন'খানা পাথরের ডিমের দিকে—যার মধ্যে আছে ন' রঙের হিরে... বালি সাইজের...

ইন্দ্র, তুই আমার প্রাণের বন্ধু, হেজিপেজি মানুষ নস, পেটে কথা রাখতে জানিস, তাই তোকে একটা গুপ্ত খবর বলে রাখি...

আগেই বলেছি, জহুরি দণ্ডপথ এই পাথরের শূন্যগর্ভ ডিমগুলো আনিয়েছিলেন পেশোয়ার থেকে। অনিক্স পাথরের ডিম। কিন্তু নিরেট নয়। ফোঁপরা। প্যাঁচকাটা।

আমি নেমে গেছিলাম এই ট্রেডিংয়ে। হিরে আনা, হিরে বেচা। খনির হিরে এ-বর্ডার, সে-বর্ডার পেরিয়ে পেশোয়ারে ঢুকে, অনিক্স পাথরের ডিমের মধ্যে থেকে, চলে আসত আমার কাছে। আমি বিরাট লাভ রেখে সেই হিরে...অকাট্য হিরে... চালান দিতাম ঠিক ঠিক জায়গায়... প্রফিট? কল্পনায় আনতে পারবি না...

হিরের গুদোম ছিল ব্যাঙ্গালোরেই... একটা হাই-টেক ইস্পাত সিন্দুকে... সে সিন্দুকের পাল্লা খুলে যেত শুধু আমার ডানহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ সিন্দুক খোলার সঙ্কেতের সঙ্গে মিলে গেলে... খুঁটিয়ে বলতে চাই না.. শুধু বুড়ো আঙুলটা বিশেষ একটা জায়গায় চেপে ধরলেই কাজ শুরু হয়ে যেত... সিন্দুকের প্রথম পাল্লা খুললে সামনের চেম্বারে থাকত ছ'টা ডিম... জহুরি দণ্ডপথের দেওয়া ডিম, ভেতরে আছে আর একটা চেম্বার... সেখানে আমার ডানহাতের পুরো পাঞ্জা চেপে ধরতে হতো... এই সেকেণ্ড চেম্বারে বাকি তিনটে ডিম ছাড়াও থাকত বিস্তর অনিক্স পাথরের ডিম। প্রত্যেকটার ভেতরে চালানি হিরে... খনি থেকে চোরাই হিরে... হিরের খনি নিয়ে অনেক কথা তোকে আগে ভ্যাড়ভ্যাড় করে বলেছি। এ ব্যাপারটা মাথায় ঢোকানোর জন্যে...

একটানা এতগুলো কথা বলে দম নেওয়ার জন্যে একটু যতি দিয়েছিল রবি রে। সুরুৎ করে সেই ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম আমার জেরা—ময়দানের শিল্পমেলা থেকে হাওয়া হওয়া পেশোয়ারি ডিম তুই নিয়েছিলি?

২১. রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন

রবি রে চকমকি চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে আমার তরল চোখ আর শক্ত ঠোঁটের চেহারা-টেহারা একটু দেখে নিয়ে বললে, ইন্দ্র, তুই আগের জন্মে টিকটিকি ছিলি।

আমি বললাম, জুরাসিক যুগে ডাইনোসর ছিলাম। টিকটিকির পূর্বপুরুষ। মরুদ্যানের পেশোয়ারি পাথরের ডিম তোর খপ্পরে গেছিল?

হ্যাঁ, বন্ধু, হ্যাঁ। সাপ্লাই এসেছিল আমার নামে, মাল চলে এসেছে আমারই কাছে।

কে এনে দিল? তুই তো ময়দানের ত্রিসীমানায় যাসনি?

সে খবরও রাখিস?

রাখতে হয়। কে এনে দিল?

রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন।

সেটা আবার কী বস্তু?

বস্তু নয়, একটা গুপ্ত সঙ্ঘ। এরা টেররিস্টদের আর্মস সাপ্লাই বিজনেস পণ্ড করে দেয় যে-কোনও প্রকার কৌশলে। পেশোয়ারি হিরে আমিই ভ্যানিশ করে দিয়েছিলাম এদেরকে দিয়ে—মূল্য ধরে দিয়েছি—সে হিরে এখন নিরাপদ—আমার জিম্মায়।

হিরে লেনদেন তোর বিজনেস। রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন নামক গুপ্ত সংস্থা নিয়ে তুই চোরাই হিরে কিনেছিস। কাজটা অন্যায়।

হ্যাঁ, বন্ধু, হ্যাঁ, বিজনেস ইজ বিজনেস।

সেই হিরে এখন কোথায়?

বেচে দিয়েছি ভাল লাভে। হিরে জমা হয় আমার পয়েন্টে... ডলার বেরিয়ে যায় পৃথিবীর অন্য পয়েন্টে... মাড়োয়ারি বিজনেসের মতো একটা চেন ওয়ার্ক। ইন্দ্র, এত কথা তোকে বললাম কেন, এবার তা বলছি। আমার অন্য হিরে যে নিখোঁজ হয়েছে।

অন্য হিরে? পেশোয়াড়ি পাথরের মধ্যের হিরে?

না। মন্ত্রপূত হিরে।

কল্পনা নিয়েছে? ন'খানা ডিম?

না। ভেতরের চেম্বার খুলতে পারেনি। ভেতরে যে আর একটা চেম্বার আছে, সেটা খুলতে গেলে আমার পাঞ্জার ছাপ দরকার, তা জানত না।

বাইরের পাল্লা খোলার সিক্রেট জানত?

জানত।

তুই জানিয়েছিলিস?

হ্যাঁ।

কেন, মূর্খ কেন?

যেদিন সত্যি প্রেমে পড়বি, সেদিন বুঝতে পারবি।

মূর্খ, মিথ্যে প্রেমে মজা বেশি। সে কথা থাক। সিন্দুকের প্রথম পাল্লা তো খোলে তোর বুড়ো আঙুলের ছাপ চেপে বসলে। তুই দিতে গেলি কেন?

হিপনোটাইজড হয়ে।

হোয়াট?

তোকে বার বার বলে এলাম, কামরূপ কামাখ্যার মেয়ে যার মা, সে ত্রাটক যোগসিদ্ধা... চোখে চোখে চেয়ে বনের পশুকেও বশ করতে পারে...

তোর মতো বুনোকেও...

বশ করেছিল। আমি ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলাম। কী করেছিলাম, মনে নেই। ঘোর কাটলো সকালে, ঘুম ভাঙবার পর। কল্পনা পাশেই ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। খাট থেকে নেমে চটিতে পা গলাতে গিয়ে দেখলাম, একটা চটি নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, দেওয়াল সিন্দুকের সামনে রয়েছে। খটকা লেগেছিল। ঘুমন্ত কল্পনাকে না জাগিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে সিন্দুক খুলেছিলাম থাম্ব ইমপ্রেশন দিয়ে। জহুরি দণ্ডপথের দেওয়া পেশোয়ারি পাথরের বাক্স দু'টো দেখতে পাইনি। এক-একটা বাক্সে থাকত তিনটে করে ডিম। পাঞ্জা ইমপ্রেশন দিয়ে ভেতরের চেম্বার খুলেছিলাম। সেখানে রয়েছে বাকি তিনটে ডিম... অন্য অন্য হিরে... পেশোয়ারি পাথরের কৌটোয়... বুঝলাম, রাতে, ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে কেন আমার দিকে অমনভাবে চেয়েছিল কল্পনা... সবুজ পাথরের মতো চোখে যেন সবুজ শিখা দেখতে পাচ্ছিলাম... তারপর আর কিছু মনে নেই।

তারপর? তারপর?

অবান্তর কথায় কথা না বাড়িয়ে উপসংহারে চলে আসছি। যবনিকা টেনে

দিলাম মার-মার কাট-কাট কাণ্ডকারখানার পর। ডিভোর্স। এক পয়সাও অ্যালিমনি না নিয়ে যেন পরমানন্দে পলায়ন করল কল্পনা চিটনিস—দ্য গ্রেট চিটিংবাজ।

ছেলেকে ছেড়ে দিলি? তোর ঔরসের ছেলে—নিজের মুখে স্বীকার করেছিস। চাইলি না কেন?

চেয়েছিলাম।•দেয়নি।

সেই ছেলেই কিডন্যাপড হয়ে গেল অনেক... অনেকদিন পরে... পাহাড়ি অঞ্চলে... যেখানে আমাকে ভালবেসে টেনে এনে রেখেছিল কল্পনা...

২২. কিডন্যাপার কে?

অবশ্যই বন্ধু হিসেবে।

মোহিনী মেয়ে কল্পনা আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান করেছিল ডিভোর্সি হয়ে যাওয়ার অনেক... অনেক পরে। রবি রে-র পেট থেকে একটু একটু করে সব কথাই তদ্দিনে আমার বের করা হয়ে গেছিল। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে হিরে নিয়ে ঝগড়া লাগতেই পারে। গয়নাগাটিতে আর শাড়ি-টাড়িতে মেয়েদের আকর্ষণ চিরকালের। সেকাল থেকে একাল—সব কালেই মেয়েরা এই রূপটা পাল্টাতে পারেনি। সুতরাং ওইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামানো দরকার মনে করিনি।

কল্পনার আহ্বান ফেলেও দিতে পারিনি। সব মেয়েরাই প্রয়োজনে দ্রৌপদী গোত্রের হয়ে যেতে,পারে, এ রকম একটা বিকৃত ধারণা আমার মতো মেয়ে-বিরূপ পুরুষের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে। এটা এক ধরনের রোগ। মনের রোগ। আমার তো তাই মনে হয়।

কিন্তু কল্পনার ছেলেটা হাওয়া হয়ে যাওয়ার পর ছেলে চোর যখন টেলিফোনে শুধু ডিম চেয়ে বসল, তখন আমার টনক না নাড়িয়ে পারিনি।

রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন আসরে নামেনি তো? অথবা, রবি রে স্বয়ং?

বিগ কোয়েশ্চেন, তাই গা ঝাড়া দিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম, আমাকেই কিডন্যাপার ঠাউরে খোদ রবি রে আসবে তেড়ে?

কবিতা বউদি; প্রিয় লেখক বন্ধু মৃগাঙ্কর প্রেম করে বিয়ে করা বউ, সুযোগ পেলেই আমাকে খোঁটা দিয়ে দিয়ে বলে, আমি নাকি একটা ভিজে বেড়াল... তক্কে তক্কে থাকি... চান্স পেলেই মহিলারূপিনী মৎস্য শিকার করি।

এসব খোঁচা আমি গায়ে মাখি না। আমি হলাম গিয়ে লক্ষ্যভেদী। অর্জুনের মতো। টার্গেট ছাড়া অন্যদিকে তাকাই না। সেই টার্গেটে উপনীত হতে গেলে যদি মহিলা-সহায়কের প্রয়োজন হয়, আমি দ্বিধা করি না। ওসব ছেঁদো নীতির কমপ্লেক্স আমার ভেতরে নেই।

কল্পনাকে অবলম্বন করেছিলাম সেই কারণেই। ফরাসি ছুটি নিয়ে ফেলেছিলাম। কর্তব্যের খাতিরে তাকে বন্ধুত্ব দিতে হিমালয়ে প্রস্থান করেছিলাম। নীড় রচনা করেছিলাম পৃথক আবাসনে। সে কথা আগেই বলেছি।

কল্পনা কি আমাকে ফাঁদে ফেলতে চায়নি? চেয়েছিল... চেয়েছিল... চেয়েছিল। কিন্তু আমি তো কখনও ওর সবুজ চোখের চাহনিতে নিষিক্ত হইনি—সে সুযোগ দিইনি।

অথচ ও কক্ষনো আগুনের সজীব ফুলকির মতো আমার সামনে আসেনি... আজকালকার শ্রীমতিদের মতো... বডি ল্যাংগুয়েজ আমাকে দেখাতে যায়নি... আজকালকার চটকদার চট্টালিকাদের মতো...

একদিনের কথা মনে আছে। সেদিন কল্পনা সবুজ শাড়ি পরে, দুই চোখের তারারন্ধ্রে সবুজ প্রদীপ জ্বালিয়ে, দুই কর্ণাভরণে সবুজ পাথর দুলিয়ে, এমনকী নাকের পাটাতেও সবুজ পাথরের রোশনাই ছড়িয়ে... সবুজে সবুজ হয়ে... সবুজ বনলতার মতো আমার দেহকাণ্ডকে ঘিরে ধরতে চেয়েছিল...

অথচ, সবুজ আগুন ছিল না কোথাও... না তনুমদিরায়, না বাক্যসুধায়... স্নিগ্ধতার এমন রূপ কখনও দেখিনি... আমাকে বলেছিল নিবিড় নৈকট্যের প্রলেপ মাখানো সহজ স্বরে—ইন্দ্রনাথদা, আমরা কি যুগলবন্দি হতে পারি না?

আমি নিষ্প্রদীপ স্বরে বলেছিলাম—বন্ধু স্ত্রী আমার বোনের মতো।

ও বলেছিল, এখন আমি মুক্ত...

বনচর...

কুরঙ্গী। ঈষৎ নতনয়না হয়ে অপাঙ্গে তাকিয়ে শুভ্র ভঙ্গিমায় জুড়ে দিয়েছিল কল্পনা—আমার তো কুরঙ্গ প্রয়োজন।

আমি বলেছিলাম, তাহলে ফিরে যাও আমার বন্ধুর কাছে।

তখনও ও আমার চোখের দিকে নিষ্পলক চাহনি মেলে রেখেছিল। আমি কিন্তু সেই সবুজ চুম্বকের দিকে ফিরেও তাকাইনি। রবির কাছে যে শুনে নিয়েছিলাম, কল্পনা ত্রাটক যোগসিদ্ধা। বনের পশুকেও বশ করতে পারে। কিন্তু আমি নিজেকে একটা অখাদ্য মনে করি। তাই চোখে চোখ রেখে নীতিহীন হতে চাইনি।

ছোট নিঃশ্বাস ফেলে কল্পনা বলেছিল, আমি নাকি দ্রৌপদী গোত্রের মেয়ে?

তাই নাকি? আমার মুচকি জবাব।

তবে কেন মহাভারতীয় পন্থায় এই শূন্য জীবনকে পূর্ণ করব না?

কারণ, মহাভারতীয় কাহিনির সমাজ এখন অতীতে চলে গেছে—জুরাসিক যুগের ডাইনোসরদের মতো এখন এই প্রথা অণুসরণ করা মানেই ডাইনি খেতাব অর্জন করা।

রেগে গিয়েও চোখের চাহনিতে তার আভাসটুকুও জাগতে দেয়নি কল্পনা। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, এই মেয়ে যদি সুচিত্রা সেনের সামনে ইণ্টারভিউ দিতে যেত, তাহলে বাংলার অভিনয় শিল্পের জগতে যে আকাল চলছে, তা আর থাকত না।

হযবরল বকছি? কাক্কেশ্বর কুচকুচে বলেই ধরে নিন আমাকে। কাককে কেউ পোষে না, মানুষ মাত্রই কাককে অবহেলার চোখে দেখে। অথচ চির অবহেলিত এই কাক এই পৃথিবীতে নিজের জায়গা বজায় রেখে দিয়ে নিজের কাজটুকুই করে চলেছে। আমাকেও করতে দিন। আমার কাজ? পরোপকার। পকেটে কিছু আসুক আর না আসুক।

কল্পনার প্রেমের ভণ্ডামিতে তাই আমি ভুলিনি। আমি কাক, কাকের মতোই

থেকেছি। তার অনিন্দ্য মুখশ্রী, তার কমনীয় তনু, তার স্নিগ্ধ লাবণ্য, তার শিহরণ জাগানো আঁখিপাত, আমার শরীর থেকে উষ্ণ জ্যোতি বের করতে পারেনি। আমি একটা ফিলামেন্ট কাটা বিদ্যুৎবাতি। আমি একটা প্রতারক। যখন প্রেমের অল্প অভিনয় করি, রমণী যখন অপরাধের কুয়াশা রচনা করে, আমি তখন তা আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অভিনয় শিল্প দিয়ে ছিন্নভিন্ন করি। তাই আমি অর্জুন হয়েও নই, বহু রমণীর পিপাসা মেটাতে ব্যগ্র নই।

কিন্তু আমি পাথর নই। আমার ভেতরেও সুর খেলা করে। আমার ভেতরেও কথা খেলা করে। তাই লিখছি। মনের কথা লিখে যাচ্ছি, তাতে তৃপ্তি পাচ্ছি। কথার এই ঝরণাধারা যদি আপনার মধ্যে অতৃপ্তি জাগায়, তাহলে হে পাঠক এবং হে পাঠিকা, অক্ষরের অরণ্য থেকে চক্ষু তুলে নিয়ে প্রবেশ করুন আমার মনের মধ্যে... দেখতে পাবেন—আমি কে, আমি কী, আমি কেন?

অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবেন, আমি শ্রীহীন এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আদতে একটা বিকট বিশ্রী জিজ্ঞাসা চিহ্ন... এই রূপ নিয়ে আমি কারণ অন্বেষণ করি অপরাধের অন্ধকারে...

যেমন করছি এখন...

ছেলে চোর, সোমনাথকে যে অপহরণ করেছিল, সেই রাস্কেলটা, আমাকে টেলিফোন করেছিল, সে কথা এই কাহিনির প্রথম দিকে লিখেছি। ব্ল্যাক বিজনেস স্যুট পরে সবুজনয়না কল্পনা চিটনিস দুই তারকা রন্ধ্রে উৎকণ্ঠার মশাল জ্বালিয়ে আমার দিকে যে চেয়েছিল—সে কথাটা অবশ্য লিখিনি, আমি নিজেই যে তখন টেনশনের ধিকিধিকি আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছি মগজের মিলিয়ন বিলিয়ন কোষে কোষে। ছেলে চুরি তো আজকাল একটা লাভজনক ব্যবসা। রাজত্বে যখন রাশ থাকে না, মানুষের মজ্জাগত অপরাধগুলো কিলবিল করে ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যে। লেটেস্ট র‍্যানশম তো পঞ্চাশ লাখ টাকা। অপিচ এমন কাণ্ড-কাহিনি আমি শুনিনি। কিডন্যাপার বুক ফুলিয়ে চাইছে অর্ধকোটি মুদ্রা। এই মরুদ্যানে!

তাই আমি ভেবেছিলাম, কিডন্যাপার কোটি কয়েক মুদ্রা চেয়ে বসবে সোমনাথ-মূল্য বাবদ। হিরে বণিকদের পুত্রের দাম হিরে দিয়েই হয়। কোহিনুর-টোহিনুর টাইপের হিরেও চেয়ে বসতে পারত।

কিন্তু সে চাইল কী?

ডিম! চেয়েই, টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

অগত্যা আমাকে ফ্ল্যাশব্যাকের পর ফ্ল্যাশব্যাক দিয়ে আগের কাহিনী পিণ্ডদের টেনেমেনে আনতে হয়েছে সময়ের এই আক্রাগণ্ডার বাজারে। মিনি গল্পের যুগে এই ম্যাক্সি ফ্ল্যাশব্যাক আদৌ প্রয়োজনীয় ছিল কি না, সমঝদার পাঠক (এবং পাঠিকা) নিশ্চয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছেন।

ডিম। যে ডিম নিয়ে তুফান রচনা করেছে কল্পনা সুন্দরী, যে ডিম পাচারে অংশ নিয়ে ছোটখাটো যক্ষরাজ হয়ে বসেছে দোস্ত রবি রে (যদিও তার দেহের

গঠন কুৎসিত নয়, সে এক চক্ষু নয়, অষ্টপদের অধিকারীও নয়)—সেই ডিম চাইছে কিডন্যাপার--অতিশয় কর্কশ গলায়।

কিডন্যাপারদের কণ্ঠস্বর কর্কশই হয়—সায়গল-হেমন্ত-পঙ্কজের মতো হয় না। কিন্তু তার বাচনভঙ্গী আর বাক্য সংযমের তারিফ না করে পারিনি। সে চায় শুধু ডিম। টেলিফোন নামিয়ে রেখে মুক্তিপণের স্বরূপ শোনালাম কল্পনাকে। সে বিবর্ণ হয়ে গেল।

২৩. ডিম যখন মহার্ঘ হয়

উৎসুক হয়েছেন কিছু পাঠক এবং অবশ্যই পাঠিকা। কেচ্ছা শুনতে চায় সবাই। এই কলকাতায় যদি একটা পি-এন-পি· সি ক্লাব করা যায়, নির্ঘাৎ তার সেক্রেটারি হবেন এক ললিতা মহিলা।

পি-এন-পি-সি বস্তুটা কী? যাঁরা জানেন, তাঁরা মুচকি হাসছেন, যাঁরা জানেন না, তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই—পরনিন্দা পরচর্চা—সংক্ষেপে পি-এন-পি-সি।

যাকগে, যাকগে, মূলে ফিরে আসা যাক। শেকড় তাহলে এই ডিম। যত অনর্থ ঘটাচ্ছে এই ডিম। ডাইনো ডিমের মতোই লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়ছে... অনিন্দ্য পাথরেব ডিম।

আমি, টেলিফোন নামিয়ে রেখে, সবুজাভ নয়নার চোখে চোখ রেখে বললাম, কল্পনা, কেসটা ডিম চুরি নিয়ে।

কল্পনা আইভরি গ্রীবা বেঁকিয়ে বললে, কী বলতে চান?

আমি তার চোখের চাহনি এড়িয়ে গিয়ে নাকের পাথরটার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি সব জানি।

কী জানেন?

জহুরি দণ্ডপথ বিশ্বাস করে যে ডিম দান করে গেছিলেন রবিকে, তুমি তা চক্ষুদান করতে গেলে কেন?

দপ করে জ্বলে উঠল কল্পনা রূপসীর রূপময় সবুজ চোখ--আমাকে যে দান করতে হয়েছে অনেক। প্রতিদান তখন পাইনি। পরে নিলাম।

হকচকিয়ে গেলাম ভেতরে। বাইরে রইলাম প্রশান্ত—তোমাকে দান করতে হয়েছে?

আজ্ঞে?

কাকে?

জহুরি দণ্ডপথকে।

অতি কষ্টে কণ্ঠস্বরকে নিষ্কম্প রেখে বললাম, কী দান?

অঙ্গসেবা।

অর্থ?

তখন, কল্পনা যে কাহিনি শুনিয়ে গেল, অতি সংক্ষেপে তা যযাতির লাম্পট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২৪. জহুরি যখন যযাতি হতে চায়

কল্পনা বলছে—

ইন্দ্রদা, দাদা বলেই এখনও সম্বোধন করব, বন্ধু রূপে তো রইলেন, অন্য রূপে নাই বা পেলাম...পেলে বর্তে যেতাম। তেরিয়া পুরুষদের আমার বড় পছন্দ—পুরুষ মানুষ ন্যাতাজোবড়া হলে কি মানায়? পুরুষ হবে কাঁটাগাছ অথবা কাঁটা গোলাপের মতো... তুলতে গেলে আঙুলে ফুটবে... কিন্তু খোঁপায় মানায় ভাল।

ভুরু কুঁচকোবেন না। অপ্রিয় সত্যি বলছি তো, তাই মনে ধরছে না। তোয়াজ করা আমার ধাতে নেই।

অথচ একদা তোয়াজ করেই আমাকে থাকতে হয়েছে। কাকে জানেন? জহুরি দণ্ডপথ নামক ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধটাকে। তাঁর চুল সাদা, ভুরু সাদা, দাড়ি সাদা। মুখের চামড়ায় কিন্তু যৌবন-কান্তি। কীভাবে এহেন যৌবনশ্রী ধরে রেখেছিলেন জানেন? একটু-আধটু আফিংয়ের জন্যে শুধু নয়। উনি যযাতি-প্রক্রিয়া আয়ত্ত করেছিলেন।

গোড়া থেকেই তাহলে শুনুন। জহুরি দণ্ডপথ অতি অমায়িক, অতি সজ্জন, অতি দয়ালু। এইটাই জানে জগৎজন। তিনি খুঁজে খুঁজে অনাথা রূপসীদের এনে হিরের কারখানায় কাজ করান, তাদের খাওয়া-পরা-থাকার ভার নেন। বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। দুর্নাম নাকি সুনামের আগে যায়, এমন একটা কথা আছে। কিন্তু তার বিপরীতটাও সত্যি বটে। সুনাম দুর্নামকে চাপা দিয়ে রাখে।

জহুরি দণ্ডপথ আসলে যে কি বস্তু, তা কেউ টের পায়নি। যারা টের পেয়েছে, তারা জীবন গেলেও মুখে প্রকাশ করতে পারেনি। যেমন আমি পারিনি। এখন পারছি কেন? আমার পেটের ছেলে গায়েব হয়েছে বলে। ইন্দ্রদা, জহর কারখানার তরতাজা মেয়েরা পালা করে প্রতি রাতে যেত জহুরি দণ্ডপথের অঙ্গ সংবাহন করতে। যাকে বলে ম্যাসাজ—তাই সারা শরীর ডলে দিয়ে একই শয্যায় থাকতে হতো—এর বেশি আর যেতেন না বৃদ্ধ—অক্ষম ছিলেন বলে।

কিন্তু কেন এই মনোবিকলন? বৃদ্ধ বয়েসে কেন হেন ভ্রষ্টাচার?

তার একটা সুযুক্তি খাড়া করেছিলেন জহুরি দণ্ডপথ। বলতেন, দ্যাখো মেয়ে, পুরাণ ঘাঁটলে অনেক বিজ্ঞান জানা যায়। যযাতি লোকটা মূর্খ বজ্জাত ছিলেন না। তিনি জানতেন, যুবতীদের শরীর থেকে যে প্রাণজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তা যুবকদের যেমন সক্ষম রাখে, তেমনি বৃদ্ধদের জরা এগোতে দেয় না। বিলেত আমেরিকায় নাকি এই টেকনিকেই ইয়ং বিউটিদের পার্সোন্যাল সেক্রেটারি বানিয়ে রাখা হয়। কল্প বিজ্ঞানের একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক তো ছ'জন বিউটিফুল যুবতীকে দিয়ে নিয়মিত বডি ম্যাসাজ করাতেন—তাঁর জরা তাঁকে কাবু করতে পারেনি। পুরু আসলে নাকি হাজার বছর বাঁচেননি—ছেলের হাজার উপপত্নীদের পার

নিয়েছিলেন যৌবন টনিক নিংড়ে নিয়ে নিজেকে তাজা রেখেছিলেন। হাজার শব্দটা গল্পে চলে এসেছে অন্যভাবে।

এইসব বুকনি সয়ে গিয়ে হাসি মুখে তার অঙ্গ সংবাহন করে যেতাম আমার পালা এলেই। নিশিযাপনও করতাম একই শয্যায়। কুমারী থাকতে পেরেছি কেন, তা আগেই বলেছি।

আমার পালা পড়ত বেশি। আমার এই হিলহিলে বিউটির জন্যে। আমাকে বলতেন, তুই একটা পাহাড়ি সাপ। জাপটে থাক। টের পাই শিরশির করে বিদ্যুৎ ঢুকছে ভেতরে।

কিন্তু বুড়ো বড় খলিফা। কখনও আমার চোখে চোখে তাকাতেন না। পাছে ঘোর সৃষ্টি করে পেট থেকে কথা বের করে নিই। তবে, আমার শরীরের বিদ্যুতেও বোধহয় সম্মোহন আছে। বোধহয় কেন, নিশ্চয় আছে। আপনি বড় হুঁশিয়ার, ইন্দ্রদা, তাই আমাকে টাচ করেন না। চান্স দেওয়া সত্ত্বেও।

জহুরি দণ্ডপথ আমার এই বডি-কারেন্টে এক-একদিন বেহুঁশ হয়ে যেতেন। প্রলাপ বকুনির মতো ছাড়া-ছাড়া কয়েকটা কথা বলতেন। যেমন, মন্ত্রগুপ্তি.. মন্ত্রগুপ্তি... নয় হিরে তো নয়, ওরা নবগ্রহ... অসাধ্য সাধন করতে পারে... ছয় হিরে দিয়েও নয়ছয় করা যায়...

ঘোর কেটে গেলে, ভোর হয়ে গেলে, আমার চোখে চোখ রেখে বলতেন—কিছু বলেছি নাকি? শুনে যদি থাকিস, চেপে থাকিস। তোর সঙ্গে ভাল ছেলের বিয়ে দেব। এমন বাচ্চা তোর পেটে আসবে যে অসম্ভবকে সম্ভব করবে।

এইভাবেই রাসলীলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বুড়ো। দোষ কী। শ্রীকৃষ্ণ যদি ষোল হাজার গোপিনীর দৃষ্টান্ত রেখে যান, আমাদের মতো বিনা মাইনের মেয়েদেরকে দিয়ে বডি ম্যাসাজ তো করাবেনই—শুধু বিয়ের লোভ দেখিয়ে।

যাকগে, যাকগে, যথা সময়ে পেলাম আপনার বন্ধু রবিকে। সোজাসাপটা মানুষ। আঁচ করলাম, ওকেই মন্ত্রগুপ্তি দিয়ে গেছেন গুরু দণ্ডপথ। যেহেতু আমি কিছুটা জেনে ফেলেছি, তাই আমাদের যুগলবন্দি করে রাখলে ঘরানা হয়ে গুপ্ত থেকে যাবে মন্ত্রগুপ্তি।

হিরে নিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে আমি নিজেও কিন্তু জেনে ফেলেছিলাম আর একটা ব্যাপার। হিরে শোধনের এক অক্ষরের মন্ত্র। একটা ওঁ-কারের ছ'টা পয়েন্টে ছ'টা হিরে বসিয়ে ওঁ জপ করে গেলে বিশ্বশক্তি চলে আসে হিরের মধ্যে দিয়ে শরীরের মধ্যে। হিরে শোধন হয় কিনা বলতে পারব না। তবে, শরীর-মন অন্যরকম হয়ে যায়। প্রাঞ্জল করতে হবে? এই দেখুন, এঁকে দেখাচ্ছি—

ছ'টা পয়েন্টে ছ'টা হিরে বসালে হিরের শক্তি আর ওঁ-কারের শক্তি এক

হয়ে গিয়ে অন্য একটা শক্তি এনে দেয় ভেতরে। হিরে নিয়ে কাজ করার সময়ে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে এই কাণ্ড করতাম। তাই আপনার বন্ধুকে চট করে কব্জা করতে পেরেছিলাম। জহুরি দণ্ডপথও তো ঘোরের মধ্যে বলেছিলেন, ছয় হিরে দিয়ে নয়ছয় করা যায়।

তারপর কত চেষ্টা করলাম। ভবি ভোলবার নয়। তাই একদিন একটু চান্স পেয়েই ওরই বুড়ো আঙুল দিয়ে সিন্দুকের পাল্লা খুলিয়ে লোপাট করলাম ছ'খানা ডিম। বাকিগুলো হাতানোর আগেই ওর ঘোর কেটে আসছে দেখে আর এগোইনি। আর একবার চান্স নেব, ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু বড় হুঁশিয়ার মাল আপনার এই বন্ধুটি। আমাকেই কিনা চার্জ করে বসল। সোজা বললে, হয় ডিম দাও, নয় ভাগো।

তাই ভেগেছি, ছেলেকে নিয়ে। আপনাকে পকেটে এনে ওকেও প্যাঁচে ফেলবার প্ল্যান যখন কষছি, ছেলে গেল চলে...

কে নিয়েছে তাকে? ডিম যার, নিশ্চয় সে। ছেলের বাপ।

আপনি তাকে ফিরিয়ে আনুন। আপনার বন্ধুকে খবর দিন। সে যা চায়, তাই পাবে, তাই পাবে—ফিরিয়ে দিক আমার ছেলেকে।

২৫. কিডন্যাপার যখন ইন্দ্রনাথ

টেলিফোনে কিডন্যাপার চেয়েছে শুধু ডিম।

ডিম রয়েছে দু'জনের কাছে। একদা যারা স্বামী-স্ত্রী ছিল, তাদের কাছে। তার আগে তো তদন্ত দরকার। পুলিশকে ইনফর্ম করা দরকার। নইলে আমি যে ফেঁসে যাব। ফেঁসেও গেছিলাম। কীভাবে, সে প্রসঙ্গে আসছি পরে। তার আগে বলি রুটিন ইনভেসটিগেশনের কথা।

পুলিশ এল সেই রাতেই, আটটা বেজে কুড়ি মিনিটে।

কথার শুরুতেই কল্পনা বলে ফেলেছিল ভুটিয়া গুণ্ডা দোঙ্গা জংয়ের কথা। যে কি না খুনের ফিকিরে ছিল মা-ছেলে দু'জনকেই। যে টেনশন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অছিলায় কল্পনা টেনে এনেছে আমাকে এই তুহিন অঞ্চলে। কিন্তু ঘটনাটার বিন্দু বিসর্গ জানিয়ে রাখেনি স্থানীয় আরক্ষা দফতরকে।

সেই পয়েন্টেই পুলিশ চলে এল প্রথমেই, কিডন্যাপিংয়ের হুমকি-টুমকি আগে এসেছিল কি?

আমতা আমতা করে কল্পনা আমার চোখে চোখ রেখেই সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, কিডন্যাপিংয়ের হুমকি না থাকলেও খুনের হুমকি ছিল।

কে দিয়েছিল? প্রশ্ন তো নয়, যেন পাথর বর্ষণ। কড়া গলা। শক্ত চোখ। এই দুইয়ের অধিকারিণী যে মহিলা অফিসার, তিনি চোর-ডাকাতের পিছন নিতে নিতে দুর্গেশনন্দিনী টাইপের মহিলা হয়ে গেছেন। পরনে টাইট জিনস শার্ট আর ট্রাউজার্স। চুল শক্ত বিনুনির দৌলতে টিকটিকি আকৃতি নিয়েছে। খরখরে দুই চোখে বিশ্ব-অবিশ্বাস পুঞ্জ পুঞ্জ আকারে বিধৃত।

মিনমিন করে ভুটিয়া খুনে দোঙ্গা জংয়ের নাম করেছিল কল্পনা। ধমক খেয়েছিল তৎক্ষণাৎ। পুলিশকে তা জানানো হয়নি কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কেস যে লিকুইড হয়ে গেল, বোঝা হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

দোঙ্গা জংয়ের কেসটা যে কল্পনার কপোল-কল্পিত, এই সন্দেহ গোড়া থেকে দানা বেঁধেছিল আমার মনেও। কিছু মেয়ে চমৎকার মিথো বলতে পারে। কল্পনার মোদ্দা মতলবটা ছিল তো আমাকে কাছে আনা। দোসরের দরকার সব কন্যারই।

আমি তা বুঝেও চুপ করেছিলাম। এসেছিলাম তো রবি রে-র আত্মকাহিনি শোনবার পর। পাঠক এবং পাঠিকা অশেষ ধৈর্যপূর্বক সেই কাহিনির সুদীর্ঘ পঠনের মধ্যে দিয়ে এতক্ষণ গেছেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদের মূলে পাথরের ডিম। হিরে ভরা ডিম।

টেলেফোনেও এখন এল সেই ডিম্যাণ্ড—মুক্তিপণ কী? না, ডিম।

পুলিশ পুঙ্গবীর প্রশ্নের প্যাটার্ন প্রশংসনীয়। 'পুঙ্গবী' শব্দটা বাংলা অভিধানে কিন্তু নেই। আমি বানিয়েছিলাম। পুঙ্গব মানেই যদি হয় ষাঁড়, ওইরকম মেয়েদের পুঙ্গবী বলে ডাকতে বাধা কোথায়? যে মহিলা অফিসারটি এসেছেন, তিনি তো মর্দা সেজেই এসেছেন। নারীত্বের লক্ষণ আবিষ্কার করে নিতে হয়।

যাক গে, যাক গে, বাজে বুকনি বেরিয়ে আসছে কলম দিয়ে। আমি তো ঝানু লেখক নই। পাঠক (এবং পাঠিকা) ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।

খুনে গুণ্ডার দোহাই যে ধোপে টিকল না, তা মহিলা পুলিশের মুখ দেখেই বোঝা গেল। পোড় খাওয়া স্ত্রীলোক। শানানো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে ফট করে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি?

একটুও রাঙা না হয়ে টুকটুকে ফর্সা কল্পনা বললে, মাই ফ্রেণ্ড।

অনিমেষে তাকিয়ে থেকে পুলিশ পুঙ্গবী বললেন, এই বাড়িতেই থাকেন?

বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন। লাইনে চলে এসেছেন প্রশ্নকর্ত্রী।

জবাবটা দিলাম আমি—অন্য বাড়িতে থাকি। কাছেই।

অ। খুনের হুমকি যখন এসেছিল, তখন ছিলেন?

তারপরে এসেছিলাম। টু গিভ প্রোটেকশন টু আ লোনলি লেডি।

অ। আপনার প্রফেশন?

প্রাইভেট ডিটেকশন।

নাম?

ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

এইবার কিন্তু চোখের পাতা কাঁপিয়ে ফেললেন পুলিশ পুঙ্গবী। সেকেণ্ড কয়েক আমাকে দেখলেন। এই দেখাটা অন্য রকমের মনে হল। চোখের তারায় সেই আভাস লক্ষ্য করলাম। বললেন, আপনার তো ভারতজোড়া নাম। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা কি এদেশে কি বিদেশে ডিভোর্সের কেস নিয়েই মেতে থাকে। আপনি তার ব্যতিক্রম। ঠিক বলছি?

হাণ্ড্রেড পারসেন্ট।

খরখরে চাহনি লাবণী চাহনি হয়ে গেল। পুঙ্গবী বললেন, তাহলে আপনার মুখেই শোনা যাক। ছেলে নিখোঁজ হল কখন থেকে?

সব বললাম। গেমস ক্রিকের আওয়াজ শুনে গিয়ে দেখলাম, যন্ত্র আছে, ছেলে নেই। শুধু বললাম না একটা কথা। মুক্তিপণ যে শুধু ডিম, সেই কথাটা। বললেই তো হাজারও কথার ঝাঁপি খুলতে হবে। তাই চেপে গেলাম। কল্পনার নরুন চোখে দেখলাম নিপুণ কৃতজ্ঞতা।

মিসিং ডায়েরির পাট চুকোতে চুকোতে ঘড়িতে বাজল রাত সাড়ে আটটা। পাহাড়ি রাত সাড়ে আটটা কম নয়। খাদ-খন্দে নজর চালিয়ে মিসিং মানুষটার পায়ের ছাপ খুঁজতে গেলে নিজেদের জীবনের ছাপ মর্ত্য থেকে মুছে যেতে পারে। সে ঝুঁকির মধ্যে গেলেন না পুলিশ পুঙ্গবী, তবে আমার দিকে নজরপাতটা যে একটু অস্বাভাবিক রকমের হয়ে চলেছে, তা লক্ষ্য করে মনে মনে মজা পেলাম।

মজা মিলিয়ে গেল, যখন কল্পনার সামনেই তেড়া চোখে তাকিয়ে সোজা বললেন, কিছু মনে করবেন না, মিঃ রুদ্র। অন ডিউটি পুলিশকে অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হয়।

আমিও চোখের পাতা না কাঁপিয়ে পুলিশ পুঙ্গবীর চোখে চোখে চেয়ে বললাম, এবং সেই অপ্রিয় কথাটা কী, ম্যাডাম?

আগে মোটিভ, তারপরে ক্রিমিন্যাল অন্বেষণের গবেষণা, অ্যাম আই কারেক্ট?

হান্ড্রেড পারসেন্ট। নাউ, হোয়াট ইজ ইওর অপ্রিয় কথা?

মোটিভ ওয়ান, র‍্যানশম আদায়। ভুটিয়া দোঙ্গা জং কালপ্রিট। যদিও সে ব্যাপারটা যথাসময়ে রেকর্ড করানো হয়নি।

সুতরাং মোটিভ ওয়ান লিকুইড হয়ে গেল, এই তো?

ঝুলিয়ে রাখা হলো, হ্যাঙ্গিং। দোঙ্গা জংয়ের প্যাটার্ন অব ক্রাইম তো এরকম নয়। সেই লাইটনিং স্পীডে কাজ করে। আগেভাগে জানায় না। তাছাড়া, একবার খুনের হুমকি, তারপর গায়েব—দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। শুধুমুধু খুনের ভয় দেখাবে কেন? মুক্তিপণ চাইলেই তো পারত? না দিলে তখন—

চুপ করে রইলাম। কল্পনা চিটনিসের এই কাল্পনিক মজুহাত আমিও বিশ্বাস করিনি। মিথ্যে কথা বলা একটা আর্ট। কোর্টে যারা মিথ্যে সাক্ষী দেয়, তারা এই আর্টে আর্টিস্ট।

পুলিশ পুঙ্গবী খরখরে চোখে আমার আর কল্পনার চোখের দিকে চেয়েছিলেন। চোখের আয়নায় মনের কথা গোপন থাকে না, ছায়া পড়লেই। কী ছায়া তিনি দেখলেন, তা তিনিই জানেন, ফট করে বললেন, কিছু মনে করবেন না, মিস্টার... মিস্টার রুদ্র, আপনি মিসেস.. মিসেস..

কল্পনা আস্তে বললে, আমার এক্স হাজব্যাণ্ডের পদবী রে। কিন্তু আমি তা ভুলে যেতে চাই।

ফাইন। ফরগেটফুলনেস ইজ ডিভাইন, অ্যাট টাইমস।

সার্টেনলি। টু ক্লোজ আ চ্যাপ্টার ফর এভার।

ফাইন, ফাইন, ফাইন। তাহলে মিসেস চিটনিস...

বলুন, ম্যাডাম চিটনিস।

ওকে, ওকে, ম্যাডাম চিটনিস, মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র এখন আপনার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড?

অফকোর্স।

মিস্টার রুদ্র, ডোণ্ট মাইণ্ড, সেকেণ্ড সাসপেক্ট কিন্তু আপনি হয়ে যাচ্ছেন। তাই না? পথের কাঁটা ছেলেটাকে সরাতে পারলে...

সহজ যুক্তি তাই বটে। বিশেষ করে আমিই যখন তাকে শেষ দেখেছিলাম।

অসহজ যুক্তি কিছু আছে নাকি? পুলিশ পুঙ্গবীর নয়ন তারকার তীক্ষ্ণতার প্রশংসা না করে পারলাম না। যেন একজোড়া নেপালি কুকরি।

ঠোঁটের কোণে কোণে আমার পেটেণ্ট হাসি টেনে এনে বললাম, সেটা তো এত ঢাকঢোল পিটিয়ে করার দরকার ছিল না। পয়সা ছড়ালে ভাড়াটে কিডন্যাপারের অভাব হয় না। কল্পনা চিটনিস বাড়িতে থাকতে থাকতেই তা করানো যেত।

গুড আরগুমেণ্ট।

লক্ষ্য করলাম, আমার মার্কামারা হাসিটার দিকে পলকহীন নয়নে তাকিয়ে আছেন পুলিশ পুঙ্গবী। নিগূঢ় এই হাসির অর্থ বিবিধ প্রকার হতে পারে। বন্ধুবর মৃগাঙ্ক রায়ের লেখনীতে তার ব্যাখ্যা মেলে। আমি বচনদক্ষ হতে পারি, কিন্তু কলমদক্ষ নই। তাই সামান্য হাসির একশো আট রকম ব্যাখ্যায় আর গেলাম না।

অবশেষে লক্ষ্য করলাম, পুলিশ পুঙ্গবীর পিঙ্গল চক্ষু তারকায় নৃত্যের আভাস।

কৌতুক নৃত্য।

বললেন, মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আপনার সঙ্গে লড়বার ক্যাপাসিটি আমার নেই। কথার মারপ্যাঁচ বানাতে চাইছি না। সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখছিলাম। অপরাধ যদি হয় মার্জনা করবেন।

অপরাধী তো আমি, বলে গেলাম, সুতরাং, এখন খবর দেওয়া হোক ছেলের বাবা রবি রে-কে। তাহলেই, পুলিশ পুঙ্গবীর চোখে চোখ রেখে বললাম, আর একটা বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে।

আর একটা বিষয়। আস্তে আস্তে বললেন পুলিশ পুঙ্গবী, থিওরি নাম্বার থ্রী?

ইয়েস, ম্যাডাম। থিওরি নাম্বার ওয়ান, আমি কিডন্যাপার ; থিওরি নাম্বার টু, রবি রে কিডন্যাপার ; থিওরি নাম্বার থ্রী, ছেলেটা নিজেই নিজেকে কিডন্যাপ করেছে।

বুদ্ধিমতী পুলিশ পুঙ্গবী চকমকি চোখে বললেন, এমন ঘটনা আজকাল আকছার ঘটছে। ফিলিং অফ ইনসিকিউরিটি থেকে ছোটরা সেল্ফ-কিডন্যাপিং কেস সাজাচ্ছে। ইয়েস, ইয়েস, এটা একটা সলিড সম্ভাবনা।

চার নম্বর থিওরিটা নিয়েও ভাবতে পারেন, আমার চোখ এবার পর্যায়ক্রমে ঘুরছে ঘরের দুই হিমালয় নন্দিনীর মুখের ওপর। একটুও যতি না দিয়ে কথা টেনে নিয়ে শেষ করে দিলাম চতুর্থ সম্ভাবনাটা, মা নিজেই ছেলেকে ভ্যানিশ করেছে লোক লাগিয়ে বাপকে ব্ল্যাকমেইল করবে বলে।

শ্বেতবদনা কল্পনা এখনই প্রকৃতই পাথরপ্রতিম। ধাক্কাটা একটু জোরালো হয়ে

গেছে বুঝলাম। কিন্তু আমি নিরুপায়। তাই কথার জের টেনে নিয়ে বললাম পুলিশ পুঙ্গবীকে—এটা একটা ডিসেপশন ট্যাকটিক্স। আসল ব্যাপারটাকে গোপনে রাখার জন্যে অন্য ঘটনার বাতাবরণ সৃষ্টি করা। ম্যাডাম, দিস ইজ মাই অ্যানালিসিস। ভেবে দেখুন, খবর দিন, ছেলের বাবাকে।

ছেলের বাবা এসেছিল যথাসময়ে। এসেই যে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়েছিল এক কথায়, তা পরের কথা হলেও এখন একটু ছুঁয়ে রাখি।

বলেছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ডিসেপশন ট্যাকটিক্সই বটে। পথের কাঁটা সরিয়েছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রমাণ? বন্ধুর ডিভোর্সি বউয়ের কাছে এসে রয়েছে কেন? ক্যারেক্টারলেস!

ইন্দ্রনাথ রুদ্রই তাহলে কিডন্যাপার!

২৬. কিডন্যাপারের পদসংকেত

আমি চলে এলাম আমার ডেরায়। কল্পনা চিটনিসের পাশের বাড়িতে। এক বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নিশ্চয় পূর্বাভাসের পথনির্দেশে। এখন বুঝলাম, সেই সিদ্ধান্ত কতটা নিরাপদে রেখেছে আমাকে। নইলে ফেঁসে যেতাম আগেই। আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখলে আগুন ঘি-কে গলাবেই। কল্পনার মতো শরীরী আগুন রেহাই দিত না আমাকে। ওর মতলব ছিল সেইটাই। কিন্তু আমার মতলব ছিল আরও গভীরে। সেই মতলব নিশ্চয় এতক্ষণে বিজ্ঞ পাঠক এবং সুচতুরা পাঠিকার অগোচরে থাকেনি।

ভিন্ন আবাসে থাকলেও বুদ্ধিমতী পুলিশ পুঙ্গবী কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। জানলা থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম, প্লেন ড্রেসে পুলিশ চর মোতায়েন করা হয়েছে বাড়ির সামনে। যাতে আমি চম্পট দিতে না পারি—রাতের আঁধারে।

শয্যাগ্রহণ করে, দু'হাতের দশ আঙুল পরস্পর সংলগ্ন করে মাথার তলায় দিয়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম রবি রে-তনয়ের কথা। ছেলেটা পয়লা নম্বরের বিচ্ছু নিঃসন্দেহে। বাপের উদ্দামতা আর মায়ের সর্পিল চিন্তাধারার রেশ নিশ্চয় জিন-দৌলতে এসেছে তার মধ্যেও। আমার খুব ন্যাওটা হয়ে গেছিল ঠিকই। যখন তখন আমার ডেরায় এসে দুরন্তপনা করত। এটা-সেটা দেখতে চাইত। আমার ডেঞ্জারাস কীর্তিকলাপের কাহিনি শুনতে চাইত। কিন্তু, কী আশ্চর্য, বাপের প্রসঙ্গ ভুলেও তুলত না। শিশু মনোবিদরা এই সহজ সতর্কতার কি ব্যাখ্যা করবেন, তা জানি না। আমি কিন্তু আমার সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলাম, পিতৃ প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে সযত্ন পিতৃ-স্মৃতি। স্মৃতির সেই মণিকোঠা কারুর কাছে উন্মোচন করাতে চায় না। ওটা ওর ঠাকুর ঘর। কাউকে সেখানে ঢুকতে দিতে চায় না। সেখানকার কোনও কথা বাইরে আনতে চায় না। অথচ সব স্মৃতিই রয়েছে চেতন মনে অবচেতনে যায়নি। দশ বছর বয়স যে ছেলের, সে যদি

মনের জোরে মনের মধ্যে একটা প্রকোষ্ঠ সম্পূর্ণ নিজস্ব করে রাখে, তাহলে তা ভাবনার ব্যাপার বইকি। মনের রোগ এই থেকেই দেখা যায়। ফিলিংস অব ইনসিকিউরিটি। নিরাপত্তাহীনতা বোধ। সেল্ফকিডন্যাপিং কেস ইদানিং, আকছার ঘটতে দেখা যাচ্ছে এই কারণেই। এই ডিভোর্স-কণ্টকিত সমাজে।

সোমনাথ হয়তো সেই পথের পথিক।

আমার অতীত কার্যকলাপ জানবার আগ্রহ ওর মধ্যে দেখেছিলাম একটু বেশি মাত্রায়। একদিন আমার ট্রফির বাক্স খুলে ঘাঁটতে বসেছিল, আমাকে না জানিয়ে। কতজনের কত উপকার করেছি, কত জনে কত পুরস্কার প্রদান করেছে, সে সব ঠেসে রেখে দিতাম একটা চেন-টানা ব্যাগে। সেই ব্যাগে ছিল একটা পঞ্চকোণ রূপোর তারকা। বেশ ভারি। প্রতিটি কোণ ছুঁচের মতো সরু। ওপরে লেখা আমার নাম।

হাতের চেটোর মতো বড় মেডেলটা নিয়ে ও যখন উল্টেপাল্টে দেখছে, আমি দেখে ফেলেছিলাম আমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখা ব্যাগ নিয়ে ওর কৌতূহল। আমার মোটেই ভাল লাগেনি। ব্যাগটা হাত থেকে নিয়ে, চেন টেনে দিয়ে, মাচায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

রূপোর তারকাটা সোমনাথকে প্রেজেন্ট করেছিলাম। বলেছিলাম, হিরো হওয়ার এই প্রাইজ দিলাম তোকে। হিরো হবি জীবনে, এই আমার আশীর্বাদ।

গোয়েন্দাগিরি বড় বেপরোয়া পেশা। এ পেশা গ্রহণ করব, এমন সাধ বা শখ কলেজ জীবনে আমার ছিল না। ছিল আমার আর মৃগাঙ্ক রায়ের প্রাণের বন্ধু প্রেমচাঁদ মালহোত্রার। পাঞ্জাব তনয়, ধর্মে শিখ। একে নম্বরের ডানপিটে আর হুল্লোড়বাজ। স্কটিশ চার্চ কলেজে আমাদের এই ত্রয়ীকে সমীহ করে চলত ললনারা। কারণ আমাদেব বাক্যবাণ ছিল বড় তীক্ষ্ণ। চোখাচোখা। বিশেষ করে প্রেমচাঁদের। যেহেতু ওর নামের আগে প্রেম আছে, সুতরাং হৃদয়ে প্রেম থই থই করছে, এই জাতীয় রসাল মন্তব্য টুকুস টুকুস করে সহপাঠিনীরা ছুঁড়ে দিলেই ও টকাস টকাস জবাব দিয়ে যেত। কিছু কিছু টিপ্পনি আজও মনে আছে। যেমন, হে প্রিয়ংবদা, তোমার ওই সূক্ষ্ম চাহনির ছুঁচ আমার এই মোটা চামড়ায় লাগলে ভোঁতা হয়ে যাবে। অথবা, সখী, হঠাৎ ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছ কেন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে? তোমার ওই লিপস্টিক কমিউনিকেশন ব্যর্থ যাবে এই চাঁড়ালের কাছে। ঠোঁট যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গবিশেষ বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া সাধনের জন্যে, তা কি আমার অজানা নয়? অথবা, সিলিকন বুক নাকি? অত দেখান হচ্ছে কেন?

লজ্জায় লাল হয়ে আমোদিনী কন্যাটি তখন পালাবার পথ পেত না, আর এক দুঃসাহসিনী মিঠে মিঠে হেসে বলে যেত—বুঝেছি, ওটা পদাঘাতের সংকেতে নয়, একেই বলে ম্যাকো পোজ ফর দ্য রাইট ম্যান। বাট, মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি, আই অ্যাম দ্য রং ম্যান।

বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্ট প্রেমচাঁদ এরকম কত কাণ্ডই করেছে কলেজ লাইফে। ওর চোখে কোনও সংকেত এড়িয়ে যায়নি। কোন কন্যার চোখে দ্যুতি ফুটিয়েছে

অথবা পা ঠুকে চলেছে। অথবা ডান পা'কে বিশেষ কোণে প্রেমচাঁদের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে অথবা বুকের ওপর দু'হাত বিশেষ কায়দায় ভাঁজ করে নিরুপম বক্ষপিণ্ডকে উঁচিয়ে রেখে, এসব ভ্যালেনটাইন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সংকেত মাঠে মারা যেত কাঠখোট্টা প্রেমচাঁদের কাছে।

প্রেমচাঁদ প্রসঙ্গ নিয়ে আচমকা এত কথা লিখলাম কেন? কল্পনার কাণ্ড দেখে সব যে মনে পড়ে গেল। হরেক বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ওপর প্রয়োগ করে গেছে কল্পনা। কিন্তু এই ঘি তাতে গলেনি। প্রেমচাঁদের কথা আরও বেশি করে মাথায় খেলে যাচ্ছিল সোমনাথ হাওয়া হয়ে যাওয়ার পর থেকেই।

আমি ডিটেকটিভ হব, কস্মিনকালেও ভাবিনি। আমার সেই যোগ্যতাই নাকি নেই। মুখ ফোঁড় প্রেমচাঁদ তো সোজাসুজি আমাকে বলত, ভেড়ুয়া বাঙালি। আমিও তেড়ে উঠে বলতাম, তেড়িয়া শিখ, শুধু কৃপাণ চালিয়েই যাবি সারাজীবন।

কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমি যখন শখের গোয়েন্দা হলাম, রিস্ক কম বলে, স্রেফ হবি তো—প্রেমচাঁদ তখন সিরিয়াস হয়ে গোয়েন্দাগিরিকে পেশা করে নিয়ে একটু একটু করে জাল ছড়িয়ে দিয়ে ঘাঁটি পেতে বসল গোটা পৃথিবী গ্রহটায়। শিখ জাতটা একটা জাত বটে। আজকে ওর গোয়েন্দা সংস্থা টেক্কা দেয় আমেরিকার এফবিআই-কে, ওর কীর্তিকলাপের খবর রাখে ইণ্ডিয়ার 'র' অর্থাৎ রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং। এই সাইবার আর হাইটেক ক্রাইমের যুগে পেছিয়ে নেই শিখ নন্দনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

সেই নির্ভীক শিখ বন্ধুর শরণ নেওয়া মনস্থ করলাম চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করতে করতে।

ঝিমুনি এসেছিল কিছুক্ষণের জন্যে। সমস্ত সত্তা যখন সজাগ থাকে, তখন মগজে তন্দ্রা প্রলেপ লাগিয়ে যায়, মগজ কিন্তু ঘুমোয় না। মানুষের মগজ জন্ম মুহূর্ত থেকে ঘুমোয় না। মগজ অতন্দ্র। মগজ আজও অজানা রহস্য।

তাই ভোর রাতে উঠে পড়েছিলাম আমার বডি অ্যালার্মের সংকেতে। এবার বেরোতে হবে। নিখোঁজ সোমনাথকে খুঁজতে যেতে হবে।

ঠিক সেই সময়ে বেজে উঠেছিল আমার স্যাটেলাইট টেলিফোন। পুলিশ পুঙ্গবীব কাঠ-কাঠ ধারালো কথাগুলো কানের পর্দায় বিঁধে বিঁধে গেছিল—মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র?

স্পিকিং।

কিডন্যাপারের টেলিফোন কল ব্যাক আপ করা হয়েছে। চোরাই মোবাইল থেকে ফোন করা হয়েছিল।

আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। সব কিডন্যাপার তাই করছে।

ইয়েস, ম্যাডাম!

পাহাড়ের ঢালে তখন রোদ এসে পড়েছে।

পুলিশ পুঙ্গবী বললেন, গেমস ফ্রিক কোথায় পড়েছিল, মিঃ রুদ্র?

ঢাল বেয়ে নেমে গেলাম একটু একটু করে। মাটি এখানে আলগা। কাল বিকেলেই এক দফা হেঁটেছি, মাটি তোলপাড় করেছি পায়ের জুতো দিয়ে। হেঁটে গেলাম পাশ কাটিয়ে। সরু পথটা বাঁচিয়ে হাঁটছি। সোমনাথ ওই পথ দিয়েই নেমেছে। ওর পায়ের ছাপ যেন নষ্ট না হয়ে যায়। ওর ফুট প্রিণ্ট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—গতকাল যে রকম দেখেছিলাম, সেইভাবেই রয়েছে।

পৌঁছে গেলাম গাছপালার জায়গায়। এখান থেকেই জমি পাথুরে হতে হতে চলেছে। মাটির ভাগ কম। তাতে ঘাবড়ালাম না। পায়ের ছাপ না পড়ুক, গতকাল তো দেখে গেছি, কোথায় পড়েছিল গেমস ফ্রিক খেলনা। ঢাল বেয়ে শর্টকাট করলাম। পুলিশ পুঙ্গবী দু'বার হড়কে গেলেন।

পৌঁছে গেলাম ঘেসো জমিটায়, যেখানে গতকাল পড়ে থাকতে দেখেছি গেমস ফ্রিক টয়। সোমনাথের পদচিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এদিকে-সেদিকে।

হেঁট হলেন পুলিশ পুঙ্গবী। নরুন চোখে দেখে গেলেন প্রতিটি ফুট প্রিণ্ট। মুখ তুললেন, এই ছাপগুলো আপনার জুতোর?

হ্যাঁ। এখন যা পায়ে রয়েছে।

পা তুলে, জুতোর তলদেশ ধরলাম ভদ্রমহিলার চোখের সামনে। কোনও মহিলাকে এভাবে জুতো দেখানো অতিশয় অভদ্রতা। কিন্তু পুলিশি তদন্তে এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে নেই। পুলিশ পুঙ্গবীও দিলেন না। চারু নয়নে সুচারুভাবে আমার পাদুকার তলদেশ নিরীক্ষণ করলেন। যেন, আয়নায় মুখ দেখছেন। যৎকিঞ্চিৎ পরিহাসের প্রয়াস সামলে নিলাম। কারণ, এই মুহূর্তে তিনি কঠোর নয়না। এবং স্থিতধী। সূচিসূক্ষ্ম চাহনি নিবদ্ধ সোমনাথের বিশেষ প্যাটার্নের শু-প্রিণ্টের ওপর। কয়েক জায়গায় ঘাড়ে ঘাড়ে পড়েছে জুতোর ছাপ। খেলনা নিয়ে মেতে ছিল নিশ্চয় ঘেসো জমিতে। তারপর নেমে গেছে ঢাল বেয়ে। আমি ফলো করলাম সেই ফুট প্রিণ্ট—সাধারণ চোখে যা অদৃশ্য।

অদৃশ্য পুলিশ পুঙ্গবীর চোখেও। তাই বললেন, চললেন কোথায়?

পায়ের ছাপের পিছনে।

আপনি কি ব্লাডহাউণ্ড?

গত জন্মে ছিলাম।

ঘাসের মধ্যে বিলীয়মান সোমনাথ-পদচিহ্ন ফুট আষ্টেক এসেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইখান থেকে যেন ডানা মেলে উড়ে গেছে ছেলেটা।

তীক্ষ্ণ নয়না পুলিশ পুঙ্গবী তা লক্ষ্য করলেন। বললেন, কেউ যদি তুলেই নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো তার পায়ের ছাপ থাকবে। অথবা ধস্তাধস্তির চিহ্ন। কিছুই তো দেখছি না। কারণ তাকে আচমকা তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তাই যদি হয়, পুলিশ পুঙ্গবীর ভুরুযুগল গাণ্ডীব ধনুর মতো বক্র—তাহলে যে তুলে নিয়ে গেছে, তার পায়ের ছাপ তো থাকবে।

আমি জবাব দিলাম না। দিতে পারলাম না। ডানা মেলে উড়ে যায় না একটা

মানুষ। হনুমানের মতো লাফ দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যায় না। সোমনাথের পায়ের ছাপ কিন্তু আচমকা আর নেই। জমির দিকে নজর রেখে তিন-চার গজ দূরে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

মাটিতে জাগ্রত রয়েছে অস্পষ্ট পাদুকাচিহ্ন।

এই জুতোর গোড়ালি বড়। সোমনাথের জুতোর গোড়ালির চাইতে বড়।

হেঁটে হলাম গোড়ালির পিছনে। জুতোর ডগা যেদিকে ফিরে থাকা উচিত, তাকালাম সেদিকে। ডগা ফিরে রয়েছে সোমনাথের শেষ পদচিহ্ন যেখানে রয়েছে, সেইদিকে।

সোমনাথ-পদচিহ্নকে কেন্দ্রবিন্দু করে একটা চক্কর মারলাম—বড় গোড়ালিওলা জুতোকে দিয়ে মনে মনে একটা বৃত্ত ভেবে নিয়ে।

কিন্তু নেই। নেই আর কোনও ফুটপ্রিন্ট। অথচ থাকা উচিত ছিল। বড় গোড়ালির ছাপ পড়েছে আধখানা। তারপর আর কিছু নেই। পুরো জুতোর ছাপ তো নেই-ই গোড়ালির ছাপটাও পুরো পড়েনি। কিন্তু পয়েন্টিং করে রয়েছে সোমনাথের জুতোর ছাপের দিকে।

মনে মনে কল্পনা করে নিলাম ঘটনা-দৃশ্য। কল্পনা দিয়ে বানিয়ে নিলাম কী কী ঘটেছিল, কেমনভাবে ঘটেছিল। এমন ঠাণ্ডাতেও মনে হল, বুঝি ঘামছি।

এদিকের এই পাহাড়ি ঢালে শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি। ঢাল বেয়ে পা টিপে টিপে জান্তব চরণে উঠে এসেছে একটা লোক। ঝোপের আড়ালে আড়ালে উঠেছে, শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে উঠেছে, অথচ বনচর শিকারি পশুর মতো পায়ের শব্দ জাগ্রত করেনি এতটুকু। তাই কিচ্ছু শুনতে পায়নি সোমনাথ। শুকনো পাতা আর ভাঙা ডাল মাড়িয়ে এইভাবে নিঃশব্দ চরণে আসতে পারে শুধু বনের মাংসাশী শিকারি বেড়াল জাতীয় প্রাণি। ঝোপ ভেদ করে সেই মানুষ-বনচর সোমনাথকে দেখতে পায়নি—কিন্তু তার গেমস ক্লিকের আওয়াজ শুধু কানে শুনে উঠে এসেছে ঢাল বেয়ে একটু একটু করে। তারপর প্যান্থার লম্ফ মেরে দশ বছরের ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গেছে এমনই বিদ্যুৎসম ক্ষিপ্রতায় যা চোখে না দেখলে প্রত্যয় হবে না। চেঁচানোর সুযোগটুকুও দেয়নি সোমনাথকে। এইভাবে যারা মানুষ গায়েব করে, তারা জানে, আগে খপ করে কীভাবে মুখ বন্ধ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শূন্যপথে বডি তুলে নিয়ে যেতে হয়।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম চারদিকে। দশ ফুট দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সোমনাথও দেখতে পায়নি দশ ফুট দূরের ঝোপের মধ্যে গা ঢেকে ওত পেতে থাকা আততায়ীকে।

গলা শুকিয়ে এসেছিল আমার কিডন্যাপিং সিনটা কল্পনা করতে গিয়ে। পুলিশ পুঙ্গবী একদৃষ্টে চেয়েছিলেন আমার ভাবনা-ক্লিষ্ট চোখের দিকে।

এখন বললেন খুব আস্তে, আপনি ধোঁকায় পড়েছেন? চোখে ধোঁয়া দেখছেন?

হয়তো কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের প্রলেপ ছিল। কিন্তু আমি তা গায়ে মাখিনি। শুকনো গলায় বলেছিলাম, ম্যাডাম, এ কাজ যে করেছে, তার কমব্যাট এক্সিপিরিয়েন্স আছে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে ওস্তাদ?

ইয়েস, ম্যাডাম। শিকারি জন্তুর মতো পেছন নিতে পারে, ছোঁ মেরে শিকারকে তুলে নিয়ে যেতে পারে, দশ ফুট লাফিয়ে আসে উড়ন্ত পাখির মতো, চেঁচানোর সুযোগ দেয় না, টুঁটি টিপে ধরে, মুখ বন্ধ করে দিয়ে।

যেন গা হিম হয়ে গেল ম্যাডাম পুলিশের, অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হয়েছিল আমার। অথচ পাহাড়ের মেয়ে তিনি, বিলক্ষণ ডাকাবুকো।

কিন্তু মানুষ-শিকারি নন। সোমনাথকে যে নিয়ে গেছে, সে পোক্ত ম্যান-হাণ্টার। এই পাহাড়ে সে ঘাপটি মেরে নজরে রেখেছে আমাকে আর সোমনাথকে বেশ কয়েকদিন ধরে। মুখস্থ করেছে দু'জনের সমস্ত গতিবিধি। কোথায় হাঁটি, কোথায় দাঁড়াই—সমস্ত। সে জানত আমি কোথায় থাকি, সোমনাথ কোথায় থাকে, আর তার মা এখন কাছে নেই। নজরে নজরে রেখেছিল বলেই জেনেছিল কখন একা-একা বেরিয়ে গেল সোমনাথ। ছোঁ মেরেছে ঠিক তখনই।

এ হেন লোকেদের অসাধ্য কিচ্ছু নেই। এর জন্যে দরকার স্পেশ্যাল ট্রেনিং। যে ট্রেনিং আছে আমারও।

২৭. হোকাস পোকাস নয় এই কিডন্যাপিং

বাড়ি ফিরেই ফোন করলাম প্রেমচাঁদকে—কমব্যাট এক্সপিরিয়েন্স যার আছে, এমন একজনকে পাঠা। কুইক। সোমনাথ কিডন্যাপড। সন্দেহভাজন আমি।

সেকেণ্ড কয়েক কোনও জবাব দিল না দুর্ধর্ষ বন্ধু।

বললে তারপর, সুফি যাচ্ছে।

সুফি মানে একটা টেরর। শরীরী আতঙ্ক। আমি তার নাম দিয়েছি, অ্যালোপেসিয়া হাল্পে। কারণ, সে নির্লোম মানুষ।

তার হাত পা আর আগ্নেয়াস্ত্র চলে সমান তালে, প্রায় লাইটনিং স্পীডে। যখন প্রতিপক্ষ থ' হয়ে যায় তার লোমহীন অবয়ব দেখে।

এমন মানুষকেই আমার এখন দরকার। প্রতিপক্ষকে সমঝানো দরকার, ঘাঁটিয়েছ কাকে। তার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

কল্পনার মুখ থেকে বুঝি সব রক্ত নেমে গেল পায়ের দিকে, আমার কথা শেষ হওয়ার পর। একটি কথাও না বলে রিসিভার তুলে কনট্যাক্ট করেছিল রবি রে-কে—এখুনি এস। সোমনাথ কিডন্যাপড হয়েছে।

এবার শোনা যাক সোমনাথের কাহিনি—তার জবানিতেঃ

ইন্দ্রনাথকাকুর বাড়ির নিচে গেমস ফ্রিক নিয়ে তন্ময় হয়েছিলাম। বেশ নিরিবিলি

জায়গা। চারদিকে মানুষ-টানুষ নেই। যেদিকে তাকাই শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। এমন জায়গায় এসে আমার অনেক কথা মনে পড়ে যায়। খুব ছেলেবেলার কথা। আমাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করত বাবা আর মা। চোখের মণি ছিলাম দু'জনেরই। এখন একজনের। কী যে হল। মা বলে, বাবাকে আর মনে রাখবার দরকার নেই। মনে কর, তোর বাবার জায়গায় এসেছে ইন্দ্রনাথ কাকু। দেখছিস তো তোকে কত ভালবাসে। কত কিছু কিনে দেয়। তোর আগের বাবা তোর খোঁজও নেয় না।

'আগের বাবা' কথাটা আমার কানের মধ্যে খচ খচ করে লাগে। 'আগের বাবা' আবার কী? বাবা তো একজনই হয়। বাবার জন্যেই তো আমি জন্মেছি। আমি কি বাচ্চা ছেলে? কিছু বুঝি না? বাবা কখনও পাল্টায়? মা ওই সব ধানাইপানাই বলে আমার মনটাকে কাকুর দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়। আমি যেন কাকুকে বাবার মতো দেখতে শিখি। ভালবাসি। আপন করে নিই। তাহলে মায়ের সুবিধে হবে। কী সুবিধে হবে, তা কি আমি জানি না? আমি অত বোকা নই। মা তো বাবাকে ডিভোর্স করেছে। নাকি, বাবা ডিভোর্স করেছে মাকে? পরিষ্কার জানি না। তবে, খুব চেঁচামেচি হয়ে গেছিল দু'জনের মধ্যে। হিরে নিয়ে নিশ্চয়। হিরে... হিরে শব্দটা আড়াল থেকে কানে এসেছিল। মা নাকি বাবার হিরে নিয়েছে। কী আশ্চর্য! বাবা তো মাকে অনেক গয়না দিয়েছে। হিরেও নিশ্চয় দিয়েছে। তাতে এত মাথা গরম করবার কী আছে? দোষটা বাবার।

কিন্তু মা যখন গয়নার বাক্স খুলে নাড়াচাড়া করে, হিরে তো আমি দেখিনি। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—মা, হিরেগুলো কোথায়? মা আমাকে ঠাস করে চড় মেরে ছিল। তারপরেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল। কী কান্না! কী কান্না!

সেই থেকে হিরে নিয়ে আর কোনও কথা আমি বলি না। আমার যখন ছ'বছর বয়স, তখন এইসব ব্যাপার ঘটেছিল। তারপর মা চলে এল এই পাহাড়ে। বাবাকে আর দেখিনি। কষ্ট হয়। কিন্তু মুখে বলি না।

এমন সময়ে এলেন ইন্দ্রনাথকাকু। মস্ত গোয়েন্দা। হিরে খুঁজতে নাকি? আমার সন্দেহ হয়। নাকি, আমার মাকে বিয়ে করতে? মায়ের রকমসকম দেখে বুঝতে পারি, মা চায় তাই! ইন্দ্রনাথকাকুকে বিয়ে করতে।

আচ্ছা, হিরেগুলো ইন্দ্রনাথকাকুর কাছে নেই তো? গোয়েন্দা তো। হয়তো হারিয়ে যাওয়া হিরে উদ্ধার করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। সেই লোভ দেখিয়ে মাকে বিয়ে করতে চাইছেন। গোয়েন্দারা সব পারে।

কিন্তু আমি তো তক্কে তক্কে থাকি। ইন্দ্রনাথ কাকু আমাদের বাড়িতে থাকেন না কেন? হিরে যাতে মায়ের হাতে না পড়ে, নিশ্চয় সেইজন্যে। এই দশ বছর বয়েসে আমি কচি খোকা নই। নজরে নজরে রাখি ওঁকে আর মাকে। একবারও মায়ের গা ছোঁন না ইন্দ্রনাথকাকু। সব সময়ে তফাতে থাকেন। রাত হলে অন্য

বাড়িতে। এ বাড়িতে শুধু আমি আর মা। অনেক আগে আমরা তো তিনজনে এক সঙ্গেই থাকতাম। আমি, বাবা আর মা।

গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে চেয়েছিলাম একদিন। ইন্দ্রনাথকাকুর জিনিসপত্র হাঁটকে দেখছিলাম যদি হিরে-টিরে পাওয়া যায়। কিন্তু ধরা পড়ে গেছিলাম। বকেননি। উল্টে আমাকে একটা সিলভার স্টার প্রেজেণ্ট করেছিলেন। পঞ্চকোণ রজত নক্ষত্র। বেশ ভারি। বলেছিলেন, বীরত্ব দেখিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলাম। তোকে দিলাম। বীরপুরুষ হবি—এই স্টারের জোরে।

পকেটে রাখি সেই স্টার। কোণগুলো বড় ধারালো। গায়ে ফুটে যায়। কিন্তু নিজেকে মস্ত গোয়েন্দা মনে হয়। মহাবীর। শক্তিমান। টিভির শক্তিমানের মতো যা খুশি করতে পারি।

গেমস ফ্রিক চালিয়ে রেখে এইসব যখন ভাবছি, আচমকা কে যেন আমার মুখ চেপে ধরল পিছন থেকে। চোখেও হাত চাপা দিল। ঝটকান মেরে তুলে নিল শূন্যে। সাঁ সাঁ করে এত তাড়াতাড়ি বয়ে নিয়ে গেল আমাকে যেন আমি একটা সোলার পুতুল। এমনভাবে খামচে ধরেছিল, একটুও নড়তে পারিনি, চেঁচাতে পারিনি। আমি টিভির শক্তিমান, কিন্তু আমাকে যেন পোকা বানিয়ে ফেলেছিল। প্রথমটা হকচকিয়ে গেছিলাম। তারপর স্পষ্ট মনে হল, নিশ্চয় ইন্দ্রনাথকাকু কিছু একটা মতলব এঁটেছেন আমাকে নিয়ে।

শূন্যপথে আমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, একটুও আওয়াজ করতে না দিয়ে, ঢাল বেয়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল একটা গাড়ির মধ্যে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেছিল দরজা। আওয়াজ শুনে বুঝেছিলাম, বেশ ভারি দরজা। গাড়িটাও নিশ্চয় তাই। আঠালো ফিতে দেওয়া হয়েছিল আমার মুখের ওপর। তারপর একটা থলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাথা গলিয়ে—যাতে কিছু দেখতে না পাই। ফিতে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল হাত আর পায়েও। কিন্তু লড়ে গেছিলাম। ফিতে যাতে লাগাতে না পারে, তাই হাত-পা ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু চোখে না দেখলেও বুঝেছিলাম, একজন নয়, অনেকজন আমাকে কাবু করে রেখেছে। আরও বুঝেছিলাম, রয়েছি একটা ভ্যান গাড়ির মধ্যে। ডিজেল তেলের গন্ধ পাচ্ছিলাম।

তারপরেই গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। ড্রাইভিং আরম্ভ হয়ে গেছিল। যে লোকটা আমাকে খামচে-খুমচে ধরে রেখেছিল, সে বললে, কেউ দেখে ফ্যালেনি তো?

ড্রাইভার যেখানে বসে, জবাবটা এসেছিল সেইদিক থেকে—না।

এই লোকটাই তাহলে আমাকে কাঁক করে ধরে তুলে এনেছে।

যে লোকটা আমাকে পিষে মারছিল, সে বললে, ও ছেলে, নিশ্বাস নিতে পারছ তো? ঘাড় কাত করে হ্যাঁ বল।

আমি তখন ভয়ে কাঠ। কিচ্ছু করিনি।

ড্রাইভ যে করছিল, সে বললে, বুকে হাত দিয়ে দেখলেই তো হয়—হার্ট চালু থাকলেই বেঁচে আছে। এক পাটি জুতো ফেলে এলে পারতাম।

যে আমাকে ধরে রেখেছিল, সে বললে, খেলনাটা তো ফেলে এসেছ, ওতেই হবে। জুতোর চেয়ে বড় প্রমাণ।

গাড়ি নেমে গেল নিচের দিকে। আবার উঠল ওপর দিকে। মিনিট কয়েক পরে দাঁড়িয়ে গেল। কান দিয়ে শুনলাম আর একটা লোক উঠে এল গাড়ির মধ্যে।

তিনজনেই কথা বলছে হিন্দিতে। কিন্তু হিন্দি যাদের মাতৃভাষা, তাদের মতো নয়। স্কুলে আমি হিন্দি শিখেছি। তফাত বুঝতে পারি। এক-একজনের হিন্দি বুকনি এক-এক রকম। নানান অঞ্চলের লোক নিশ্চয়।

একজন বললে, ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে দেখতে পাচ্ছি।

আর একজন বললে, করছে কী?

ঢাল বেয়ে নামছে। গেমস ফ্রীক্ তুলে দেখছে। বাড়ির দিকে ছুটছে।

এরপর আসবে মা।

মায়ের নাম কবতেই আমি ছটফটিয়ে উঠেছিলাম। পরে মাকেও তুলে আনবে নিশ্চয়। ফিতে থেকে দু'হাত টেনে বের করবার চেষ্টা করেছিলাম। এই লোকগুলোকে লাফিয়ে শায়েস্তা করে মাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, পুলিশকে খবর দিতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আমাকে পোকার মতো পিষে রেখেছিল প্রথম লোকটা। যে আমাকে তুলে এনেছিল। তার গায়ে অসুরের মতো জোর।

গাড়ি থেমেছিল অনেক অনেক পরে...

ড্রাইভ করছিল যে, তার গলার আওয়াজ চোয়াড়ে। বললে, এবার ফোন করা যাক।

শুনতে পেলাম, দরজা খুলে সে নেমে গেল। ফিরে এল একটু পরেই।

বললে, কাম ফতে।

ফের স্টার্ট নিল গাড়ি। নেমে গেল ঢাল বেয়ে নিচের দিকে। আবার উঠল এঁকাবেঁকা পথে ঘুরে ঘুরে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। রোলিং শাটার তোলবার আওয়াজ শুনলাম। নিশ্চয় গ্যারেজ খুলছে। গাড়ি এগিয়ে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ হল। পিছনের দিকে রোলিং শাটার নেমে আসার আওয়াজ শুনলাম।

আমার পায়ের ফিতে খুলে দিল একজন। বললে, আয়।

এই সময়ে টানা হ্যাঁচড়ায় থলি সরে গেছিল চোখের ওপর থেকে।

দেখলাম, রয়েছি একটা গ্যারেজের মধ্যে। গাড়িটাও দেখলাম। সাদা রঙের ভ্যান গাড়ি। ধুলো বোঝাই। পাশের দিকে নীল রঙে কি যেন লেখা। পড়বার আগেই হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে এনে আমাকে নিয়ে গেল একদিকে।

কর্কশ কণ্ঠে বললে, সামনে সিঁড়ি। পা তোল।

বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে টের পেলাম সিঁড়ির ধাপ।

কিন্তু নড়ছি না দেখে আমাকে ঝটকান মেরে কাঁধে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে নামিয়ে দেওয়া হল মেঝেতে।

চোখের ওপর থেকে থলি ফের একটু সরে গেছিল। দেখতে পেলাম একটা ফাঁকা ঘর। ছোট্ট। ফার্নিচার-টার্নিচার নেই।

কিন্তু একটা চেয়ার ছিল পিছনে। আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিল তাতে।

হেঁড়ে গলা বললে, থলি তোল। ছোঁড়ার মুখটা দেখি।

পিছন থেকে একজন টেনে তুলল থলি। আমি দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক পেল্লায় পুরুষ। খুব ঢ্যাঙা, মাথাটা প্রায় ঠেকছে গ্যারেজের ছাদে। খুব কালো। কপালে, চোখের নিচে, দু'গালে গোল গোল কালচে দাগ—যেন ছ্যাঁকা মেরে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। চামড়া পুড়ে গেছিল। এখন শুকিয়ে গেছে। বীভৎস! মাথায়, গালে, ভুরুতে—কোথাও চুল নেই।

আমি শিউরে উঠেছিলাম। কানের কাছে একজন বললে—আফ্রিকার কাফ্রি। বদমাইসি করিসনি। কাঁচা খেয়ে নেবে।

কাফ্রি দানোটা চিবিয়ে চিবিয়ে হিন্দিতে বললে, ঢুকিয়ে দাও বাক্সে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ফের ফিরে জড়িয়ে দিল আমার দু'পা এক করে। মাথায় তুলে নিয়ে গেল বাইরে—ঠাণ্ডা বাতাসে। তখন নিশ্চয় রাত নেমেছে। শীত কড়া। ঠেলেঠুলে আমাকে ঢুকিয়ে দিল একটা কফিনের মতো প্লাস্টিক বাক্সের ভেতরে। উঠে বসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিল চিৎ করে। ডালা বন্ধ করে দিল মাথার উপর। বুঝলাম, শূন্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাক্স। তারপর স্পষ্ট টের পেলাম, বাক্স ফেলে দিল কুয়োর মতো একটা গর্তের নিচে। দড়াম করে বাক্স আছড়ে পড়ল নিচে। কী যেন ঝুরঝুর করে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে লাগল বাক্সের ওপর। আমার মুখের ইঞ্চি কয়েক ওপরে বাক্সের ডালার ওপরে। বেড়েই চলল সেই প্রপাত-শব্দ।

গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তখনই।

বুঝেছিলাম, জ্যান্ত কবর দিচ্ছে আমাকে।

২৮. অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক

নাইজেল জাতে আফ্রিকান। ডেয়ারিং ডেকয়েট। মানে, অসম সাহসিক ডাকাত। সাউথ আফ্রিকা কাঁপিয়েছে এককালে। যত রাগ সাদা চামড়ার মানুষের ওপর। সাদাদের অত্যাচার কালোদের ওপর জন্ম জন্ম ধরে চলে আসছে... যাবে।

এই নাইজেল রূপান্তরিত হয়ে গেছিল একটা টেরিবল শক খাওয়ার পর। মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছিল বেস্ট ফ্রেণ্ড। ছ'মাসের মধ্যেই খসে গেছিল সমস্ত চুল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব জায়গা থেকে।

সবাই ভেবেছিল কুষ্ঠ-টুষ্ঠ জাতীয় কুৎসিত রোগ ধরেছে। আফ্রিকা তো রোগের ডিপো। এই কালো মহাদেশেই নাকি প্রথম মানুষ এসেছিল। নাইজেলও নিশ্চয়ই এক রূপান্তরিত মানব—এই অ্যাটমিক যুগে।

ডাক্তাররা বললেন অন্য কথা। এটা একটা রোগ। মেণ্ট্যাল শক থেকে এসেছে।

সমস্ত চুল, সমস্ত লোম ঝরে যায়। মাথা থেকে, ভুরু থেকে, চোখের পাতা থেকে, গায়ের চামড়া থেকে। নির্লোম মানুষ হয়ে যায়। লোম আর চুল ফের গজাবে কিনা, কেউ তা বলতে পারে না। মেডিক্যাল সায়ান্স যতই এগোক, অনেক হেঁয়ালির সমাধান এখনও করে উঠতে পারেনি।

অ্যালোপেসিয়া মানে টাক পড়া নয়। অন্য ব্যাপারে। মেয়ে আর বাচ্চাদেরও হতে পারে। এ রোগে যন্ত্রণা হয় না, প্রাণ যায় না। কিন্তু আত্যন্তিক দুর্ভোগটা থাকে মনের মধ্যে। চুল দেখেই মানুষ চেনা যায়। নির্লোম মানুষকে শনাক্ত করা মহা মুশকিল।

তাই কালো মহাদেশের একটা কালো সংঘ-গুপ্ত সমিতি—একটা নির্মম ব্যবস্থা নিয়েছিল নাইজেলকে চেনবার জন্যে। গাঁজার কলকের মতো ছোট স্টিল পাইপ আগুনে তাতিয়ে চিত্রবিচিত্র করে দিয়েছিল নাইজেলের গোটা মুখমণ্ডল।

আমি, ইন্দ্রনাথ রুদ্র, তা জানলুম কী করে?

ক্রমশ প্রকাশ্য। সহৃদয় পাঠক এবং সর্বাণীরূপিনী পাঠিকা (সর্বাণী মানেই যে মা দুর্গা, তা কি ব্যাখ্যা করতে হবে?) তো জানেন, লেখক যখন কলম ধরেন, তখন তিনি দিব্যদৃষ্টি পান—আমি শ্রীহীন ইন্দ্রনাথ রুদ্রও এই মুহূর্তে কলম ধরেছি...

তাই ছুঁয়ে গেলাম অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক-মানবকে। যাকে দেখে শিউরে উঠেছিল কল্পনা আর রবি রে'র ছেলে সোমনাথ।

নাইজেল রহস্য আর একটু বিশদ করতে হবে? কলমবাজ লেখকরা টেলিপ্যাথিও জানে বইকি। পাঠক-পাঠিকার মনে অন্দর-কন্দরের অভীপ্সা তাদের অজানা থাকে না। জানা না থাকলে লেখাই যায় না।

তাই, ঔৎসুক্য নিবৃত্তির চেষ্টা করা যাক ছোট্ট একটা সংবাদ দিয়ে।

দুর্ধর্ষ ডানপিটে রবি রে'র জীবন কাহিনী সংক্ষেপে শুনিয়ে গেছি আগে। পাঠক এবং পাঠিকা জেনে গেছেন, রবি তার দুর্নিবার কৌতূহল নিয়ে হিরে খনি, হিরে মাজাঘষার কারখানা, হীরে বিক্রির মার্কেট দেখে এসেছে ভূমণ্ডলের বহু জায়গায়। সাউথ আফ্রিকার প্রাকৃতিক হিরক ভাণ্ডারের প্রসঙ্গও তখন এসে গেছিল। সেখানকার পাহারাদাররা কতখানি ঈগল চক্ষু হয়, সে কথাও বলা হয়ে গেছে।

নাইজেল, নিঠুর নির্লোম নাইজেল, এই রকমেরই এক হীরক খনির শান্ত্রীরূপে মোতায়েন ছিল একদা।

বাকিটা অনুমেয়। তীক্ষ্ণধী পাঠক এবং সহজবুদ্ধির পাঠিকা নিশ্চয় তা ধরে ফেলেছেন।

হ্যাঁ। নাইজেল চেনে রবিকে। রবি চেনে নাইজেলকে।

সুফি'র কথা একটু আগে বলেছি। আমি যার নাম দিয়েছি অ্যালোপেসিয়া হাঙ্ক। নির্লোম দৈত্য। প্রেমচাঁদের বিশ্বব্যাপী অপরাধী অন্বেষণের গুপ্ত কর্মকাণ্ডে সুফি তার দক্ষিণ হস্ত। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বলেই প্রেমচাঁদ আজ বিশ্বজোড়া গোয়েন্দা সংস্থা। ভাবতেও ভাল লাগে। একসঙ্গে পড়েছি তো স্কটিশ চার্চে।

সুফি যেন হাওয়ায় উড়ে এল আমার পাহাড়ি বাড়িতে। কি করে এল, কোত্থেকে এল, সে সব প্রসঙ্গ অবান্তর। সুফি এসে গেল। অ্যালোপেসিয়া হাঙ্ককে দেখে পুলিশ পুঙ্গবীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল।

কিন্তু থমকে গেছিল রবি রে।

হ্যাঁ। রবি রে-ও পবন বেগে চলে এসেছিল পাহাড়ের বাড়িতে। ছেলে নিখোঁজ হলে। কোনও বাবাই স্থির থাকতে পারে না।

সে এসেছিল আমার ওপর রাশি রাশি সন্দেহ নিয়ে। মানুষের মন বড় বিচিত্র। আমি তার প্রিয়তম বন্ধু। তাই তার একদা প্রিয়তমা স্ত্রীর পিছনে চর হিসেবে মোতায়েন করেছিল আমাকে। সে জানত, আমার ওপর কল্পনার দুর্বলতা আছে। আরও জানত, আমি কলিযুগের ভীষ্ম। ছলাকলা দিয়ে কীভাবে ললনা—ছলনা—ব্যূহ ভেদ করি, তা তার অজানা নয়। বিশেষ করে 'মোমের হাত' কেসটার পর থেকে। তাই নির্ভয়ে আমাকে মোতায়েন করেছিল দুর্লভ হিরেগুলোকে যেন উদ্ধার করে আনি কল্পনার গর্ভ থেকে।

'গর্ভ' শব্দটায় যদি ভ্রূকুঞ্চন জাগে পাঠিকার, আমি নিরুপায়। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই বুঝবেন, ওরকম নিরাপদ আর একান্ত গোপনীয় স্থান ভূমণ্ডলে আর কোথাও নেই। তাই গর্ভ শব্দটাকে উপমা হিসেবে টেনে আনলাম আমার এই দুর্বল লেখনী দিয়ে।

মোদ্দা কথা, আমি ছিলাম রবি রে'র চর। অতীব বিশ্বাসযোগ্য স্পাই। অথচ দেখুন, নারী তাদের অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করে কত অসম্ভব কাণ্ডই না করে ফেলে।

টেলিফোনে রবিকে আরও কি বলেছিল কল্পনা, আমরা তা জানার কথা নয়। কিন্তু সে আমার সামনে এল একেবারে ভিন্ন রূপে, সেই অভিন্ন বন্ধুত্বের বাষ্পটুকুও চোখের তারায় অথবা বাক্যবর্ষণে না দেখিয়ে। সে এল মন থই থই সন্দেহ নিয়ে। সঙ্গে একজন ডিটেকটিভকে নিয়ে। মারেদাঙ্গা টিকটিকি।

বক্তব্য অতীব পরিষ্কার। সোমনাথকে আমিই কিডন্যাপ করিয়েছি।

পথের কাঁটা ভেবে। কল্পনাকে নইলে পাব কী করে? সেইসঙ্গে তার হিরে?

পুলিশ-পুঙ্গবীর নয়ন-তারকায় দেখলাম সেই একই সন্দেহের ছায়াপাত।

দশরূপা নারী। তাই তো তোমাদের দশ দিক থেকে প্রণাম করে শ্রীহীন এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র—কিন্তু কাছে ঘেঁষে না।

কি বিপাকেই না পড়েছিলাম সেদিন। ত্রাতারূপে এল সুফি। ভুবনজোড়া পাতা জাল থেকে নিমেষে গোপন খবর চলে আসত প্রেমচাঁদের স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত কন্ট্রোল কেবিনে।

দুর্ধর্ষ নাইজেল যে হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছে, সে খবর তার কাছে চলে গেছিল। তাই ক্ষুরপ্র বুদ্ধি খাটিয়ে চকিত সিদ্ধান্ত নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুফিকে—আর এক নির্লোম মানবকে।

চিত্ত যার গ্র্যানাইট দিয়ে গড়া—শরীরটা সিনেটার হাঙ্ক-এর মতো।

ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কাহিনি পরম্পরা রক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমি লেখক নই। আমাকে মাপ করবেন।

সুফি একা আসেনি। সঙ্গে এনেছিল একটা সারমেয়কে। বিশেষ জাতের কুকুর। আফ্রিকায় তার পূর্বপুরুষরা নেকড়ে-টেকড়ের বংশধর ছিল। গন্ধ শুঁকতে ওস্তাদ। হাওয়ায় গন্ধ থাকলেও তার গন্ধ-যন্ত্র টের পায়। এমনকি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যখন আসন্ন, তার ষষ্ঠ অথবা সপ্তম অথবা নবম ইন্দ্রিয় তা টের পায়। ইন্দোনেশিয়ায় যখন ভীম ভৈরবে সুনামি আছড়ে পড়েছে, তার অনেক আগেই নিকোবর থেকে প্রেমচাঁদের এক টিকটিকিকে নিয়ে সে চম্পট দিয়েছিল নিরাপদ অঞ্চলে।

টিকটিকি মানে যে ডিটেকটিভ, তা নিশ্চয় ক্ষুরপ্র বুদ্ধি পাঠক-পাঠিকাদের নতুন করে বলার দরকার নেই।

আশ্চর্য এই সারমেয় সহ সুফি নেমে গেল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঠিক সেইখানে, যেখান থেকে আর পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি সোমনাথের।

বাতাসের মধ্যে নিশ্চয় একটা গন্ধ ধরে ফেলেছিল সারমেয়। গর্জায়নি, তর্জায়নি। নিঃশব্দে দৌড়েছিল পাথুরে পথ বেয়ে।

বুঝেছেন কিসের গন্ধ?

ডিজেলের।

২৯. সোমনাথ যখন কফিনে

রবি রে যে ডিটেকটিভ নামক বস্তুটিকে সঙ্গে এনেছিল আমাকে কাত করার জন্যে, তাকে দেখতে অনেকটা সিনেমার র‍্যামবোর মতো। গুলি গুলি চোখে বরফ শীতলতা, হাত-পা গর্দানের পেশিগুলো ইস্পাতের তার বললেই চলে। রবি আমাকে চেনে। আমি নবনীত কোমল কবি-কবি দর্শনধারী হতে পারি, কিন্তু প্রয়োজনে শরীরী বিভীষিকা হয়ে যেতে পারি। যুদ্ধের দামামা যখন বাজে মাথার মধ্যে, তখন বিদ্যুৎ খেলে যায় প্রতিটি পেশির প্রতিটি তন্তুতে। 'ইন্দ্রনাথ যখন নৃশংস হয়' এই কাহিনী যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা অন্তত জানেন, আমি কি দিয়ে তৈরি।

রবি রে'র তা অজানা নয়। তাই কোত্থেকে জুটিয়ে এনেছে এই র‍্যামবো মার্কা মস্তানটাকে।

আমি ছিলাম আমার কোয়ার্টারে। পাহাড়ের খাদের ধারে আমাদের এই বাড়িটা ইংরেজি 'ইউ প্যাটার্নে' তৈরি। দোতলা বাড়ি। অনেকগুলো অ্যাপার্টমেণ্ট। আমি থাকতাম একটা প্রান্তে, সোমনাথের মা আর এক প্রান্তে। রবি এসে উঠেছিল সেই প্রান্তের অ্যাপার্টমেণ্টে—সোমনাথের বাবা যে—তার মায়ের কাছেই তো যাবে। ছেলে এমনই জিনিস। সন্তান যখন বিপদে, তখন বাপ-মা কাছে চলে আসে—বন্ধু হয় পর। আমে দুধে মিশে যায়, আঁটি যায় বাদ।

আমি তাতে আঘাত পাইনি। এসব ব্যাপারে আমার ভেতরটা পাথর হয়ে গেছে অনেক আগে। কবিতা বউদি আমাকে কলির কেষ্ট বলে খেপায় বটে, কিন্তু সমস্ত

সত্তা দিয়ে জানে—অশরীরী, হায়না, চিতা আর গরিলা—এই সব ক'টি পদার্থ দিয়ে গড়া তার প্রাণপ্রিয় ঠাকুরপো। কিন্তু পাথরও মুচড়ে ওঠে। হে পাঠক, হে পাঠিকা—আপনারা অন্তত তা জানেন।

যাক গে, বড় বেশি নিজের কথা লিখছি। কেন লিখছি? ডায়েরিতে সব্বাই প্রাণ খুলেই মনের কথা লিখে যায়। আমার এই কাহিনিও মাঝে মধ্যে ডাইরি স্টাইল নিচ্ছে। বিশেষ করে যখন মনে বেদনা আসে।

সেদিনও মনে কষ্ট পেয়েছিলাম। মানুষ তো আমি। বন্ধুকৃত্য করতে কলকাতার আরাম ছেড়ে এই পাহাড়ি মুলুকে এসেছি নিখোঁজ হিরের সন্ধানে। যে হিরে আছে পাথরের ডিমের মধ্যে, যে হিরে আর পাওয়া যায়নি।

যাবে কি করে? নাটের গুরু যে কল্পনা। এই কারণেই রবি আমাকে লেলিয়ে দিয়েছিল। তার একদা অর্ধাঙ্গিনীই সাত পাকে বেঁধে বিয়ে করা বরের কানে ফুসমন্ত্র দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে দিল আমার দিকে।

আমি নাকি মনের দিক দিয়ে পাথর? কবিতা বউদি উঠতে বসতে মুখনাড়া দেয় আমাকে এই একটা পয়েন্টে। তবে কেন সেদিন প্রিয় বন্ধুর বাষ্পীভূত অনুরাগের প্রত্যাবর্তন দেখে আমি অত কষ্ট পেয়েছিলাম?

বহুদর্শিনী পাঠিকা নিশ্চয় মুচকি হাসছেন। মনে মনে বলছেন, কত রঙ্গ দেখলাম ইন্দ্রনাথ রুদ্রের, দেখছি আর এক রঙ্গ। আগুন কাছে থাকলে ঘি গলবেই। ইন্দ্রনাথ তো ছার!

যে যা ভাবে ভাবুন, আমি বলে যাই আমার কাহিনি। ছোট করে।

রবি রে'র র‍্যামবো ডিটেকটিভ রক্ত চোখে আমাকে বললে, কোথায় রেখেছেন ছেলেটাকে?

সুফি ওর হাল্কা মার্কা বডিটাকে আমাদের মাঝখানে এনে ফেলে বললে, শাট আপ।

আমি 'আপার কাট' ঝাড়ব কিনা যখন ভাবছি, পাহাড়ের মেয়ে সেই পুলিশ পুঙ্গবী পাথুরে গলায় বললেন, ব্যস ব্যস, আর না। কোস্তাকুস্তি নট অ্যালাউড। পুলিশ টেক আপ করেছে কিডন্যাপিং কেস। আপনারা হেল্প করতে চান, করুন, প্লীজ, ফাইট করবেন না। লকআপে ঢুকিয়ে দেব।

কড়া গলা পর্বত কন্যার। তার পরেই সুর নরম করে বললেন, সোমনাথের কমপিউটার রয়েছে। বাচ্চারা ই-মেল নিয়ে অনেক কাণ্ড করে। সেই খোঁজ করছে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। সে যদি নিজেই নিজেকে কিডন্যাপ করে থাকে, ত' ফাঁস হয়ে যাবে। আমার তো তাই মনে হয়। ডিভোর্সি দম্পতির ছেলেমেয়েরা ইনসিকিওরড ফিল করলে এমনটা করে। আকছার ঘটছে। এখন—সুফির অপার্থিব আকৃতির কুকুরটাকে দেখিয়ে—এর নাকের হেল্প নেওয়া যাক।

তখনই কুকুর নামানো হয়েছিল শেষ পদচিহ্ন যেখানে দেখা গেছিল—সেখানে। সে যে গন্ধটা শুঁকে চনমনে হয়ে উঠেছিল, সুবুদ্ধি পাঠক এবং পাঠিকা ত' অনেক আগেই ধরে ফেলেছেন...

ডিজেলের গন্ধ!

এবার দেখা যাক, কফিনের মধ্যে সোমনাথ কী করছে। পাঠক এবং পাঠিকা, আপনারা তো অনিমা, লঘিমা প্রমুখ অষ্টসিদ্ধি করতলগত করে বসে আছেন। আপনাদের অজানা, আপনাদের অগম্য কিছুই নেই এই ত্রিভুবনে। সুতরাং...

সোমনাথের মাথার ওপর দেখা গেছিল একটা আলোক বিন্দু। বহু দূরের নক্ষত্রের মতো ঝিকিমিকি আলোক কণা, সকালের দিকে। নিশ্চয় বাতাসের ফুটো কেটে রাখা হয়েছে কফিনেব ডালায়। সেই ফুটোয় চোখ লাগিয়ে সে দেখেছিল, টিউবের মধ্যে দিয়ে বহুদূরের এক কণা নীল চাকতি।

ফুটোয় মুখ ঠেকিয়ে, মুখের দু'পাশে দু'হাতের চেটো জড়ো করে চেঁচিয়েছিল তারস্বরে—বাঁচান! বাঁচান! আমি এখানে—মাটির তলায়! হেল্প! হেল্প মি! আই অ্যাম ডাউন হিয়ার!

কেউ জবাব দেয়নি।

হেল্প!

সারারাতে অনেক মেহনৎ করেছে সোমনাথ। ফিতের বাঁধন থেকে মুক্ত করেছে দু'হাত আর দু'পা। লাথিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করেছে কফিনের প্লাস্টিক দেওয়াল। কিডন্যাপাররা নিশ্চয় চম্পট দিয়েছে এতক্ষণে। কেউ জানে না একটা জ্যান্ত ছেলেকে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করে শুইয়ে রাখা হয়েছে মাটির নিচে। পেটের জ্বালায়, তেষ্টার কষ্টে পটকে যাবে যথাসময়ে—কেউ জানতেও পারবে না। অনেক ল্যাথিয়ে, অনেক চেঁচিয়ে শেষকালে বেদম হয়ে ঘুমিয়ে নিয়েছিল এক চোট। তার পরেই ফের শুরু হয়েছিল হাত-পা ছোঁড়া আর মা-মা চিৎকার।

আর তারপরেই কে যেন কঁ্যাৎ করে একটা লাথি কষিয়েছিল তার পেটে। পরক্ষণেই যেন দশ হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক শক গোটা শরীরটাকে স্থানু করে দিয়েছিল এক চাবুকেই। বৈদ্যুতিক চাবুক।

চোপ। চেঁচাবি না?

বাক্সের কিনারায় উঁকি দিচ্ছে গেমস ফ্রিকের সেই মারকুটে কালিকা রানি। চাহনিতে জিঘাংসা!

চিল চিৎকার করে সোমনাথ বলেছিল, তুই তো সত্যি নস! মিথ্যে!

তাই নাকি? তাহলে খা আর একটা লাথি। লাগবে না। আমি তো মিথ্যে!

ককিয়ে উঠেছিল সোমনাথ।

আর তখনই চোখে পড়েছিল কালিকা রানির আঙুলের লম্বা লম্বা নখের ঝিলিক। ছুঁচোলো নখ, ছুরির ফলার মতো, ঝকঝকে। এই নখ চালিয়ে শত্রুকে ফালাফালা করে দেওয়ার অদ্ভুত কমব্যাট কৌশল গেমস ফ্রিক খেলনায় দেখিয়েছে কালিকা রানি।

এখন দেখাবে নাকি সোমনাথকে? শিউরে উঠে সিঁটিয়ে গেছিল দশ বছরের ডানপিটে।

দশ আঙুল-নখের দশখানা ছুরি সোমনাথের চোখের সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল কালিকা রানি—গাধা কোথাকার। ধার দেখেছিস ডগায়? দশখানা তুরপুন। ফুটিয়ে দিলে—

আমি বাড়ি যাব।

দেব তোর পেট চিরে—ফের যদি চেঁচাবি।

মা...মা...

তবে রে! কালিকা রানি লাফিয়ে আসতেই... তিড়বিড়িয়ে ছিটকে যেতে গেছিল সোমনাথ। আর ঠিক তখনই, প্যান্টের পকেটে থাকা জিনিসটা প্যাঁট করে ফুটে গেছিল উরুর চামড়ায়। রুপোর সেই তারকা। যা সে পেয়েছিল... ইন্দ্রনাথ রুদ্রের কাছে—প্রেজেণ্টেশন হিসেবে—সময় মতো কাজে লাগিয়ে মস্ত বীর হওয়ার জন্যে..

এসেছে সেই সময়!

দুঃস্বপ্ন তিরোহিত হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কালিকা রানি ধরিয়ে দিয়ে গেছে কফিন কেটে বেরোনোর হদিশ।

পঞ্চকোণ রজত তারকা দিয়ে সেই মুহূর্তে প্লাস্টিক কফিনের ডালা কাটতে শুরু করেছিল সোমনাথ। ছুরির মতো ধারালো প্রতিটা ডগা। আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছিল কাটা হল কতখানি। চোখে পড়েছিল এক লাইনের ক্ষীণ আকাশ।

বিপুল উদ্যমে মরিয়া ছেলেটা পঞ্চকোণের পঞ্চ ছুরি চালিয়ে চালিয়ে কেটে কেটে গেছিল কফিনের ঢাকনা। ঝুরঝুর করে প্লাস্টিকের গুঁড়ো ছড়িয়ে গেছিল সারা গায়ে...

ঠিক সেই সময়ে দুই কিডন্যাপারের মধ্যে কথা চলছে এইভাবে ঃ

অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক—ছেলেটাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।

মর্কটপ্রতিম সাগরেদ (যে চালিয়েছে সাদা ভ্যান) ঃ কিসের চিন্তা? ছোঁড়া রয়েছে তিন ফুট ধুলোর নিচে।

বেঁচে আছে কিনা একবার দেখা দরকার। তারপর ফোনে জানিয়ে দিতে হবে পার্টিকে—হিরে চাই, নইলে পাবে লাশ।

মর্কট কিডন্যাপার রিভলভারটা ট্রাউজার্সের পকেটে ঢুকিয়ে পা বাড়িয়েছিল গ্যারেজের দিকে।

অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক বলেছিল পেছন থেকে—হিরে না পেলে করবি কি ছোঁড়াটাকে নিয়ে?

পদক্ষেপে বিরতি না দিয়ে বলেছিল মর্কটাকৃতি ড্রাইভার—বাক্সের ফুটো বন্ধ করে দেব।

এই যে এত ঘটনা ঘটে চলেছে সিকিমের পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে ঘটছে, সেই জায়গাটা নিয়ে একটা শব্দও লেখা হয়নি এতক্ষণ। কাহিনির মূল টানে ভেসে গেছিলাম যে। তাছাড়া সাহিত্যের রস বিতরণেও আমি অপারগ! মৃগাঙ্ক লিখতে বসলে শুধু প্রাকৃতিক বর্ণনায় কাহিনি ভরিয়ে দিত।

কিন্তু আমি নেহাতই অকবি—চেহারায় যদিও অন্যরকম। তাই ছোট্ট করে ছুঁয়ে

যাচ্ছি রোমাঞ্চকর এই প্রাণ নিয়ে টানাটানির লীলাক্ষেত্র সম্পর্কে দু'চার কথা।

সিকিমে খেচিপেড়ি নামে একটা লেক আছে। এই লেক লেপচাদের কাছে বড় পবিত্র হ্রদ! উচ্চতায় এক হাজার আটশো কুড়ি মিটার। এই সরোবরের চারদিকে সারি সারি পতাকা ওড়ে সারবন্দী খুঁটির ডগায়। কৌতূহলোদ্দীপক একটা কিংবদন্তী আছে এই সরোবর সম্পর্কে। এত তো গাছ সরোবর ঘিরে। কিন্তু গাছের পাতা পড়ে না সরোবরের জলে। পড়লেই ছোঁ মেরে সেই পাতা তুলে নিয়ে যায় একটা না একটা পাখি। বিশুদ্ধ জলকে অশুদ্ধ হতে না দেওয়ার মহান দায়িত্ব যেন এখানকার বিহঙ্গকুলের। তাই সরোবর সব সময়ে টলটলে স্বচ্ছ—দর্পণপ্রতিম।

এ সরোবরের নাম ইচ্ছাপূরণের সরোবর! যারা বৌদ্ধ, যারা লেপচা, তারা বিশ্বাস করে—কল্পতরু সরোবর কারও মনের বাসনা অপূর্ণ রাখে না। দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়।

কুলিশ কঠোর এই কাহিনির মাঝে আচমকা ইচ্ছাপূরণের লেকের কথা নিয়ে এলাম কেন, তা জানতেই অবশ্যই আগ্রহী হয়েছেন নিবিষ্ট পাঠক এবং পাঠিকা।

কারণ আছে...কারণ আছে...ব্যাপারটা যদিও গভীর গোপন—কিন্তু দৈবাৎ আমি জেনে ফেলেছিলাম।

এই সরোবরের পাড়ে একদা হানিমুন করতে এসেছিল কল্পনা আর রবি। তখন দুজনেরই চোখে অনেক...অনেক স্বপ্নের রামধনু...যে রামধনু কিছু দূরের কাঞ্চনজংঘা ফলস থেকে বিচ্ছুরিত সূর্যের সাতটা রঙের রামধনুকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছাপূরণ সরোবরের পাড়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে দু'জনে নিবেদন করেছিল একটাই ইচ্ছা : ছেলে হোক আমাদের।

এসেছিল সেই ছেলে—সোমনাথ।

আর সেই ছেলেই জ্যান্ত কবরস্থ হতে চলেছে এই অঞ্চলেরই গভীর গোপন একটা সদ্য গড়ে ওঠা রিসর্টে। সোজা বাংলায় যা বদমাইসি করার আখড়া। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা এমন নিরালা জায়গাতেই তো শরীরী প্রেম জমে—বিয়ে না করেই—জমে পরকীয়া লীলা যা লাম্পট্যের অপর এক নাম। এখানকার ঘরে ঘরে চলে পর্নো সিডি...তোলাও হয় পর্নো ভিসিডি...যে বস্তুটার রমরমা ব্যবসা শুধু ভারতের মেট্রো সিটিগুলোতেই আটকে নেই—চালান যাচ্ছে বিদেশে...ভারতীয় লাস্যময়ীদের নগ্ন কেচ্ছার বাজার যে সেখানে অনেক বেশি। অশালীন ছবির বাজার যুগ যুগ ধরে রমরমা থেকেছে তামাম দুনিয়ায়। কিন্তু সেই শিল্পে এখন ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে এমন ফলের রস যার মধ্যে থাকে শরীর তাতানো আর নাচানোর মাদক দ্রব্য, বেশরম হওয়ার মতো দ্রব্য, হেসে কুটিপাটি হওয়ার জন্যে ঘরময় ছড়িয়ে দেওয়া হয় লাফিং গ্যাস, জুগিয়ে যায় মনের আনন্দ আর প্রাণের আরাম, খোদ ডেভিলকে বন্দনা করে ডেয়ারিং অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের এমন জায়গা তো পাহাড়ী অঞ্চলেই নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়া যায়...

সোমনাথ জীবন্ত কবরস্থ হতে চলেছে রমরমা এই রিসর্টের সন্নিকটে।

ঠিকানা? দুঃখিত। জানতে চাইবেন না। সব ইনফরমেশন সবাইকে দেওয়া যায় না।

রিসর্টটার নাম?

তন্ত্রমন্ত্র।

উদ্দামতার আড্ডা তন্ত্রমন্ত্র। নিরিবিলিতে নষ্টামি করার রিসর্ট তন্ত্রমন্ত্র। ইন্ডিয়ান পুলিশের নাগালের বাইরে—অথচ কোটিপতি ইণ্ডিয়ানদের লাম্পট্য চলে এইখানেই। ইন্ধন জুগিয়ে যায় বিবিধ নারকোটিক; যেমন, এক্সট্যাসি, জিএইচবি অথবা লিকুইড এক্সট্যাসি, মিথ্যামফিটামাইন বা স্পীড, ফেটামাইন বা কে অথবা ক্যাট ভেলিয়াম, রোহিপনল অথবা রুফিজ বা ফরগেট মি বড়ি, নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস, এলএসডি—যা অ্যাসিড। এর সঙ্গে চলে মাতাল করার মিউজিক আর স্ট্যাকাটো ড্যান্স। শরীর তখন শরীরে লেগে যায়...এক শরীরের টান আর এক শরীর রুখতে পারে না...রুখতে চায় না...

থাক আরও বর্ণনা। বিধাতার নির্মম প্রহসনের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার জন্যেই নক্কার জনক প্রসঙ্গে কিছুটা ছুঁয়ে গেলাম। এ হেন নরকের কাছেই নির্মিত হতে চলেছে আর এক নরক...

সোমনাথের জীবন্ত কবর!

সোমনাথের ধমনীতে বইছে কিন্তু রবি রে'র রক্ত। বংশগতির মহিমা দেখিয়ে গেছিল কফিনে চিৎ অবস্থায় শুয়ে। হাতের মুঠোয় ইন্দ্রনাথ রুদ্রের রৌপ্যপদক—সিলভার স্টার।

ধারালো কোণ দিয়ে ঘসে ঘসে কেটেছে প্লাস্টিক কফিনের ঢাকনা। ঝুর ঝুর করে ধুলো ঝরেছে, একটার পর একটা কোণ ভোঁতা হয়েছে, পরপর তিনটে কোণের ধার যখন চলে গেছে, চতুর্থ কোণ দিয়ে কাজ আরম্ভ করতেই দেখেছিল, মাথার ওপর ফুটো দিয়ে তারার আলো আর আসছে না।

পরক্ষণেই ভেসে এসেছিল দুশমন কণ্ঠস্বর, বেঁচে আছিস?

জবাব দেয়নি সোমনাথ।

দুই কিডন্যাপার এসেছে খোঁজ নিতে। কেন জবাব দেবে সোমনাথ?

শোনা গেল কণ্ঠস্বর—নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে!

অন্য কণ্ঠস্বর—অথবা মটকা মেরে রয়েছে। এই অবস্থায় কেউ ঘুমোয়?

তাহলে থাক।

নৈঃশব্দ্য ফিরে এল মাথার ওপর। একটু সবুর করল সোমনাথ। রুপোর কোণ দিয়ে ঘষে ঘষে প্লাস্টিক কাটা শুরু হল তার পরেই। খুব আস্তে...খুচ খুচ খুচ করে...আওয়াজ যেন ওপরে না যায়।

অনেক পরে পেয়েছিল কঠোর কেরামতির পুরস্কার। ধুস করে কাটা প্লাস্টিক আচ্ছাদন ধসে পড়েছিল গোটা শরীরটার ওপর। ওপরকার তিনফুট ধুলোর ওজন তো কম নয়।

কিন্তু ঘাবড়ায়নি সোমনাথ। টুঁ শব্দও করেনি। গায়ের জোরে প্লাস্টিক ডালা সমেত ধুলোর বোঝা মাথার ওপর তুলে যখন বেরিয়ে আসছে কবরের গর্ত থেকে,

ছুটে এসেছিল দুই কিডন্যাপার। একটু দূরে থাকলেও তাদের চোখ ছিল যে এইদিকেই। পঞ্চানন ঘোষালের 'অপরাধ বিজ্ঞান' পুস্তকে এমন কথাই তো লেখা আছে : অপরাধী অপরাধের জায়গায় ঘুরে ফিরে আসে...

তাই তারা প্রথমে দেখেছিল কবরের ঝুরো মাটি তোলপাড় হচ্ছে, তারপরেই দেখেছিল সোমনাথকে উঠে আসতে...

কিন্তু পালাতে দেয়নি। দৌড়ে গিয়ে মুখ চেপে ধরে টেনে এনেছিল গ্যারেজের মধ্যে। আর ঠিক তখনই নিঃশব্দে...অতিশয় শব্দহীন এবং বিদ্যুৎসম গতিতে সুফির সেই ভয়াল সারমেয়—বাতাসে ডিজেলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে এসেছিল এইখানে...

সাদা ভ্যানের ডিজেল ট্যাঙ্কের ছোট্ট চিড় দিয়ে যেটুকু গন্ধ বেরিয়ে বাতাসে ভেসে থেকেছে, প্রশিক্ষণ পাওয়া শিকারি কুকুরের কাছে সেইটুকুই তো মস্ত ক্লু!

মারামারির বর্ণনাটায় আর গেলাম না। ও সব থাকে হিন্দি সিনেমায়। দুই অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক জ্বলন্ত চোখে কীভাবে চেয়ে থেকে কীভাবে তেড়ে গিয়ে কি কাণ্ড করেছিল, যাক সেসব কথা। আমি ঘায়েল করেছিলাম বেটে মর্কটটাকে—রামরদ্দা দিয়ে। ঘাড়ের একটা বিশেষ জায়গায় ঠিকমতো চোট মারতে পারলে মহাবীরও চোখে সর্ষেফুল দেখে। আমি দেখিয়ে ছেড়েছিলাম।

তারপর আমাকেই রিভলভারের বাঁট চালাতে হয়েছিল ভয়ঙ্কর আকৃতির সেই অ্যালোপেসিয়া আতঙ্কের মাথা টার্গেট করে—যাঁর সারা মুখ ঘিরে চামড়া পুড়িয়ে দাগানো হয়েছে—যে গলা টিপে ধরেছিল সুফির।

করোটি চুরমার হয়নি। তবে চোটটা ছিল প্রায় মারাত্মক। অমন প্রহার খেলে মহাবীরও জ্ঞান হারায়।

গ্যারেজ থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিলাম, দেখেছিলাম একটু তফাতে নিন্দনীয় প্রমোদকাননের জানলায় জানলায় চমকে চমকে উঠছে বহুরঙের ফ্ল্যাশ...

উল্লাস... উল্লাস... উল্লাস!

৩০. ক্লু

ভূমিকা আর উপসংহার যত ছোট হয়, ততই ভাল।

গোল টেবিল বৈঠক বসেছিল পুলিশ ডেরায়। চেয়ারপার্সন সেই পুলিশ পুঙ্গবী। সিকিমি কন্যা। প্রশিক্ষণের দৌলতে তনুবর বড় নীরস। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে তাঁর প্রোজ্জ্বল নয়ন তারকায় যে বিজুলি দেখেছিলাম, তা আমার কর্মজীবনে দেখেছি বহুবার বহু সুন্দরীর চোখে। কিন্তু আমি যে ভীষ্ম, আমি অতিশয় কাঠখোট্টা নীরস তরুবর। প্রেম-ট্রেম, বিয়ে-থা, সংসার-টংসার করার ব্যাপারে অতিশয় উদাসীন। আমি খুবই সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আমার তুলনা করা চলে। নাম বলে যাব? ক্ষমা করবেন আমার ধৃষ্টতার

জন্যে। বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট বিয়েই করেননি। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। 'দ্য ডেক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার' বইটা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন লেখক এডোয়ার্ড গিব্বন কত বড় লেখক। অথচ পাত্রীর পিতা তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেননি লেখককে জামাই করবেন না বলে। ফলে, গিব্বন সাহেব অকৃতদার রয়ে গেছিলেন সারা জীবন। আমার জীবনের প্রথম দিকে প্রায় এই ধরনের একটা দাগা ছিল, তা অনেকেই হয়তো জানেন। কিন্তু হারবার্ট স্পেনসার? চিন্তার সাগরে ডুবে থেকেই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, ললনা-ছলনায় একদম ভুললেন না। বৈজ্ঞানিক নিউটন এমনই আত্মভোলা ছিলেন যে ভাবীপাত্রীকে বিয়ের কথা না বলে তার আঙুল দিয়ে তামাক খাওয়ার পাইপ খুঁচিয়ে সাফ করা শুরু করেছিলেন—বিয়ে আর হল না, উনিও সারা জীবনে বিয়ের চৌকাঠ আর মাড়াননি। বিয়ে-টিয়ের মধ্যেই যাবেন না, এহেন ধনুর্ভঙ্গ পণ করে সাহিত্যিক ল্যাম্ব, শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, সঙ্গীত গুরু বিঠোফেন, ধর্মগুরু আলেকজাণ্ডার পোপ, লেখক লুই ক্যারল, জোনাথন সুইফট, কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান, হ্যান্স আণ্ডারসন, ভলতেয়ার, ম্যাকলে, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এবং আরও অনেক জগতবরেণ্য পুরুষ। মালা বদলের কথা আজীবন ভাবেননি।

তাই, পুলিশ পুঙ্গবীর নয়ন বাণ আমাকে বিঁধতে পারেনি। তিনি যে মনের মতো পুরুষের পথ চেয়ে বসেছিলেন, তা জেনেছিলাম পরে। তখন আর আঁখির ভাষা প্রয়োগ করেননি, মুখের ভাষায় এই শর্মাকে কব্জায় আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে নিরুপায়। কবিতা বউদির ওই চোখের শাসন মনে করলেই আমি পাথর হয়ে যাই।

যাগ গে, যাক গে, কথায় কথায় উপসংহার দীর্ঘ করে ফেলছি। কাজের কথায় আসা যাক।

পুলিশ পুঙ্গবীর ম্যাগনেটিক চাহনি এড়িয়ে গেছিলাম স্নেফ সিসের টুকরোর মতো। বলেছিলাম, ম্যাডাম, আপনার সায়েন্টিফিক ইনভেসটিগেশন ডিপার্টমেন্ট তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে প্রমাণ পেয়ে গেছে?

পু—পু বললেন, ইয়েস, স্যার। কম্পিউটার ভেরিফিকেশন হয়েছে। সাদা ভানের নানান জায়গায় যে সব আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বহু ফিঙ্গারপ্রিন্ট নাইজেলের। একদা যে ছিল সাউথ আফ্রিকার মোস্ট ড্রেডেড ক্রিমিন্যাল।

ইণ্টারন্যাশন্যাল পুলিশ তাকে খুঁজছিল?

ইউনাইটেড নেশনের ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়ারক্রাইম অ্যাক্ট অনুসারে।

পৃথিবীজোড়া সন্ত্রাসে যুক্ত বলে?

হ্যাঁ। কিন্তু, মিস্টার রুদ্র, আপনি তা জানলেন কী করে?

ম্যাডাম, আমি যে গোয়েন্দা। এই পৃথিবীর অন্যতম সেরা গোয়েন্দা সংস্থা প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্ণধার প্রেমচাঁদ মালহোত্রা আমার কলেজ ফ্রেণ্ড। যা কিছু জেনেছি, তারই দৌলতে। সে যে সোর্স ইনফর্মেশন নিয়ে কাজ করে। আমার কেরামতি শুধু বুকের পাটা দেখিয়ে এখানে এসে বসা।

কিন্তু, আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, পুলিশ পুঙ্গবী—আপনি তো এসেছিলেন, ডোণ্ট মাইণ্ড ফর মাই ফ্র্যাঙ্কনেস, মিসেস কল্পনা রে-চিটনিসের ফ্রেণ্ড হিসেবে।

এই কথায় আমার পাশের দু'জন আড়ষ্ট হয়ে গেছিল। তাদের একজন কল্পনা, অপরজন রবি।

সোমনাথকে এ ঘরে রাখা হয়নি। সে পাশের ঘরে গেমস ফ্রিক খেলছে। কালিকা রানির চ্যাঁ—চ্যাঁ চিল্লানি এ ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে।

আমি বললাম, ম্যাডাম, তাহলে একটু খুলে বলা দরকার। পুলিশ, উকিল আর ডাক্তারের কাছে কিছু গোপন করলে ফ্যাসাদে পড়তে হয়। আমি এখানে এসেছিলাম প্রিয়বন্ধু রবি রে'র স্পাই হয়ে।

স্পাই হয়ে! চারুনয়নার দুই চোখে দেখেছিলাম চকিত চমক। একই রিঅ্যাকশন দেখা গেল কল্পনার লবঙ্গলতিকা দেহসুষমায়। কাঠ হয়ে গেল নিমেষে।

আমি আয়েস করে এক টিপ নস্যি নিলাম। তারপর বললাম, দেখুন ম্যাডাম, রবি আমার কলেজ ফ্রেণ্ড—যেমন প্রেমচাঁদ। শিক্ষাক্ষেত্রের ফ্রেণ্ডশিপ কখনও যায় না—যায় কর্মজীবনে। এখন যা বলব, নিশ্চয় তা অফ দ্য রেকর্ড থাকবে?

ম্যাডাম বললেন, এ ঘরে ভিডিও ক্যামেরা বা টেপরেকর্ডার নেই। ঘরোয়া বৈঠক তো। স্বচ্ছন্দে বলুন।

আমি বললাম, কলকাতার শিল্পমেলা থেকে হিরের ডিম চুরি গেছিল—

হিরের ডিম!

হিরের কুচি বোঝাই অনিক্স পাথরের ডিম। তেহরান, পেশোয়ার থেকে আসত হিরের কুচি—চোরা পথে—খনি থেকে চোরাই হিরে—সেই হিরে পেশোয়ারের পাথর কারিগর ফোঁপরা ডিমে ভরে পাঠাত এমন এমন জায়গায়, যেখানে যেখানে রয়েছে টেররিজমের ঘাঁটি। টাকার বদলে হিরে। টেররিজম যাতে অব্যাহত থাকে।

ঈষৎ চমক্যালেন পুলিশ পুঙ্গবী—ও ইয়েস, এ রকম একটা ভাসা ভাসা মন্তব্য 'ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক' ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম বটে—

২০০২ সালের মার্চ সংখ্যায়?

তা হবে।... তারপর

ইনফরমেশনটা আমার বন্ধু প্রেমচাঁদের কাছেও ছিল। তার জাল পাতা গোটা পৃথিবী জুড়ে। সে জানত, পেশোয়ারের পাথর ডিম ঘুরে ঘুরে চলে আসবে এইখানে—নাইজেলের কাছে।

কেন?

নাইজেল যে হিরে এক্সপার্ট। হিরের খনির পাহারাদার ছিল। হিরে লোপাট করতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাই তার মুখ দাগিয়ে দেওয়া হয় ছ্যাঁকা দিয়ে।

আই সি.., আই সি...

বদলা নেওয়ার জন্যে এই কারবারে নামে নাইজেল। ধর্মে সে খ্রিস্টান। কিন্তু টেররিজম চালু রাখতে গেলে ক্যাশ কারেন্সি দরকার। তার দরকার টাকার। হিরে আনিয়ে তা ক্যাশ করে নেওয়া হতো। সে ঘাঁটি গাড়ে এখানকার রিসর্টে...

এক মিনিট। হিমাচল অঞ্চলে যে রমরমা রিসর্ট কারবার চলছে, সেখানেও কি আছে হিরের চোরা কারবার?

সরি ম্যাডাম, এ সব প্রেমচাঁদের সিক্রেট। সেখানে পর্নো ফিল্ম তোলা হয় ঠিকই, বাকিটা উহ্য।

তাহলে বলুন, আপনি ম্যাডাম রে-চিটনিসের ওপর স্পাইগিরি করতে এলেন কেন?

কলকাতার শিল্পমেলায় হিরে চোর ছিল, সেখানকার একটা সংস্থা। তারা চায়নি সেই হিরে যাক টেররিস্টদের কাছে। সেই সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছিল রবি রে'র মাধ্যমে। সেই হিরে এখন রবির জিম্মায়। কাস্টডিতে বলতে পারেন, চোরের ওপর বাটপারি করেছিল রবি। পৃথিবীর মানুষের স্বার্থে। তাই মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে তার ছেলেকে কিডন্যাপ করে—ডিম সেই মুক্তিপণ—যা সে হাওয়া করেছিল কলকাতার শিল্পমেলা থেকে।

সঙ্কুচিত চোখে, যে চোখ এমনিতেই সাইজে ছোট—তাদের আরও ছোট করে, আমার দিকে প্রায় নরুন চোখে চেয়ে রইলেন পুলিশ পুঙ্গবী।

আমি গ্রাহ্য না করে বলে গেলাম, কল্পনা হিরের জগতের মেয়ে। হিরের ওপর তার দুর্নিবার আকর্ষণ। সব মেয়েদেরই থাকে... না, না ম্যাডাম, আপনার যে আছে, তা বলছি না... তবে এই কল্পনার আছে... বলুক, ওর নেই? তাই চুরি করেছিল রবির প্রাণাধিক ছ'টা হিরে ভর্তি পাথরের ডিম।

কল্পনা যেন পাথর।

আমি চালিয়ে গেলাম, আমার বন্ধু এই রবি রে তামাম দুনিয়ার সবক'টা হিরের খনির সব খবর রাখে, হিরের বাজারগুলোর নাড়িনক্ষত্র নখদর্পণে রাখে, ঘরের বউকেও বেছে নিয়েছে হিরে মাজাঘষার জায়গা থেকে, দু'জনেই দু'টুকরো হিরে, হিরে এদের ভালবাসে, এরাও হিরেদের ভালবাসে—আর বিরোধের সূত্রপাত সেই হিরে প্রেম থেকে।

আমি মঞ্চ অভিনেতার মতো ঈষৎ বিরতি দিলাম বাক্যস্রোতে। পরের কথাটায় শক্তির স্রোত বইয়ে দেব বলে। ওষুধ ধরে গেল। ঈষৎ ঝুঁকে বসলেন পু—পু। অকস্মাৎ শিবনেত্র হয়ে গেল দেবা আর দেবী। মানে, রবি আর কল্পনা।

আমি সারেগামা স্বরে চলে গেলাম, ম্যাডাম, যে কোনও হিরের মধ্যে কসমিক এনার্জি ঠুসে দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে, এমন আশ্চর্য এক সেট পাথরের ডিম বিয়ের যৌতুক পেয়েছিল রবি। প্রতিটা পাথরের ডিমের ফাঁপা গহ্বরে ছিল—এখনও আছে—এক-এক রঙের কুচি হিরে। কল্পনা, হিরের বাজারের মেয়ে কল্পনা চেয়েছিল, সেই সেট থাকুক তার কাছে। এ রকম বাসনা মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু, জহুরি দগুপথ, যিনি এই হিরের ডিমের সেট আর মন্ত্র দান করেছিলেন রবিকে, পই পই করে নিষেধ করে গেছিলেন রবিকে—এমন দুর্বলতা যেন কখনও দেখানো না হয়।

আবার বিরতি দিলাম বাক্যস্রোতে। আড়চোখে দেখে নিলাম কল্পনার মুখাবয়ব। সে মুখ রাঙা হয়ে গেছে। ফর্সা হয়ে গেছে। ফর্সা মেয়ে তো...

বললাম, কল্পনা তাই স্বামীর অগোচরে আশ্চর্য হিরেদের খানকয়েক আত্মসাৎ করেছিল। পরিণাম, ডিভোর্স। কল্পনার হেথায় আগমন। আমাকে পিছনে লেলিয়ে দেওয়া। সেটা রবি একা করেনি, প্রেমচাঁদও আমাকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছিল—অফিসিয়াল চুক্তি—তার কাছে নেটওয়ার্ক খবর এনে দিয়েছিল, কলকাতার শিল্পমেলা থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়া হিরের ডিমও যেতে পরে কল্পনার খপ্পরে—একই কারণে হিরে প্রেম, হিরে সঞ্চয়, হিরে দেখে ধ্যান।

স্ট্রেঞ্জ, ঈষৎ নাসিকাধ্বনি সহ বললেন পু—পু।

এক্সট্রিমলি, আমি বললাম অহীন চৌধুরি ঢঙে—কল্পনা অবশ্য হিরের চোরাচালানি আর টেররিস্ট গ্যাংয়ের পার্টনার নয়। কিন্তু পেশোয়ার থেকে অনিন্দ্য পাথরের ডিম কলকাতার শিল্পমেলার মধ্যে দিয়ে পাঠানো হচ্ছিল যাদের কাছে, ক্ষিপ্ত হয়েছিল তারা।

তাদেরই একজন এই নাইজেল? পু—পু বললেন মিহি গলায়।

ইয়েস, ম্যাডাম, ইয়েস। তাই তারা কল্পনাকে আর রবি রে-কে টাইট মেরে হিরে উদ্ধারের জন্যে সোমনাথকে কিডন্যাপ করে—টেলিফোনে মুক্তিপণ চায়... কী?

ডিম।

ওদের এই অ্যাকশন প্ল্যান অজানা ছিল আমার কাছে। কিডন্যাপিংয়ের একটা প্লাবন চলেছে ভারত জুড়ে—সেই প্লাবন যে সিকিমের এই গণ্ড পাহাড়ে আছড়ে পড়বে, এটা আঁচ করলে আমি আরও একটু সতর্ক হতাম। সোমনাথকে একলা ছাড়তাম না। আমার নজর ছিল কল্পনার দিকে। সে যেন টার্গেট না হয়—হিরে তো তার আগের স্বামীর কাছে—তার ছেলের কাছে তো নেই। ভুল করেছিলাম এইখানেই।

মানুষমাত্রই ভুল করে, মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিলেন পু-পু—শয়তানে করে না।

সত্যি কথা বলতে কি, পুলিশ পুঙ্গবীর এ হেন মৃদু বচন বিপুল স্বস্তিবোধ এনে দিল আমার মধ্যে। আমি বলে গেলাম—কিছু হিরে যার কাছে, চোখে চোখে রাখি তাকে, এই ছিল আমার গেমপ্ল্যান। কল্পনা ভেবেছিল উল্টো—বন্ধুর ডিভোর্সি বউয়ের দিকে নিশ্চয় নেকনজর দিয়ে চলেছি।

ঠিক এইখানে নিতান্তই বেরসিকের মতো গলা খাঁকারি দিয়ে বসল বন্ধুবর রবি রে। বললে, আমি কিন্তু তোকে ঠিক সেই রোলটাই প্লে করতে বলেছিলাম।

আমি বললাম, মাই ডিয়ার রবি রে, আগুনে হাত দিয়ে পুড়ে মরব নাকি?

তবে হ্যাঁ, সেই আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংয়ে তোর অ্যাকটিংটা হয়েছিল অনবদ্য—সোমনাথ কিডন্যাপড হয়ে গেছে শুনে তুই মিসাইলের মতো এমন চার্জ করে বসলি আমাকে, যেন সত্যিই কল্পনাকে ক্যাচ করার জন্যে পথের কাঁটা সোমনাথকে ভ্যানিশ করে দিয়েছি আমিই।

ঠোঁটের কোণে কোণে নিগূঢ় হাসির মাকড়সা জাল ছড়িয়ে রবি বললে, হে বন্ধু, তুমি একাই অ্যাকটিং শেখোনি। স্কটিশে তুই ছিলিস হ্যালির ধূমকেতু, আমি ছিলাম—

পু-পু বললেন, কাট শর্ট! কাট শর্ট!

আমি বললাম, চেয়ার পার্সনের অর্ডার হয়েছে শর্টকাট করার। তবে হ্যাঁ, তোর মোস্ট ন্যাচারাল অ্যাকটিং আমাকে খুব বেদনা দিয়েছিল।

আহারে! বললে রবি।

পু-পু ফের মন্তব্য নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলেন, আমি দক্ষিণ হস্ত শূন্যে তুলে বললাম, তিষ্ঠ ম্যাডাম। আমি চাইছি, কেসটাকে ট্র্যাজেডির দিকে না নিয়ে গিয়ে ইউনিয়নের দিকে নিয়ে যেতে।

হোয়াট ডু ইউ মিন?

কথায় বলে, অল সেপারেশনস এণ্ড ইন ইউনিয়ন। অ্যাণ্ড নাউ আই ওয়াণ্ট দেম টু কাম টু এগ্রিমেণ্ট।

টু বি রিইউনাইটেড?

টু অ্যাডজাস্ট ডিফারেন্সেস, হারমোনাইজ, অ্যাণ্ড লিভ টুগেদার—না, না, সেই লিভ টুগেদার নয়—টু লিভ অ্যাজ স্বামী অ্যাণ্ড স্ত্রী।

এটা কি একটা মিলন মন্দির?

ধরুন তাই। সব নাটকই যদি মিলনান্ত হয়, তাহলে জীবনটা কত মধুর হয় বলুন তো? আমরা একটা দৃষ্টান্ত রাখতে চাই, এই ডিভোর্স মহামারীর যুগে, ভুল করে যদি কিছু ভেঙে যায়, ভুল শুধরে নিয়ে তা জুড়ে নেওয়াই ভাল। ভালবাসার মেল্টিং পটে ভাঙা কাচও জুড়ে যায়। বিশেষ করে ওরা যখন এক চৈত্র মাসে একে অপরের চোখে নিজের নিজেদের সর্বনাশ দেখেছিল। প্রকৃত প্রেম তো তাকেই বলে। জ্বালায়, আবার জোড়া লাগায়।

পু-পু পুলিশি চোখে আমাকে জরিপ করতে করতে বললেন, আপনি কি অন্তর্যামী? থট রিডার? এই দু'জন—রবি আর কল্পনাকে দেখিয়ে—এই দু'জন যদি এখনও প্রেমাসক্ত থাকেন, তাহলে এই লঙ্কাকাণ্ডটা বাঁধালেন কেন?

আমি টুকুস করে বলে দিলাম—অপরাধ নেবেন না, মেয়েরা একটু দ্রৌপদী-দ্রৌপদী টাইপের হয়—বিশেষ করে এই হাই-টেক যুগে সিলিকন বিউটি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা যখন চরমে উঠে বেশরমে পৌঁছে একটা হিড়িকে পর্যবসিত হয়েছে... ট্রয়ফয় ধ্বংস হয়ে গেল... লঙ্কাটঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গেল... কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা.. এই দ্রৌপদীর জন্যেই... হয়েছিল বলেই তো আমরা গীতা পেয়েছিলাম। উল্টে নিন গীতা-কে... ত্যাগী। একটু ত্যাগ করলেই সব পাওয়া

যায়। বিশেষ করে ছেলের জন্যে সব বাবা, সব মা ত্যাগ করে এসেছেন যুগ যুগ ধরে। নইলে যে ছেলেরা সোশ্যাল প্রব্লেম হয়ে দাঁড়াবে। আমি সোমনাথকে ক্লোজলি ওয়াচ করেছি, ওর মনের নিঃসঙ্গতা আমাকে কষ্ট দিয়েছে। মন্তেসরি কি বলেননি, প্রথম দু'বছরই শিশুর মস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হয়? ছ'বছরে বলতে গেলে জগত দর্শন করা হয়ে যায় মা আর বাবার মধ্যে দিয়ে। আর সোমনাথ? ঠিক ওই ছ'বছর বয়স থেকেই বাবাকে চোখের আড়ালে এনে ফেলল মায়ের চাপে। রবি, তোর বিবেক, তোর জাজমেন্ট, তোর পাওয়ার অফ অবজারভেশন, তোর ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতাতে আমি ঈর্ষা করি। সোমনাথের মুখ চেয়ে তুই কল্পনাকে কাছে টেনে নে। দেবর-বউদি সম্পর্ক থাকুক আমার সঙ্গে কল্পনার। তোরা এক হয়ে গিয়ে হিরে পাণ্ডাদের মেরে ঠাণ্ডা কর।

তাই হয়েছিল। পেশোয়ার থেকে আমদানি হিরে ভর্তি পাথরের ডিম গায়েব করেছিল বটে রবি এজেন্সি মারফত কলকাতার মরুদ্যানে, আমার এজেন্সি মারফতই তুলে দিয়েছিল জনহিতৈষী একটা সংস্থায়।

উপসংহারটা নাতিদীর্ঘ হয়ে গেল। সরি। আমি লেখক নই।

কী বলছেন? কল্পনার সঙ্গে আমার এখনকার সম্পর্কটা কি রকম?

মশায় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা বড় বেশি জানতে চান। বড় বেশি কৌতূহলী। এ সব যে আমাদের প্রাইভেট ব্যাপার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে দেখলেই এখনও কল্পনা তার সবুজ চোখ নাচায়, কথায় জলতরঙ্গ বাজায়, দেহ তরঙ্গে মণিপুরী নৃত্য দেখায়, মুক্তো দাঁতে বিদ্যুৎ ঝলসায়। রবি রে, আমার গ্রেট ফ্রেণ্ড রবি রে, তাই দেখে মুচকি মুচকি হাসে আর বলে, ও তোর বিয়ে দেবেই।

কিন্তু সে গুড়ে বালি!

আবার একটু উপসংহার।

বেশ বুঝছি, পাঠক-পাঠিকারা উসখুস করছেন একটা বিষয়ের রহস্য কথা শুনতে। দণ্ডপথ হঠাৎ মারা গেলেন কেন?

মশায় পাঠক-পাঠিকা, মনে করে দেখুন, দণ্ডপথের ব্রহ্মতালুর কাছে মাছি উড়তে দেখা গেছিল। কেন জানেন? সেখানে রক্ত জমেছিল। সেই রক্ত এল কোত্থেকে? মাথায় পেরেক পোঁতা হয়েছিল। পেরেক কে পুঁতেছিল?

আমার কথাটি ফুরোল! ...কি বলছেন? এখনও ফুরোয়নি? কে ঠুকে ঠুকে পুঁতে দিয়েছিল পেরেক? বড় পয়েণ্টে প্রশ্ন করেন তো!

হ্যাঁ, কল্পনাই ঠুকে ঠুকে পুঁতে দিয়ে জান কাবার করে দিয়েছিল মহাত্মা দণ্ডপথের। যাতে অন্য মেয়েগুলো রেহাই পায়। আমি কিন্তু তাই পই পই করে বলে দিয়েছি রবিকে—খবরদার, কল্পনার সঙ্গে এক শয্যায় আর নয়। এক ঘরেও নয়। তোর ঔরসজাত পুত্রকে মানুষ করার জন্যেই তুই শুধু সঙ্গ দিবি তার গর্ভধারিণীকে—তার বেশি একদম নয়। নো বডি টাচ, নাথিং কিছু। তিব্বতের মন্ত্র দণ্ডপথের মধ্যে দিয়ে তোর কাছে এসে যেন লুপ্ত না হয়ে যায়—ছেলেটাকে দিবি যথা সময়ে। সে বড় হোক, তুই এক বাড়িতে থাক—কিন্তু এক ঘরে

নিশিযাপন আর নয়—ওই সবুজনয়না ত্রাটকযোগিনী খুনি ব্র্যাণ্ডেড রমণীর সঙ্গে।

কি বলছেন? পাথরের ডিম ছ'খানা কল্পনা ফিরিয়ে দিয়েছিল রবিকে? দিয়েছে... দিয়েছে... দিয়েছে... গুপ্ত সমিতিও ত্যাগ করেছে... ছেলের জন্যে।

আরও প্রশ্ন আছে? নাইজেলের রূপান্তর আমি জানলাম কী করে?

প্রেমচাঁদের দৌলতে। প্রেমচাঁদই আমাকে জানিয়ে রেখেছিল, সোর্স ইনফরমেশন দিয়ে জেনেছিল, সুবুদ্ধি মুসলিমরা সংঘবদ্ধ হয়ে উগ্রতা আর সন্ত্রাস রোধের চেষ্টা চালাচ্ছে। নির্লোম সুফি এই সুবুদ্ধিদের একজন। নির্লোম কুবুদ্ধি নাইজেলকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। টেররিস্টদের হাত কাটা যাবে নাইজেলকে জেলে ঢোকাতে পারলে। সুফি তাই এসেছিল—প্রেমচাঁদের প্ল্যানে।

আপনাদের কৌতূহল এতক্ষণে নিশ্চয় মিটেছে? এবার তাহলে আমার ছুটি।

নমস্কার।

চিনেমাটির ফুলদানি

সিঁড়ির ওপর দিয়ে প্রাণহীন কলেবরটা গড়িয়ে নামিয়েছিল সে।

সে একটি মেয়ে। স্বর্গের অপ্সরী বললেই চলে। তার পরনে কেমব্রিক-রাত্রিবাস। শুভ্র শরীরের প্রতিটি রেখা বাঙ্ময় হয়ে উঠতে চাইছে বস্ত্র ভেদ করে।

মড়া আটকে গেল সোপানশ্রেণীর মধ্যপথে।

ঝাঁঝিয়ে উঠল ললনা—বুড়োর আক্কেলটা দেখলে? মরে লোহা হয়ে গেছে। একটু ঠেলা দাও না গো, সিঁড়ির একদম নিচে নামিয়ে দাও।

মড়া গড়িয়ে গেল শেষ ধাপের ওপর দিয়ে মেঝের ওপর। মেহনত কম হয়নি। কেমব্রিকের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে পরমাসুন্দরী মেয়েটা একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিগত প্রাণ বৃদ্ধের মুখপানে। তারপর নিরীক্ষণ করে নিল গোটা শরীরটার আছড়ে পড়ার ভঙ্গিমা।

কিন্তু মন যে এখনও খচখচ করছে। বুড়োর মাথা ওইভাবে না রেখে—

বললে স্যাঙাৎকে—শুনছ? সিঁড়ির রেলিং-এর থামটা যেখানে রয়েছে, বুড়োর মাথা রাখো ওখানে। লোকে ভাববে, পা ফসকে সিঁড়ি থেকে ঠিকরে নেমে আসার সময়ে খুলি ভেঙেছে থামের মাথায় ঠোক্কর খেয়ে। থামের মাথা কি রকম ছুঁচোলো দেখেছ? বাঃ! চমৎকার! সাদা পাথরের চুড়োয় লাল রক্তের দাগ। অপূর্ব! দেখলেই বোঝা যাবে, মরণ এসেছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এবার যাও বুড়োর লাইব্রেরিতে। মোমবাতিটা এনে ফেলে রাখো সিঁড়ির মাথার ধাপে। দেখেশুনে যাবে, ভীষণ অন্ধকার ওপরে।

বলে, উদ্বেগভরা ডাগর চোখ দুটো মেলে চেয়ে রইল সিঁড়ির ওপর দিকে। খাড়াই মার্বেল সোপান শ্রেণীর শীর্ষদেশে বিরাজ করছে এলে তাল অন্ধকার। দোসর পুরুষপ্রবর একটার পর একটা ধাপ বেয়ে উঠে গিয়ে বিলীন হলো সেই আঁধাররাশির মধ্যে। চাতালে। এই সিঁড়ি শেষ হয়েছে একটা মস্ত হলঘরে। কড়িকাঠ অনেক উঁচুতে। প্রায়ান্ধকার বিশাল কক্ষের একপ্রান্তে একটা গোলাকার দরজা। সেখানে দেওয়ালের গা ঘেঁষে রাখা টেবিলে জ্বলছে শামাদানের মোমবাতি—পটপট শব্দ করছে যথেষ্ট, কিন্তু আলো বিতরণ করছে অতি সামান্য। সেই কৃপণ আলোক প্রভা আবছায়া সৃষ্টি করে রয়েছে ঘরময়।

যেন কত যুগ পরে মোমবাতির আলোক নৃত্য দেখা গেল সিঁড়ির ডগায়। এই আলো আসছে ওপরের চাতালের সিঁড়ির রেলিং-এর জালতি ভেদ করে। জ্বলন্ত মোমবাতি ফেলে দেওয়া হলো সিঁড়ির মাথার প্রথম ধাপে। দপ দপ করে উঠেই নিভে গেল শিখা। এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ধ্বনিত হলো সুন্দরীর অধীর কণ্ঠস্বর—নেমে এস না—এত দেরি কিসের?... দাঁড়াও! দাঁড়াও! সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়াও!.. বুড়োর একপাটি চটি ছুঁড়ে

দিচ্ছি... লুফে নাও! বাঃ! বেড়াল নাকি? অন্ধকারেও দেখছো! সিঁড়ির ধাপে ফেলে রাখো। ফাইন! একেই বলে ফিনিশিং টাচ!

জায়গাটার ঠিকানা ধোঁয়াশার মধ্যে রাখা যাক। নামটা ধরে নেওয়া যাক আতঙ্ক-নগরী। কেননা, এই মুহূর্তে এই পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ বলে যাকে দেখানো হচ্ছে, সেই গুঁফো বীরাপ্পানের জঙ্গলরাজ্য এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সুলতান হায়দর আলির ছেলে টিপু সুলতান এক সময়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন গোটা মাইশোর স্টেটে। তিনি ছিলেন প্রকৃতই ব্যাঘ্র-পুঙ্গব। অনমনীয় প্রকৃতি। দুঃসাহসী। স্বাধীনচেতা: নিজাম আর অন্য রাজারা ইংরেজের বশ হয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, রাজ্য রেখেছিলেন। টিপু তা করেননি। লড়েছেন। মরেছেন। গোটা মহীশূর প্রদেশ জুড়ে ঘাঁটি বানিয়েছেন দুর্গম অঞ্চলে। কেল্লা বানিয়েছেন পাহাড়ের মাথায়। শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে ফ্রান্স, আফগানিস্তান, তুরস্ক, আরব, মরিশাস—আরও অনেক দেশের শাসন কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

ব্যাঙ্গালোর শহরটা সমুদ্র থেকে আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে। আবার, ম্যাঙ্গালোর শহরটা আরব সাগরের ধারে। ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোরে যেতে গেলে সাত হাজার ফুট উঁচু মার্কারা অঞ্চলের পাহাড় আর বন ভেদ করে যেতে হয়। অঞ্চলটা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি সুন্দর। সেখানে পথের ওপর দিয়ে মেঘ ভেসে চলে যায়। এখানকার এক পর্বত থেকে ডাক্তার বিধান রায় সূর্যাস্ত দেখেছিলেন। সূর্যোদয়ের জন্যে দার্জিলিং, সূর্যাস্তের জন্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা।

টিপু সুলতান ছিলেন ধর্মপ্রাণ সুন্নি মুসলমান। ছিলেন স্বৈরাচারী। অনেক হিন্দুকে তিনি স্বধর্মে এনেছিলেন। সেই সময়ে কিছু অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তাঁর কুনজর এড়িয়ে চলে আসেন ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর এই অঞ্চলে। এঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন বেজায় ধনী। লোকে বলে, তখন ম্যাঙ্গালোর থেকে গুজরাতে বাণিজ্য চলতো জাহাজে। সোনা সস্তায় মিলত। বাংলার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ম্যাঙ্গালোরের ব্যবসা সূত্রে। আজও সেখানকার কোঙ্কানি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিল দেখা যায় ধ্বনি মাধুর্যে এবং কিছু শব্দের ঈষৎ সাদৃশ্যে। হয়তো তা কাকতালীয়। কিন্তু শুনতে ভালো লাগে। লেগেছিল ইন্দ্রনাথেরও। সে গোয়েন্দা হয়েছে রহস্যপ্রিয়তার জন্যে। কিন্তু সৌন্দর্য তাঁর মূল আরাধনার সামগ্রী। সুন্দর সে নিজেও। পোশাকে-আশাকে খাঁটি বাঙালি। কিন্তু বাঙলার ছেলে বিজয় সিংহের মতো অ্যাডভেঞ্চারের নেশা তার রক্তে। তাই ছুটে চলে এসেছিল এই সৌন্দর্য-নগরীতে কলকাতার দুর্গন্ধ থেকে কিছুদিন দূরে থাকবার জন্যে।

কিন্তু বিধি বাম। সে আসবার পরেই সৌন্দর্য-নগরী পরিণত হলো আতঙ্ক-নগরীতে।

প্রথম রহস্যের সূত্রপাত ঘটালো তিন বর্ধিষ্ণু পরিবারের একটি পরিবারে। ডিক্সিট, পিশারোট্টি আর নাগরাজন—এই তিন পরিবার দু'শ বছর আগে আস্তানা গেড়েছিল এই অঞ্চলে। ঝিরঝিরে একটা নদীর এপারে ছিল একটা বড়

বাড়ি—ওপরে একটা ছোট বাড়ি। বেশ দূরে আর একটা রমণীয় জায়গায় ছিল আর একটা সুরম্য নিকেতন। এই দু'শ বছরে পুরো অঞ্চলটা জুড়ে ছোট ছোট ঘরবাড়ি আর স্লেট পাথরের ছাউনি দেওয়া অনেক কুঁড়ে তৈরি হয়ে গেছে। নানা ধরনের লোকে আস্তানা নিয়েছে। যেহেতু জায়গাটা বাণিজ্য রেখায় পড়ছে, তাই সেখানকার মানুষজন সবাই সাধুপুরুষ নয় এবং বিলক্ষণ বিচিত্র প্রকৃতির।

বিশেষ করে সেখানকার সমাজ। এই উপমহাদেশে এমন সমাজ চট করে চোখে পড়বে না। ম্যাঙ্গালোরের মানুষরা বড় ফর্সা, বড় সুন্দর। গোয়া থেকে বাণিজ্য করতে এসে যারা থেকে গেছে, তারাও সুন্দর। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টানরা এখানে বেশ মিলেমিশে আছে। এখানকার সমাজে এক পুরুষের তিন পত্নী, অথবা বহু উপপত্নী নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় নয় এখানকার যৌবনপল্লী। নিন্দনীয় নয় নগ্নিকা-নৃত্য। আহ্বান পেলেই তারা আসে, নাচঘর মাতিয়ে দিয়ে তারা চলে যায়। তারও বেশি দেয় থাকলে, আপত্তি করে না। কারণ, এই উপমহাদেশে অর্জুন নামক মহাবীর যত্রতত্র ভার্যা সংগ্রহ করেছে, দ্রৌপদী নাম্নী কুলবধূ পঞ্চস্বামীর নজির রেখে গেছে। সুতরাং প্রকৃতির আলয় এই অঞ্চলেও এ-সবই শাস্ত্রসম্মত। বিশেষ করে যেখানে বিদ্যুৎ, টিভি, টেলিফোন, সিনেমা কিছু নেই। প্রমোদ-উপকরণ একটিই--যাতে সৃষ্টি ধারা অব্যাহত থাকে।

শুনে কৌতূহলী হয়েছিল বলেই ইন্দ্রনাথ এসেছিল।

তারপরেই প্রহেলিকা সৃষ্টি করে গতায়ু হলেন তিন বর্ধিষ্ণু পরিবারের একজন। এই কাহিনির প্রারম্ভেই তা বর্ণিত হয়েছে।

চঞ্চল চোঙদার ইন্দ্রনাথের কলেজ বন্ধু। খেতে খুব ভালবাসত, খাওয়াতেও ভালবাসত। ইন্দ্র বলত—তুই জাতে শূদ্র। তোর হাতে খেলে আমার জাত যাবে। চোঙদার বড় বড় দাঁত বের করে হেসে বলত—হাতে তো খাচ্ছিস না, পাতে খাচ্ছিস।

বিলক্ষণ রসকস ছিল চঞ্চলের মধ্যে। কখনও কথা বলে, কখনও না বলে স্রেফ মুখভঙ্গি করে হাসিয়ে পেটের খিল খুলে দিত। অবশ্য ঈশ্বর ওর শরীরেও হাসির উপকরণ দিতে কার্পণ্য করেননি। জন্ম থেকেই যেন আলকাতরায় ডোবানো চেহারা। বড় হওয়ার পর দেখা গেল, চিবুক প্রায় নেই বললেই চলে— এত চর্বি সেখানে। গোটা শরীরটাকে চর্বির ডিপো বানিয়ে ফেলেছে ভালমন্দ খেয়ে। মোটা নাক, স্থূল ঠোঁট, গোল-গোল মীন-চক্ষু—, কিন্তু mean নয়— ক্ষুদ্র মনের নয়—হাসি আর উদারতায় ভরপুর। এমন একটা মানুষকে ভাল না বেসে পারা যায় না এবং এরাই আমৃত্যু বন্ধু হয়ে থাকে। হাসিয়ে ভাসিয়ে রাখে জীবন-সায়রে।

ইন্দ্রনাথকে ও সাদা প্রজাপতি বলে ডাকত। দেখতে ফুটফুটে ছিল বলে। কলেজ থেকে বেরোনোর পর শোনা গেছিল, চালানি ব্যবসা করে চোঙদার টু পাইস কামাচ্ছে। প্রাণের বন্ধু ইন্দ্রনাথের খবরও রাখত। ছাপার অক্ষরে যার নাম বেরয়,

তাকে তো মনে থাকবেই। ক্রাইম গল্পের কীট ছিল বলে চোঙদার আরও বেশি করে মনে রেখেছিল ইন্দ্রনাথকে। চিঠিচাপাটিও চলতো। তারপর একদিন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল, ফেলল সেই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে। পাণ্ডবরা বড় হুঁশিয়ার। যত্রতত্র যেতেন না। গেলে, মহাভারতের কোথাও না কোথাও জায়গাটার কথা লেখা থাকত।

চোঙদার সেখানেও চালানির ব্যবসা জমিয়ে বসেছিল। দক্ষিণ ভারতে মুসলমান আর কতিপয় খ্রিস্টান ছাড়া ছাগল, ভেড়া কেউ খায় না। সুতরাং পরমানন্দে বংশবৃদ্ধি করেছিল চতুষ্পদ এই জীব দু'টি। চালানির ব্যবসা যারা করে, তারা উইপোকার জাত, অনির্বচনীয় কৌশলে পৌঁছে যায় মাল যেখানে, ঠিক সেইখানে। গোটা শরীরে হাসির বারুদ বয়ে নিয়ে টিস টিস করে সেখানে পৌঁছেই ছাগল ভেড়া চালান দিয়ে নির্ঘাৎ লাল হয়ে যেত চোঙদার যদি না গাত্রবর্ণ জন্মইস্তক মসীবর্ণ হতো।

রাত বেড়েছে, চোঙদারের দোতলা বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ইন্দ্রনাথ। তারা দেখা যাচ্ছে না। জলভরা মেঘ অনেক নিচে নেমে এসে ভয় দেখাচ্ছে। কালো স্লেটের কুটির আর একতলা বাড়িগুলো ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে চারিদিকে। অনেক দূরে দূরে বড় বড় গাছ আর পাহাড় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

জায়গাটার সব ভালো, খারাপ শুধু একটা ব্যাপারে। এখানকার মশারা বড় বদমাইশ। ম্যাঙ্গালোর উপকূল চিরকাল ফাইলেরিয়ার জন্যে কুখ্যাত। পায়ে গোদ অথবা অণ্ডকোষ বৃদ্ধি ওখানে ঘরে ঘরে। তার প্রতিষেধক ট্যাবলেট সঙ্গে নিয়েই এসেছে ইন্দ্রনাথ। আসবার পর মুলো দাঁতের প্রদর্শনী দেখিয়ে চোঙদার বলেছিল—তোদের কলকাতার মশাদের মতো এখানকার মশাদেরও বিবর্তন ঘটেছে।

বোধহয় নতুন হাসির গল্প শুরু করবে এ-যুগের গোপাল ভাঁড়, এই ভেবে আগে থেকেই একচোট হেসে নিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেছিল—শ্লীপদ আর কোষবৃদ্ধি ছাড়াও আরও কিছু ঘটাচ্ছে নাকি?

হাইজাম্প মেরে পয়েন্টে পৌঁছে গেলি। ওখানকার ম্যালেরিয়া ম্যালিগন্যাণ্ট হয়ে যাচ্ছে, এখানকার ফাইলেরিয়াও ম্যালিগন্যাণ্ট হয়ে যাচ্ছে।

চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল ইন্দ্রনাথের— সর্বনাশ! মারবার জন্যে টেনে আনলি?

অমনি বদনজোড়া মাভৈঃ প্রতীক সুস্পষ্ট করে তুলে চোঙদার বলেছিল—তুই আর আমি যমের অরুচি। কিছু ভাবিসনি। তবে, লোক মরছে পটাপট। ম্যালিগন্যাণ্ট মহামারী ওই বর্ষাটা নামলেই সব ফর্সা হয়ে যাবে। মশক বংশ ধ্বংস হবে।

মোটা মোমবাতির শিখার দিকে চোখ ফিরিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—মশক-মারক রসায়ন মিশোনো আছে নাকি মোমবাতির মোমে? অদ্ভুত গন্ধ বেরচ্ছে?

আছে।

এটা আবার কি ভাষা?

মালয়ালম। মানে, হ্যাঁ।

জুতোর শব্দ তুলে বারান্দায় এলেন এক বৃহৎ পুরুষ। আর ইঞ্চি ছয়েক হাইট বাড়ালেই তাঁকে অতিকায় বলা যেত। এখন তিনি পাক্কা ছ'ফুট। প্রস্থেও বিপুল। পরনে উপ-নগরপাল পরিচ্ছদ। ফর্সা। সুপুরুষ। মুখভাব পুলিশ অফিসারের মতো উৎকট নয়। এঁর নাম শেখর। চোঙদারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় পর্ব আগেই সাঙ্গ হয়েছে। দিবা অবসানে এসেছেন আড্ডা মারতে।

একটা চেয়ার দখল করে তিনি বললেন—কলকাতায় যত ডাকাত, এখানে এখন তার দশগুণ। সবই ভিখিরি ক্লাশের। সর্বহারাদের লুঠেরা বাহিনী। লোক যত মরছে, এদের দাপট তত বাড়ছে। হাহাকার যেখানে, এরা সেখানে। এ শহর এখন আতঙ্ক শহর।

শেখরের বাচনভঙ্গি বড় ভালো। গলার মধ্যে যেন মেঘ ডাকে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়।

একটু চুপ করে থেকে বললে ইন্দ্রনাথ-- তাই বটে। যতদূর চোখ যায়, দেখছি কালো ছায়া।

মৃত্যুর কালো ছায়া, গলায় মেঘের বাজনা বাজিয়ে গেলেন শেখর—কোথাও কোন শব্দ নেই। গা শিরশির করছে না? মড়ক যখন শুরু হয়েছিল, তখন রাস্তায় লোকজন কমে গেছিল। এখন একদম নেই। চামুণ্ডা মন্দিরে ঘণ্টা বেজেই চলেছে ঘড়ি ধরে দিনে বাজছে, রাতে বাজছে। মড়ক বিদেয় নিচ্ছে না। ফেরিওয়ালা পর্যন্ত রাস্তায় বেরচ্ছে না।

দূরে পাহাড়ের কোলে চামুণ্ডা মন্দিরের উঁচু চূড়োর দিকে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন শেখর। মানুষ যখন মানুষ মারে, তখন তার একটা ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু মশা যখন মানুষ মারে, তখন তিনি অসহায়।

বিষাদ বস্তুটাকে একদম সইতে পারে না চোঙদার। মুখ চুলবুল করবেই। কাজের লোকের অভাবে ছাগল-ভেড়া জোটাতে পারছে না বলে কি মনের ফূর্তি নষ্ট করবে? দিলখুশ ভঙ্গিমায় তাই বললে--চালের জোগানটা ভালই রেখেছিলেন মিস্টার ভিক্সিট। তিনি পটকে যেতেই হাহাকারটা বেড়েছে। মরণ! পা পিছলে আলুর দম হয় জানি, ইনি মাথা ফাটিয়ে বসলেন।

ইন্দ্রনাথ হেসে ফেলল—তুই কি নবদ্বীপ হালদারের জায়গায় আসতে চাস? গলাটাকে অমন করলি কেন?

মুখভঙ্গি করে চুপ করে রইলো রসিক চোঙদার।

মেঘ-ডম্বরু স্বরে শেখর বললেন—এই বুড়ো বয়সেও চালিয়ে তো যাচ্ছিলেন, ব্ল্যাক মার্কেটে চাল কিনে আড়ৎ চালু রেখেছিলেন। সমাজ হিতৈষী পুরুষ। মরলেন ঠিক এই সময়ে, তাও নিজের বাড়ির সিঁড়িতে গড়িয়ে।

ব্যাপারটা কানে এসেছিল ইন্দ্রনাথের। এখন বললে—সেরিব্রাল অ্যাটাক নিশ্চয়। হবার পরেই গড়িয়ে গেছেন সিঁড়ি দিয়ে।

অথবা মাথা ঘুরছিল বন বন করে, চোঙদারের মন্তব্য—বুড়ো হলে কি হবে, চোখে ছিল শকুনের ধার—আমার নিজের চোখে দেখা। ধাপ ফসকে আছড়ে পড়ার পাত্রই নন।

ডাক্তারও তাই বলেছেন, বললেন শেখর।

পুলিশের ডাক্তার? ইন্দ্রনাথ উৎসুক।

না, না। ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। ডক্টর ল্যাজারাস।

খ্রিস্টান?

গোয়ানিজ খ্রিস্টান। বেশ কিছু পর্তুগিজ এখানে আছে। ডক্টর ল্যাজারাস অন্য মানুষ। বেশ পশার আছে।

পা পিছলে পড়ার সময়ে হাজির ছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?

এখনও হয়নি। মিস্টার ডিক্সিটের বিধবা বউয়ের কাছে যা শোনবার শুনে নিয়েছি।

ডাক্তারের স্টেটমেণ্ট এরপর নেবেন, তাই তো? আমি যদি তখন হাজির থাকি?

সে তো সৌভাগ্য, অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা দেখা যায় শেখরের চোখে মুখে—এই শহরের তিন প্রাচীন পরিবারের একটা পরিবার শেষ হয়ে গেল মিস্টার ডিক্সিটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।

নিঃসন্তান ছিলেন?

সন্তান ছিল। দুই ছেলে। মারা যায় অল্প বয়েসে। ছিলেন বিপত্নীক। বিয়ে করলেন বুড়ো বয়েসে। ছেলেপুলে হয়নি। রক্তের সম্পর্ক বলতে এক ভাইপো—তাও কাছের নয়, দূরের।

প্রাচীন পরিবার বলতে এখন রইল পিশারোট্টি আর নাগরাজন?

হ্যাঁ। এই তিন পরিবার দু-শ বছর ধরে এখানে দাপট দেখিয়েছে। এখন রইল দুই।

অক্ষয় বট, টিপ্পনি কাটল চোঙদার।

সেটা কী? শেখরের প্রশ্ন।

খুব প্রাচীন। অক্ষয় বট সেখান থেকেই এসেছে।

হাসলেন শেখর—অক্ষয় বট-ই বটে। প্রাচীনতা আঁকড়ে রেখেছে এই তিন পরিবার। সেকেলে হয়েই থাকতে চায়—একেলে হবে না কিছুতেই। মান্ধাতার আমলের কিছু কথাও চালু রেখেছে নিজেদের মধ্যে—যা একালের মানুষ বোঝে না। চাল চলনে দু-শ বছরের ছ্যাতলা— বর্তমানকে অগ্রাহ্য করে ইচ্ছে করেই। শহরটাকেও প্রাচীন বানিয়ে রেখে দিয়েছে তো এরাই। গণতন্ত্র-ফণতন্ত্র স্বীকার করে না— রাজতন্ত্র রক্তে বইছে। অর্থ থাকলে সমাজপতি হয়। অথচ সমাজে মেলামেশাও করে না— মিস্টার ডিক্সিট-ই ছিলেন একটু দলছাড়া।

আপনার সঙ্গে মেলামেশা ছিল?

ছিল। চোখেও দেখিনি কিন্তু পিশারোট্টি আর নাগরাজনকে। তবে একটা কিংবদন্তির কথা কানে এসেছে।

কিংবদন্তি?

আড্ডার মুখরোচক উপকরণ ঃ চোওদারের সরস মন্তব্য।

কথা কানে না নিয়ে ফের শুধোয়—কী—কিংবদন্তি বলুন তো? আপনি তো আর হাসছেন না।

হাসি কি আর আসে? শেখর এখন সত্যিই সিরিয়াস।

—এই শহরের অলিতে গলিতে একটা ছড়া শোনা যায়, সেই ছড়ায় সুর দিয়ে গান গাওয়াও হয়। রহস্যজনকভাবে নাকি এই তিনটে পরিবার শেষ হয়ে যাবে—শেষ হয়ে যাবে এই শহরের জীবনও। অপমৃত্যু ঘটবে সুপ্রাচীন এই শহরের তিন খানদানি ফ্যামিলির শেষ বংশধরদের।

ননসেন্স। সর্বহারাদের ওরকম ছড়া কলকাতার অলিগলির দেওয়ালে লেখা থাকে, চোওদারের এখনকার মুখভঙ্গি অনবদ্য।

শেখর কিন্তু হাসছেন না— সেখানে রাজনীতি, এখানে অলৌকিক ভবিষ্যৎবাণী। অনেক ছড়া নয়, একটাই ছড়া।

শুনতে পারি? ইন্দ্রনাথ উঠে বসেছে ইজিচেয়ারে।

চোওদারকে দেখিয়ে শেখর বললেন-- উনি তো মালয়ালম, আই মিন, কোঙ্কানি ভাষা ভালই জানে। আমি মাতৃভাষায় বলছি, উনি অনুবাদ করে দিন বাংলায়।

বলুন, বলুন।

শেখর শোনালেন গানের মতো সেই ছড়া। মুখভাব বিষম বিকৃত করে তার যে অনুবাদ শোনাল চোওদার, তা এই :

ওয়ান, টু, থ্রি—
ডিক্সিট, নাগরাজন, পিশারোট্টি।
খাট গেল একজনের,
দ্বিতীয় জনের চোখ,
হায় হায় করে হারিয়ে গেল
শেষ জনের মস্তক।

এ ছড়ায় ভবিষ্য-দর্শনটা কোথায়?

অদ্ভুত চোখে চেয়ে শেখর বললেন—ছড়াটা মিলছে শেষের দিক থেকে। মিস্টার ডিক্সিটের খুলি চুরমার হয়েছে।—শেষ জনের মস্তক গেছে— কাল রাতে।

গুজব তাই নাকি?

হ্যাঁ। গত রাতে মারা গেছে মিস্টার ডিক্সিট, আজ সারা দিন ধরে শহর তোলপাড় হয়েছে এই নিয়ে। শুরু হয়েছে লুঠপাট। যাদের ছেঁড়া কাঁথা সম্বল, তারা কি এই সুযোগ ছাড়ে? দেখা দিয়েছে অরাজকতা—

ম্যাৎসান্যায়! ইন্দ্রনাথের স্বগতোক্তি শেষ হতে না হতেই মালয়ালম ভাষার একটা ছড়া-গান ভেসে এল দূর থেকে নারী কণ্ঠে— ঠিক যেভাবে একটু আগে শুনিয়েছেন শেখর, সেইভাবে। কিন্তু আচমকা সুর ছিঁড়ে গেল শেষের দিকে— ভয়ার্ত চিৎকার জাগ্রত হলো একই নারী কণ্ঠে!

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে চোঙদার বললে—যাচ্চলে! গলা টিপে ধরল নাকি?

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বেগে প্রস্থান করলেন শেখর। পশ্চাতে ইন্দ্রনাথ। মুখখানা তোলা হাঁড়ির মতো করে চোঙদার আকাশকে লক্ষ্য করে বললে— যা বাব্বা! হোঁদল কুৎকুৎ বলে আমাকে সঙ্গেই নিল না!

খোলা বুকের ওপর গিটারটা চেপে ধরে আর একবার গলা চিরে চেঁচাল মেয়েটা।

ঝট করে এক পা পেছিয়ে গেল একজন ইভটিজার। পেছন থেকে লাফিয়ে এগিয়ে এল তার দোস্ত।

পালাবার পথ বন্ধ। দুই নরপশু দু'দিকে। সঙ্কীর্ণ এই গলি পাথর দিয়ে বাঁধানো। দু'পাশের উঁচু দেওয়াল পাথরে— রন্ধ্রহীন। এখানে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ আসবে না। এত রাতে।

আতঙ্কবিহ্বল চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মেয়েটা। হিংস্র হেসে দুই স্কাউন্ড্রেল হাত বাড়িয়েছে দু-দিকে থেকে।

এবার আর নিস্তার নেই।

আচমকা জুতোর শব্দ শোনা গেল গলির একপ্রান্তে। ছুটে আসছেন স্যুটেড-বুটেড এক ভদ্রলোক।

তৃতীয়বার চেঁচাতে হলো না ষোড়শীকে। দুই নারীলোভী নিমেষে উধাও হয়ে গেল গলির অন্য প্রান্তের অন্ধকারে।

হাঁপাতে হাঁপাতে স্যুটেড বুটেড মানুষটার দিকে ছুটে গেছিল মেয়েটা। সেদিকের দেওয়ালে জ্বলছে তৈল-লম্ফ। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোকের ছাগুলে দাড়ি, কুচকুচে গোঁফ আর নীলবর্ণ স্যুট। এক হাতে ডাক্তারি ব্যাগ।

জ্বালাতন করছিল? বলেই তিনি তাকালেন মেয়েটির দিকে।

সবুজ ব্রোকেডের ঢিলে জ্যাকেট সরে গেছে বক্ষদেশ থেকে : ঝুলছে, আগুলফ কালো সিল্কের প্লেটেড স্কার্টের ওপর। জ্যাকেট খুলতে চেয়েছিল দুই বদমাশ। নখের আঁচড় রয়ে গেছে।

ঝটিতি জ্যাকেট টেনে গা ঢাকা দিয়েছিল মেয়েটি লজ্জারুণ মুখে।

লজ্জা কিসের? আমি তো ডাক্তার। মলম লাগিয়ে দিই। এস, না .. না .. আমি যাচ্ছি...।

রেশম মসৃণ স্বরে বললেন ছাগুলে-দাড়ি ভদ্রলোক।

—যাই বললেই কি যাওয়া যায়? মলম না লাগিয়ে তো ছাড়ব না।

—ছেড়ে দিন!

ততক্ষণে মেয়েটির কাঁধ চেপে ধরেছেন ছাগুলে-দাড়ি। গলির আলোয় দেখা যাচ্ছে চোখের ঝিলিক।

—মলম লাগাব... পয়সাও দেব... এস!

ভদ্রলোককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ষোড়শী— আমি রাস্তার মেয়ে নই।

—কিন্তু চেহারাটা যে মিষ্টি। ভদ্রলোকের হাত এবার এগিয়ে গেল ঢিলে জ্যাকেটের দিকে— মেয়েটি বুকের ওপর গিটার চেপে ধরে আব্রু রক্ষার চেষ্টা করছে...

—উঃ! ছাড়ুন!

চেঁচিয়ে উঠেছিল ষোড়শী। এই নিয়ে তৃতীয়বার। আর ঠিক তখনই গলির দিকে ধেয়ে আসতে দেখা গেল দুই দীর্ঘদেহী পুরুষ মূর্তিকে। তাদের একজনের গায়ে পুলিশের উর্দি, আর একজনের পরনে বঙ্গীয় পরিচ্ছদ।

নিমেষে হাত সরিয়ে নিলেন ছাগুলে-দাড়ি ভদ্রলোক। ঢিলে জ্যাকেট স্বস্থানে টেনে নিল মেয়েটি।

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ছাগুলে-দাড়ি—কী আশ্চর্য! ডাক্তারকে ডাক্তারি করতেও দেবেন না? দু-দুটো বদমাস এই মেয়েটাকে—

আপনি ডাক্তার? নাম? মেঘডাকা গলায় শুধিয়ে ছিলেন পুলিশপ্রবর।

ডক্টর ল্যাজারাস।

মাই গড! আপনাকেই তো খুঁজছিলাম।

আপনি?

শেখর।

নাম শুনেছি। সাক্ষাৎ, এই প্রথম। আমাকে খুঁজছিলেন কেন?

কারণ আপনি হাজির ছিলেন মিস্টার ডিক্রিট পা পিছলে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার সময়ে। চলুন, বসে শোনা যাক।

ষোড়শী এই ফাঁকে অন্তর্হিত হয়েছে।

মাঝের গোল টেবিলে জ্বলছে ইয়া মোটা মশামারা মোমবাতি। টেবিল ঘিরে বসে চারজনে।

চোঙদারেব সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল ডক্টর ল্যাজারাসের। ছিল না ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। ধুতি-পাঞ্জাবি বোধহয় জীবনে দেখেননি। তার সঙ্গে অপূর্ব গড়ন, পেটান মুখকান্তি। দেখে দেখে যেন আশ মিটছিল না ভদ্রলোকের। সেই সঙ্গে কৌতূহল চমক দিচ্ছিলে দুই চোখে।

টেবিল ঘিরে বসবার পর পরিচয় করিয়ে দিলেন শেখর এইভাবে— ইনি বেঙ্গলের ফেমাস প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

চোখে বিদ্যুৎবর্ষণ করলেন ডক্টর ল্যাজারাস, কিন্তু মধু ঝরালেন কণ্ঠে— গ্ল্যাড টু মিট ইউ। মুখ ঘোরালেন শেখরের দিকে— এবার বলুন ধরে নিয়ে এলেন কেন।

গলিতে কি করছিলেন? ইংরেজিতে বললেন শেখর। ডাক্তার সাহেবও বুঝে নিলেন, জবাবটা দিতে হবে ইংরেজিতে। নইলে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অসভ্যতা করা হয়।

বললেন— রুগি দেখতে যাচ্ছিলাম। মেয়েটা টেনে নিয়ে এল গলির মধ্যে। কিছুতেই ছাড়ে না। রাস্তার মেয়ে তো, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে লোক জড়ো করে বেইজ্জত করার মতলবে ছিল। ভাগ্যিস আপনারা এসে পড়লেন। দেখলেন না পড়পড়িয়ে পালালো। পুলিশ দেখেই আঁৎকে উঠেছে। বাজে মেয়ে! এই বয়েসেই— যাকগে, মিস্টার ডিক্সিটের ব্যাপারে কি শুনতে চান বলুন।

উনি যখন সিঁড়ির মাথা থেকে পড়ে যান, আপনি তখন ছিলেন?

না তো। আমি ছিলাম চাকর মহলে। মিসেস ডিক্সিটের চিৎকার শুনে দৌড়ে বেরিয়ে আসি উঠোনে। উনিও বেরিয়ে এসেছিলেন উঠোনে। গিয়ে দেখি, লাইব্রেরি সিঁড়ির তলায় পড়ে আছেন মিস্টার ডিক্সিট— খুলির সামনের দিক চুরমার। ডেড। দেখেই বুঝলাম সেরিব্রাল স্ট্রোক। হয়েছে সিঁড়ির ওপর ধাপে— হাত থেকে খসে পড়েছে জ্বলন্ত মোমবাতি— ডেডবডি আছড়ে পড়েছে নিচের ধাপে— একপাটি চটি খসেছে সিঁড়ির মাঝখানে— মাথা ঠুকে গেছে রেলিংয়ের থামের ছুঁচোলো ডগায়— সেখানে লেগে রক্ত আর পাকা চুল। আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি— ঝুঁকি নিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট লেখা সমীচীন মনে করলাম না-- যদিও আমিই শুধু জানি, বেশ কিছুদিন ধরেই ওঁর ঘাড়ে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল— বিশ্রাম নিতে বলেছিলাম, নেননি। চাল ডিসট্রিবিউশন নিয়ে বড্ড বেশি মেহনত করছিলেন—

বাধা দিয়ে শেখর বললেন— আপনি আমাকে খবর না দিয়ে সোজা ছুটলেন পুলিশ ডাক্তারের কাছে?

কারণ তাঁর কাছ থেকেই খবর আপনি পেতেন... অত রাতে পেলাম না ভদ্রলোককে—গেলাম আজ সকালে—ওর রিপোর্ট কনফার্ম করছে আমার রিপোর্ট।

তখন রাত ক'টা?

কখন?

মিস্টার ডিক্সিটের ডেডবডি যখন দেখেছিলেন?

রাত দশটা।

অত রাতে ওঁর বাড়ি গেছিলেন রুগি দেখতে?

এগজ্যাক্টলি। তবে অত রাতে যাইনি। জ্বর হয়েছিল। গেছিলাম ওঁর খাস-চাকরকে দেখতে। জ্বর হয়েছিল। মামুলি। ম্যালিগন্যাণ্ট নয়। ওষুধ দিয়ে যখন চলে আসছি, মিস্টার ডিক্সিট বললেন খেয়ে যেতে। গ্রেট ম্যান। আগেকার মানুষ তো। বসলাম খেতে তিনজনে— আমি, উনি, আর মিসেস ডিক্সিট। খাবার এনে পরিবেশন করলেন মিসেস ডিক্সিট— খাস চাকর তো জ্বরে। খেয়ে যখন উঠলাম, রাত ন'টা বেজে গেছে। মিস্টার ডিক্সিট বললেন মিসেসকে, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো

বেডরুমে। আমি যাচ্ছি লাইব্রেরি রুমে। একটু রাত হবে। ওখানেই সোফায় ঘুমোবো। গ্রেট ম্যান। স্ত্রী-কে কষ্ট দিতে চাইলেন না— রাত জেগে বসে থাকতে দিলেন না। বলেই উনি গেলেন বাড়ির অন্যদিকের লাইব্রেরি ঘরে— কিন্তু মিসেস ডিক্সিটের কর্তব্যজ্ঞান প্রখর। স্বামীর হয়তো কিছুর দরকার হতে পারে, এই ভেবে লাইব্রেরি ঘরে উঠতে যাচ্ছেন—দেখলেন মিস্টার ডিক্সিটের ডেডবডি।

আপনি তখন চাকর মহলে। ফের রুগি দেখতে?

হ্যাঁ, মন তো খুঁত খুঁত করে। সময়টা ভাল যাচ্ছে না। গিয়ে দেখি সত্যিই জ্বর বাড়ছে। ব্যবস্থাপত্র করছি, এমন সময়ে—

মিসেস ডিক্সিটের চিৎকার শুনে ছুটে বেরিয়ে এলেন। আজ রাত অনেক হল— এই পর্যন্ত থাক। আসুন।

সিঁড়ি বেয়ে ডক্টর ল্যাজারাস নেমে যেতেই রাগে ফেটে পড়লেন শেখর— ড্যাম লায়ার! গলির মধ্যে মেয়েটাকে জ্বালাতন করছিল হারামদাজা—মেয়েটা ওকে টেনে নিয়ে যায়নি।

তা ঠিক, সায় দিল ইন্দ্রনাথ— কিন্তু সে মেয়ে চম্পট দিল কেন? কেন রেহাই দিল ডক্টরকে?

ঝামেলায় জড়াতে চায় না বলে। রাস্তার মেয়ে তো নয়।

এ সব কিছুই জানা ছিল না চোঙদারের। মুখগহ্বর প্রসারিত করে এতক্ষণ শুনছিল বাক্য-লহরী। এখন ধাঁ করে জানতে চাইল—যাচ্চলে। গলির মধ্যে মামদোবাজি করতে গেছিল মেয়েছেলে নিয়ে। এত বড় ডাক্তার।

কথাটা বলেছিল বাংলায়। অতএব শেখর জানতে চাইলেন, কথাটা কী। মামদোবাজি শব্দটার মানেও জেনে নিলেন। তারপর পকেট থেকে বের করলেন পুলিশ ডাক্তারের রিপোর্ট।

বললেন—রিপোর্ট হাতে পেয়েই ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু বসা যাক। ওই ছড়া গানটার জন্যে খটকা লেগেছে। সত্যিই তো মাথা গেল একজনের—

আর এই রাতে সেই ছড়াগান এক রহস্যময়ী আমাদের শুনিয়ে দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কে সে? এ অঞ্চলে এত রাতে গান গাইতে কাকে শোনাতে এসেছিল?

যাক, দিন রিপোর্ট। পড়া যাক।

রিপোর্ট অতি সংক্ষিপ্ত।

ঊনসত্তর বছর বয়সের মিস্টার ডিক্সিট রেলিং-এর ছুঁচোলো ডগায় মাথা ফাটিয়ে মারা গেছেন। ছুঁচোলো পয়েন্টে সাদা চুল আর রক্ত দেখা গেছে। বাঁ গালে কালচে ধ্যাবড়া দাগ দেখা গেছে— হয়তো ঝুল, অথবা কালো রঙ। বাঁ পাঁজর আর ডান পাঁজরে কালসিটের দাগ ; পিঠে। কাঁধে। পায়েতেও কালসিটে পড়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

রিপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে,

—গড়িয়ে আছড়ে পড়বার সময়ে নিশ্চয় কালসিটে পড়েছে। ধোঁকা কিন্তু অন্য পয়েন্টে।

কি পয়েন্টে? শেখর উৎসুক।

বাঁ'গালে কালচে ধ্যাবড়া দাগ।

লাইব্রেরি ঘরে গেছিলেন, নিশ্চয় লেখালেখি করেছেন। কালি লাগিয়ে ফেলেছে গালে।

কালিটা রাইটং ইঙ্ক কিনা—

দেখবার উপায় নেই। দাহ শেষ হয়ে গেছে।

গুম হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

জব্বর মিস্ট্রি, ফোড়ন কাটল চোঙদার— এক, দুই, তিন। ইন্দ্রনাথ, তুই আর আমি বিয়ে করিনি এই জন্যেই। যত নষ্টের মূল মেয়েছেলে— আমার তো সন্দেহ ওকেই—

মুখ গম্ভীর করে শেখর বললেন— শুধু আপনারা দু'জন নন, আমিও বিয়ে করিনি ওই ভয়ে।

কিন্তু উনি ভীষ্ম থাকতে পারেননি। সে কাহিনী আসবে যথা সময়ে।

শহরটার একদিকে বড়লোকদের বড় বড় বাড়ি, আর এক দিকে বস্তি। ঠিক মাঝখানে একটা বড় বাড়ির পেছন দিকে একটা ভাটিখানা আছে। রাত গভীর হলে সাদা পোশাকে এখানে মাঝে মাঝে যান শেখর খবর সংগ্রহ করতে। এই চাকরিতে এসে এই অভ্যেসটি রপ্ত করেছেন। শুধু চেয়ারে বসে থাকলে হয় না, গুপ্তচরদের ওপর নির্ভর করলে হয় না— নিজেকেও মিশে যেতে হয় আমজনতার সঙ্গে।

চোঙদারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোয়ার্টারে গিয়ে ভোল পালটে এই ভাটিখানায় এসে বসলেন শেখর। মন ভারাক্রান্ত। তুচ্ছ বিষয়ও অনেক সময়ে মূল্যবান সূত্র বহন করে। যেমন, এই ছড়াগানটা। সত্যিই কি ভবিষ্যৎবাণী ফলছে?

এককালের দেশীয় রাজ্য এই অঞ্চলে আবগারি শুল্ক কম। সুরা সুলভ। চা-কফির মতো পান করে প্রত্যেকে। বিহারে যেমন বাড়ির বউ থেকে আরম্ভ করে কর্তা পর্যন্ত সবাই হুঁকোয় টান মারে, এখানে তেমনি বয়স নির্বিশেষে নারীপুরুষ নির্বিশেষে অধর সুরাসিক্ত করা দোষাবহ নয়।

তাই কাউন্টারের বুড়োর কাছ থেকে একপাত্র সোমরস নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলেন শেখর। তার আগে দেখে নিলেন ভাটিখানায় এই মুহূর্তে রয়েছে কারা। কাউন্টারে বসে একটা বাঁদর। পাশের টেবিলে এক আধবুড়ো পুতুল-নাচিয়ে খুব মন দিয়ে টেবিলের ওপর হাতে ধরা একটা পুতুলের দিকে চেয়ে রয়েছে। রঙচঙে পোশাক ঠিক করে দিচ্ছে। পাশেই মেঝের ওপর রয়েছে বাঁশের বাক্সে আরও পুতুল। ডালাখোলা।

খুট করে পুতুলের মুণ্ডুটা খুলে নিল পুতুল নাচিয়ে।

স্বাভাবিক মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে শেখর বললেন—মুণ্ডু পছন্দ হলো না?

না, আনমনে জবাব দিয়ে হেঁট হয়ে বাক্স হাতড়াতে হাতড়াতে জবাব দিল পুতুল নাচিয়ে— বড়লোকদের মুণ্ডু কবে ঠিক থাকে? মাঝে মাঝে পালটে দিতে হয়।

কথাটার মধ্যে হেঁয়ালি রয়েছে। কানে বাজল শেখরের এবং বুঝে ফেললেন, উনি যে পুলিশ আদমি, পুতুল-নাচিয়ে তা বুঝতে পারেনি। তাই সুরাপাত্রের দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, সহজ গলায় যেমন মিস্টার ডিক্সিটের মুণ্ডু। তাই না?

প্রায় তাই। বড্ড বড়লোক ছিলেন তো। কেচ্ছা সব চাপা থাকে, কিন্তু মুণ্ডু দিতে হয়। এই যে বাড়িটায় বসে রয়েছেন, দেখলেন এর ভেতরে কত কেচ্ছা চলছে? আসুন, দেখে যান।

দেওয়ালের গায়ে নীল পর্দা সরিয়ে ইঁটের ফাঁকে একটা ফুটো দেখাল পুতুল-নাচিয়ে— আসুন না, রঙ্গ দেখে যান। বড় বাড়ির বড় কেচ্ছা।

উঠে গিয়ে ফোকরে চোখ লাগিয়ে থ হয়ে গেলেন শেখর।

একটা উঠোন। শেষের দিকে নাটমন্দির। লম্বা লম্বা থাম ঘিরে রয়েছে উঠোন। মাঝে পাতা একটা খাটিয়া। খাটিয়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে এক বিবসনা নারী। কালো চুল লুটোচ্ছে মেঝেতে। দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে রয়েছে খাটিয়ার ওপর দিক। দু-পা বেরিয়ে রয়েছে নিচের দিকে। তার পৃষ্ঠদেশ আর নিতম্বপ্রদেশে অজস্র রক্তরেখা। রক্ত গড়াচ্ছেও বটে।

কারণ, শেখরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সবুজ আলখাল্লা পরা এক ব্যক্তি সপাং সপাং করে চাবুক হাঁকড়ে যাচ্ছে অভাগিনীর ওপর।

আচমকা দুটো বড় পাখি সোনালি ডানা ছড়িয়ে থামের ফাঁক দিয়ে ঢুকল প্রাঙ্গণে।

কাপড় টেনে ফুটো বন্ধ করে দিল পুতুল-নাচিয়ে।

জব্বর কেচ্ছা! তাই না?

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন শেখর। বিকৃত লালসার এহেন অভিব্যক্তি এ অঞ্চলের খানদানি মহলে এক সময়ে চালু ছিল, শেখর তা জানে। কিন্তু এখন আছে শুধু বাইজি-নাচ, নগ্নিকা-নৃত্য, মনোরঞ্জনের আর কোনও পন্থা তো এখানে পৌঁছয়নি। ফলে, সমাজের অনুশাসন ঢিলে হতে বাধ্য।

কিন্তু বিকৃতলালসার চরিতার্থতা এখনও চালু এই শহরে? এই বাড়িতে?

গেলাস রেখে উঠতে যাচ্ছিলেন শেখর, পুতুল-নাচিয়ে বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান যা দেখলেন তা সত্যি নয়।

মানে?

পুতুল-নাচের ছবি। এই দেখুন, বলেই নীল পর্দা পুরো সরিয়ে দিল আধবুড়ো। দেখা গেল একটা কাঠের বাক্স। পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল, চোখ লাগানোর জায়গায় ভাঙা ইঁটের ফোকর আঁকা রয়েছে।

ধপ করে বসে পড়লেন শেখর—পুতুল খেলা! একেবারে সত্যি বলে মনে হচ্ছে। করেন কী করে?

হাতসাফাই। পর্তুগিজরা অনেক বিদ্যে জানে। আমি আমার নিজের বিদ্যে খাটিয়েছি তার ওপর। ছায়াবাজি, আলোর খেলা, দৃষ্টিভ্রম। আর একটা দৃশ্য দেখে যান।

ফোকরে চোখ রাখলেন শেখর; এবার দেখলেন একটা ছোট্ট নদীর পাড়ে একটা সুন্দর দোতলা ভিলা প্যাটার্নের বাড়ি। বাড়ির সামনে ইউক্যালিপটাস বীথি। হাওয়ায় পাতা নড়ছে। নদীতে একটা নৌকো ভেসে যাচ্ছে। দাঁড় টানছে একটা লোক—তার মাথায় বাঁশের চওড়া কিনারা টুপি। গলুইয়ে বসে ভারি মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে। আচমকা ভিলা-বাড়ির দোতলার দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধ—হাওয়ায় উড়ছে তার সাদা দাড়ি।

এই পর্যন্ত দেখার পরেই দপ দপ করে উঠে নিভে গেল আলো—দৃশ্য মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আশ্চর্য! এত নিখুঁত দৃশ্য—

কার্ডবোর্ড কেটে বানিয়ে রাখি। এ রকম অনেক সিন আছে স্টকে—

থেমে গেল পুতুল-নাচিয়ে। তার চোখ এখন দরজার দিকে।

ভাটিখানায় ঢুকছে এক দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী।

কাউন্টারে বসে যে বাঁদরটা এতক্ষণ মাথা আঁচড়াচ্ছিল নখ দিয়ে, আচমকা সে এক লম্বা লাফ দিয়ে চলে এল পুতুল-নাচিয়ের কাঁধে। নিমেষে ল্যাজ জড়িয়ে গেল মালিকের গলা ঘিরে এবং কুঁই কুঁই গুঁই গুঁই করে উঠল অদ্ভুত গলায়। যেন ভীষণ ভীত, ভীষণ সন্ত্রস্ত।

ভয় পেয়েছে মেয়েটার চোখ দেখে?

চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলছে। বড় বড় চোখ। টানা বেঁকানো ধনুক ভুরু। লাল টকটকে ঠোঁট। চকচকে লম্বা চুল চুড়ো করে বাঁধা মাথার ওপরে। সবুজ ব্রোকেডের ঢিলে জ্যাকেটের ঊর্ধ্বাঞ্চল থেকে উঁকি দিচ্ছে নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির যুগলের ওপরের অংশ— নিম্নাংশ আবৃত টাইট টপে, নিম্নাঙ্গে কালো সিল্কের প্লেটেড স্কার্ট— ঝকঝকে নয়, জীর্ণ এবং চাকচিক্যবিহীন।

ঠিক এই সময়ে বাঁদরটাও কিচিমিচিরের জন্যেই বুঝি ঘরের এদিকে লোচন-বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করেছিল ভীষণ স্মার্ট হিলহিলে কেউটে সদৃশ মেয়েটা। সটান তাকিয়েছিল শেখরের চোখে চোখে।

উদ্ধত চাহনি। কারণ, শেখর যে স্থানকাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে নিজের পদমর্যাদা শিক্ষা-দীক্ষা ভুলে মেরে দিয়ে, চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার ভদ্রতা স্মরণে না রেখে, নিবাত নিষ্কম্প হয়ে চেয়ে আছেন মূর্তিময়ী বিদ্যুৎবল্লরীর দিকে।

কী আশ্চর্য! এই তো কিছুক্ষণ আগেই এই মেয়েটাকেই তিনি দেখে এসেছেন স্বল্পালোকিত গলি মুখে লাঞ্ছিতা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। একই বয়স—ষোড়শী কি সপ্তদশী। তখন হাতে গিটার—এখন নেই।

ঝট করে জ্বলন্ত চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাউণ্টারের বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে নিম্নকণ্ঠে অর্ডার দিতেই একপাত্র সস্তার সুরা এগিয়ে দিল বৃদ্ধ। তার মুখে কথা নেই—কিন্তু মেয়েটিকে সে চেনে নিশ্চয়। তাই তার ঝলক চমকে তিলমাত্র চঞ্চল নয়।

এক নিঃশ্বাসে পাত্র শূন্য করে কাউণ্টারে নামিয়ে রেখে বিদ্যুৎবর্ষী চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকাতেই ফের পাত্র ভরে দিল সে কড়া গরলে।

এক চুমুকে সে পাত্রও হলো শূন্য।

স্থির নয়ন বিপুল-চমকিত শেখর আর স্থির রাখতে পারেননি রসনাকে। বলেছিলেন পাশের পুতুল-নাচিয়েকে—ছুঁড়ি খেতেও পারে বটে!

পুতুল-নাচিয়ে বিলকুল বোবা।

কিন্তু মন্তব্যটা বায়ুমণ্ডলে হিল্লোল তুলে দিয়ে গিয়ে নিশ্চয় বিদ্যুৎ-বরণী বিদ্যুৎ-নয়নীর কর্ণযন্ত্রে প্রবেশ করেছিল, তাই আর একবার চোখের ফ্ল্যাশ মেরেছিল শেখরকে লক্ষ্য করে। এক হাতের ঝটকা টানে শিখর খোঁপা খুলে দিয়ে কালো চুলের লম্বা নাগিনীদের পৃষ্ঠদেশে ফেলে দিয়ে অপর হাতের দু-আঙুল দিয়ে আঁচড়ে নিয়েছিল বেঁকা ধনুক ভুরু যুগল।

স্পর্ধিত অঙ্গসঞ্চালন। বডি ল্যাংগুয়েজেই বুঝিয়ে দিচ্ছে ও রকম লেলিহ চাহনির তোয়াক্কা সে রাখে না।

শেখরের চোখে কিন্তু আহ্বান ছিল না—ছিল বিমুগ্ধ বিস্ময়। তিনি শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র পুরুষ। ক্ষুধিত চোখে রমণী অবলোকন তাঁর কোষ্ঠীতে লেখা নেই। তিনি তাকিয়েছিলেন সপ্রশংস চোখে—কোনো বিউটি যে এত ধারালো চুম্বক হতে পারে, তা তাঁর জানা ছিল না। নর্মসহচরীর উপযুক্ত পাত্রী— যার পদপল্লব বুকে তুলে নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বর্গ রচনা করে যাওয়া যায়।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড এই মেয়েটাই। অসহায় আর্তস্বরে দিগবিদিক প্রকম্পিত করেছিল একটু আগে পর পর তিনবার—তারপর ভীরু শশকের মতো অন্তর্হিত হয়েছিল অন্ধকারে...।

এখন সে পর পর দু'গেলাস মদ্যপান করেও অনাবিল চোখে দহন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাচ্ছে— শেখরের মতো লম্বা চওড়া এক পুরুষের দিকে।

সত্যিই বিচিত্র এই নারী চরিত্র!

আচমকা দড়াম করে খুলে গেল ভাটিখানার দরজা। বিপুল বেগে প্রায় একই সঙ্গে প্রবেশ করল চার নওজোয়ান—বেশভূষায় প্রত্যেকেই হাঘরে—নিশীথ রাত্রে মধুশালায় তাদের আগমণ নিছক পানীয় সেবার জন্য—মধুমতীর আকর্ষণেও বটে।

হেঁড়ে গলায় অট্টহেসে নোংরা চোখের ঝলক মেরে বললে সবচেয়ে তাগড়াই ছোকরা—পেয়েছি কড়া মাল! গেলাসের মাল পরে— আগে একে চোখে নে।

অসম্ভব ফর্সা বিদ্যুৎবরণীব মুখমণ্ডল ঈষৎ লোহিতাভ হলো— তার বেশি কিছু না। এক ইঞ্চিও টলে গেল না কাউণ্টার ছেড়ে।

নোংরা দাঁতের বাহার দেখিয়ে ততোধিক নোংরা চোখের নাচন দেখিয়ে লাফিয়ে এল প্রথম বজ্রবাঁটুল।

নিরুত্তাপ স্বরে মেয়েটি শুধু বললে—তফাত যাও।

হাসির হুল্লোড় তুলল চারজনেই।

বললে একজন— নরক গুলজার করার আগে একটু পিটিয়ে নাচিয়ে নে—তাহলেই সিধে হবে। এসো হে... নাইট বিউটি—

কথা শেষ হওয়ার আগেই শেখর টেবিল ছেড়ে ছিটকে গেছিলেন—কিন্তু এক ফুটের বেশি যেতে পারেননি। কেন না, পুতুল-নাচিয়ে পা বাড়িয়ে দিয়ে মোক্ষম এক লেংগি কষাতেই তিনি মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন অন্য এক টেবিলের ওপর। কপাল ঠুকে যাওয়ায় চোখে ধোঁয়া দেখে বসে পড়েছিলেন মেঝেতে।

ইতিমধ্যে কানে ভেসে এসেছিল পুরুষ কণ্ঠে বিকট চিৎকার। দুমদাম শব্দ। দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার আওয়াজ।

চোখের ঘোর কাটিয়ে মাথা তুলে শেখর দেখেছিলেন, কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শুধু মেয়েটা—জ্যাকেটের আস্তিনে হাত বুলোচ্ছে। কাউণ্টারের ওদিকে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধ পরিতৃপ্ত চোখে কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করছে।

কপালের স্ফীতির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে জ্বলন্ত চাহনি হেনেছিলেন শেখর— পুতুল-নাচিয়ের দিকে। হাতের ইসারায় সে কাছে ডেকেছিল শেখরকে। দুই চোখের ভাষা অতিশয় নিগূঢ়।

বিমূঢ় শেখর তার কাছে যেতেই খাটো গলায় সে বলেছিল— বোকামি করতে গিয়ে মারা পড়তেন। ও মেয়ে যে বল-মেয়ে।

বল-মেয়ে! চোখের তারা স্থির হয়ে গেছিল দুঁদে পুলিশম্যান শেখরের।

আর কিছু বলতে হয়নি পুতুল-নাচিয়েকে। কারণ, বল-মেয়ে নাম্নী বিভীষিকা-কন্যাদের কাহিনী অজানা নয় শেখরের—তবে তাদের একজনের দর্শন পেলেন এই প্রথম এবং প্রত্যক্ষ করলেন কি অনায়াসে মিরাকল মার মেরে একজনেই শায়েস্তা করতে পারে দুশমন দলকে।

বল-মেয়ে! এহেন নামকরণের উৎস একটা বল। লৌহ গোলক। আকার আয়তনে ডিমের মতো। লুকোনো থাকে দু-হাতের জ্যাকেটের আস্তিনের ডগায়। আততায়ী আক্রমণ চালালেই গোলক চলে আসে হাতের মুঠোয়। তখন নিপুণ মারণ কৌশলের ভানুমতির ভেলকি দেখিয়ে যায় অনুপল সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই। আততায়ীর শরীরের যে কোনও দুর্বল জায়গায় আঘাত হানতে পারে, মাথার খুলি ভেঙে দিতে পারে, হাত-কাঁধ ভেঙে দিতে পারে। পঙ্গু করে দিতে পারে আমৃত্যু, খুনও করে দিতে পারে পলক ফেলার আগেই।

বল-কন্যা! বল-কন্যা! এদের নাম হওয়া উচিত নিপুণিকা, চতুরিকা, সাহসিকা, মারণিকা! প্রাচীন চীন দেশের এই মার্শাল আর্ট পর্তুগিজদের হাতে এসে ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। মেয়েরা দীর্ঘ প্রশিক্ষণ দিয়ে সামান্য লোহার বলকে মারাত্মক হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। সার্কাসের মেয়েদের মতো এরা জিমন্যাস্টিক

জানে, সঙ্গে ছুরি রাখে না—চম্পক আঙুলি দিয়ে মৃত্যুকে নাড়িয়ে যায় যে তড়িৎবেগে!

বিভীষিকা-কন্যা এখন আঁচলের দিকে মানে, জ্যাকেটের আস্তিনের দিকে চেয়ে আছে। দূর থেকেই দেখতে পেলেন শেখর আস্তিনের ডগায় রক্তের দাগ। জখম করেছে তাহলে দুশমনদের। অথচ উত্তাল নয় বক্ষদেশ, স্ফীত নয় নাসারন্ধ্র! যেন মাছি তাড়িয়েছে হাত নেড়ে।

কানের কাছে আস্তে বললে পুতুল-নাচিয়ে— শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে একজনের।

যাই, জখম হল কিনা দেখে আসি বলেই, সাঁৎ করে মেয়েটির পাশে হাজির হয়েছিলেন শেখর।

—চোট লাগেনি তো?

অপাঙ্গে তাচ্ছিল্য চাহনি নিক্ষেপ করে কুশলিকা বললে— না। বলতে বলতে জগের জল ঢেলে ধুয়ে নিল আস্তিনের রক্ত।

এতই যদি শক্তি, একটু আগে ডাক্তারকে রেহাই দিয়ে আমাকে দেখেই পালালে কেন?

ঝট করে অগ্নিগর্ভ চোখ ঘুরে গেল শেখরের দিকে। ভ্যাবাচাকা খেলেন পুলিশ ম্যান। নিছক চাহনির মধ্যে শক্তির এহেন বিস্ফোরণ তিনি অপিচ দেখেননি।

পর মুহূর্তেই জ্বলন্ত চাহনি ঘুরে গেল কাউন্টারের বৃদ্ধের দিকে— পয়সা পরে দেব।

লোহার বলটা কাউন্টার থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সাঁ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তড়িৎ শিখা।

শেখর দেখে নিলেন, অন্য আস্তিনে আর একটা বল নেই।

মাত্র একটা বলেই এই খেল!

ফিরে এলেন পুতুল-নাচিয়ের কাছে। সে তখন হেঁট হয়ে পুতুল গুছোচ্ছে বাঁশের বাক্সে।

গলা নামিয়ে শুধোলেন শেখর— খেলা দেখালে পয়সা নেবে না?

দশটা টাকা দিন।

দিলেন শেখর। তখনই জানতে চাইলেন— মেয়েটাকে চেনো?

না চেনার মতো চিনি।

বাক্য-প্রহেলিকার গভীরে প্রবেশ করার অবস্থায় ছিলেন না শেখর— নাম কী?

নীলকান্তা।

একটু আগেই দেখলাম গলির মুখে—

ওর বোনকে দেখেছেন। তার নাম প্রবাল। যমজ বোন। নীলকান্তা বল-এক্সপার্ট। প্রবাল গিটার এক্সপার্ট। খেলা দেখায় দু'জনে একই সঙ্গে। নীলকান্তা জানে জিমন্যাস্টিক, প্রবাল জানে গান আর নাচ।

বাঁদরটা ল্যাজ ঘুরিয়ে নিল পুতুল-নাচিয়ের গলায়।

বাক্স তুলে নিয়ে যেন পালিয়ে গেল আধবুড়ো।

হাঁ বন্ধ করলেন শেখর। বিয়ে যদি করতে হয়, এমন মেয়েকেই। এমন কাণ্ডারি নিয়ে সংসার সমুদ্রে পাড়ি জমানো যায়। সজীব বিদ্যুৎ এই নীলকান্তা।

পথে বেরিয়ে আবার একটা ধাক্কা খেলেন শেখর।

এত রাতে দোকানপাট বন্ধ। কোণে কোণে মুড়ি দিয়ে শুয়ে কিছু উঞ্ছ ব্যক্তি। রাস্তার মোড় ঘুরে আচমকা স্বল্পালোকিত পথ বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এল একটা ছেলে। তার দুই চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বুঝি ভূতে তাড়া করেছে।

পেছনে খুনে গুণ্ডা লেগেছে মনে হচ্ছে? জনবিরল পথে অনেক কাণ্ডই এখন সম্ভব।

ছেলেটাকে রুখে দিলেন শেখর। নিম্নশ্রেণীর কিশোর। পরিচ্ছদে তার প্রমাণ।

দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে তার পথ আটকাতেই চিল-চিৎকার ছেড়ে সে বলেছিল—ছেড়ে দিন! ছেড়ে দিন! থানায় যেতে দিন!

আমি দারোগা। হয়েছে কী?

খুন।

কে?

মিস্টার পিশারোট্টি।

বুঝি বজ্রাহত হলেন শেখর। প্রশ্ন করলেন ক্ষণপরেই—তুমি কে?

বাড়ির চাকর।

নদীর ও পারে বড় বাড়ি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছড়া ফলে যাচ্ছে... ছড়া সত্যি হচ্ছে। ওয়ান, টু, থ্রী—ডিক্সিট, নাগরাজন, পিশারোট্টি। এখন বাকি রইল একজন— নাগরাজন! খতম হয়ে যাচ্ছে অত্যাচারীদের যুগ।

থ হয়ে গেলেন শেখর। ছড়ার মধ্যে আগাম কোতলের নোটিশ! বানিয়েছে কোন জল্লাদ?

সিরিয়াল মার্ডার কেস নাকি?

চোঙদার বললে চোখ নাচিয়ে— শেখর সাহেবের শ্রীঅঙ্গের রোমে রোমে চলছে এখন অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল। এ নৃত্য প্রেমের নৃত্য।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছেন শেখর। সব কথা নিবেদন করবার পরেই— চোঙদারের মুখ চুলবুল করে উঠেছে। ইন্দ্রনাথ কালো আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছে।

শেখর স্নান মুখে বললেন— পড়েছি গেরোয়, এখন তো ঠাট্টা করবেন।

করবই তো। নারীযন্ত্রে যে ইন্দ্রিয় যন্ত্রগুলো আছে, তারা যে কী ইন্দ্রজাল রচনা করতে পারে— আপনার তা জানা নেই!

শিরায় শিরায় তা টের পাচ্ছি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে চোঙদার— প্রথম প্রেম এইরকমই হয়।

বিরক্ত স্বরে ইন্দ্রনাথ বললে— ভ্যাজর ভ্যাজর করিসনি, চঞ্চল। মিস্টার শেখর, আপনার সন্দেহ মিস্টার ডিক্সিটের মস্তকচূর্ণ পা পিছলে হয়নি—

সন্দেহটা আপনিই আমার মাথায় ঢোকালেন— গালের ওই কালচে ধ্যাবড়া দাগটা—

এক কাজ করুন। ওঁকে মার্ডার করার মোটিভ একজনেরই জোরালো—

মিসেস ডিক্সিটের। ওয়ারিশ তো এখন প্রায় তিনি—

কাল সকালে এখানে আসতে বলুন। এখন চলুন মিস্টার পিশারোট্টির বাড়ি।

শেখর সাহেবের পতি রোমকূপে বিরাট স্পন্দন আর নর্তন বিরাজ করলেও কর্তব্যকর্ম তিনি বিস্মৃত হননি। যে ভয়ার্ত নিরক্তবদন কিশোরের মুখে তিনি পিশারোট্টির প্রয়াণ সংবাদ অবগত হয়েছিলেন, তাকেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ফাঁড়িতে— সেকেণ্ড অফিসারকে নিয়ে যেন তিনি ফার্স্ট রিপোর্ট তৈরি করতে অবিলম্বে উপস্থিত হন অকুস্থলে।

শুধু ইন্দ্রনাথকে নিয়ে এখন তিনি প্রভঞ্জনবেগে পৌঁছে গেলেন প্রশস্ত সোপানের সামনে। সোপানের ঊর্ধ্বদেশে খাড়া ডবল গেট— লোহার পাত মারা— হাতি গলে যায়, এত উঁচু। ডানদিকের প্যানেলে একটা সরু দরজা— এত সরু যে একজনের বেশি ঢুকতে পারবে না সেই ফোকর দিয়ে।

আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ— শহরের ঠিক মাঝখানে এ রকম কেল্লার মতো প্রকাণ্ড সৌধ তৈরি হওয়ার কারণ কি জানেন?

শেখর ব্যাখ্যা দিলেন এইভাবে— প্রায় একশো বছর আগে রাজা পিশারোট্টি খাল পাড়ে বসে তোলা আদায় করার জন্যে এ বাড়ি বানিয়েছিলেন। গায়ের জোরে আর টাকার জোরে রাজাসাহেব বনেছিলেন। এদিকে দাপট ছিল তাঁরই। শহরের শেষ ছিল খালপাড় পর্যন্ত। ব্রিজের তলা দিয়ে নৌকো গেলেই খাজনা দিয়ে যেতে হতো। মিস্টার পিশারোট্টি সেই রাজাসাহেবের শেষ বংশধর— রাজা খেতাব ছাড়েননি।

খুট করে খুলে গেল প্যানেলের ছোট দরজা। সেকেণ্ড অফিসার বেরিয়ে এলেন— পেছনে সেই কিশোর বালক— দুঃসংবাদ নিয়ে যে দৌড়েছিল জনহীন পথ বেয়ে।

সেকেণ্ড অফিসার মানুষটা একেবারে কাঠখোট্টা। ইচ্ছে করে মাথার চুল বদখৎভাবে ছাঁটা— সামনের দিকে আধ ইঞ্চি লম্বা— পেছনের দিকে বড়জোর পাঁচ মিলিমিটার। নাকখানা বিরাট আর ঈগল-চঞ্চল মতো বেঁকানো। গোঁফ প্রকাণ্ড— ডগা পাকানো সযত্নে। তাঁর বদনের বিপুলতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডান গালে একটা মস্ত আঁচিল। আঁচিল থেকে বেরিয়ে আছে তিনটে মাত্র দীর্ঘ চুল— তা প্রায় ইঞ্চি দেড়েক লম্বা। এই তিনখানা চুলই তাঁর পেরিস্কোপ, তাঁর দূরবিন, তাঁর অ্যান্টেনা, তাঁর কম্পাস। এই মুহূর্তে তিনি নিথর তর্জনি সঞ্চালন করছেন

এই তিনখানা চুলের ওপর। এঁর নাম রামানুজ পটল। পটল তেলেঙ্গিদের বংশপদবী। ইনি অন্ধ্রের মানুষ। দক্ষিণ ভারতকে চষে খেয়েছেন। দক্ষিণভারতীয় ভাষা বিশারদ।

শেখর সাহেবকে প্রশ্ন করবার অবকাশ না দিয়ে চৌকস সেকেণ্ড অফিসার বললেন— খুন-ই বটে, স্যার। বাড়ির পেছন দিকের গ্যালারিতে খুন হয়েছেন রাজাসাহেব। খাল বরাবর রয়েছে যে গ্যালারি— সেইখানে। প্রথম দেখেছে এই ছেলেটার মা রানি সাহেবার দাসী। পুরো বাড়ি সার্চ করলাম, খুনিকে পেলাম না। নিশ্চয় যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে, সেই দরজা দিয়েই পালিয়েছে। বেরনোর পথ তো আর নেই। বলতে বলতে আঁচিলের চুল থেকে তর্জনি তুলে গেটের দু'পাশের উঁচু পাঁচিল দেখাল রামানুজ পটল— এই পাঁচিল ঘিরে রেখেছে বাড়ির তিন দিক— একদিকে রয়েছে খাল।

সরু দরজা গলে ভেতরের চওড়া উঠোনে ঢুকলেন শেখর— পিছনে ইন্দ্রনাথ, তার পিছনে পটল আর ভীতবদন সেই কিশোর। দারোয়ানের খুপরিতে ঝুলছে একটা মাত্র লণ্ঠন। আলো হোঁচট খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মস্ত আঙিনায়।

অনর্গল রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে রামানুজ পটল— গেটের এই ছোট্ট দরজায় থাকে একটা ছিটকিনি, স্পেশাল চাবি ঘুরিয়ে বাইরে থেকে খোলা যায়। ভেতর থেকে আঙুল দিয়ে তুলে দিলেই হলো। বাইরে থেকে দরজা টেনে বন্ধ করে দিলে ছিটকিনি পড়ে যায় আপনা থেকে।

তার মানে এই, বললেন শেখর— বাড়ির লোক ছিটকিনি খুলে খুনীকে ভেতরে ঢুকিয়েছিল, ঘুরে গেলেন কিশোরের দিকে— আজ বাড়িতে এসেছিল কারা?

আমি তো রান্নাঘরে ছিলাম। কাউকে দেখিনি। রাজাসাহেব নিজেই কাউকে ঢুকিয়েছেন।

স্পেশাল চাবি ক'টা আছে?

একটা। আমার কাছে থাকে।

আলো আঁধারিতে ছেলেটার মুখ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। তবে সে যে বিলক্ষণ অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে। বললেন শুষ্ক স্বরে—চলো দেখি কোথায় খুনটা হয়েছে।

তড়িঘড়ি বললেন সেকেণ্ড অফিসার— তার আগে রানী সাহেবার সঙ্গে দেখা করে গেলে ভাল হয় স্যার! উনি ছটফট করছেন আপনার জন্যে।

চলুন।

গেস্ট হাউস থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এল ভয়ে কাঠ ছেলেটা। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল প্রকাণ্ড একটা হল ঘরে। সেখানে আলো নেই, আছে শুধু অন্ধকার। লণ্ঠনের ঝিলিক তুলে গেল দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো বল্লম, কুঠার, তলোয়ারের ওপর। ডাইনে বাঁয়ে ঝুলছে সেকালের রক্তলোলুপ বনেদিয়ানা। যেতে হলো অনেকগুলো গোলমেলে গলিপথের গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে। পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি রচনা করে গেল মাথার ওপরকার খিলেন-কড়িকাঠে।

বাড়িতে আর চাকর-বাকর নেই? শেখরের প্রশ্ন।

আজ্ঞে, আমি আর মা ছাড়া কেউ নেই, ছেলেটার ক্ষীণ জবাব— রোগের ভয়ে রাজাসাহেব সব্বাইকে পাহাড় বাংলোয় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আছি শুধু আমি আর মা।

পাঁচিল ঘেরা একটা ছোট্ট ফুলের বাগান পেরিয়ে যেতে হল এরপরেই। পৃষ্ঠবংশ সিধে করে হাঁটছে সেকেণ্ড অফিসার। বাগানের পরেই সোনালি রঙের কারুকাজ করা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন তুলে ধরে কড়া নাড়ল ছেলেটা।

খুলে গেল পাল্লা। সামনে দাঁড়িয়ে অস্থিসার এক প্রৌঢ়া।

বললে ছেলেটা— আমার মা।

ভনিতার ধার দিয়েও গেলেন না শেখর— ডেডবডি প্রথম কে দেখেছে?

আমি, ঢোক গিলছে প্রৌঢ়া। স্বর মাধুর্য একেবারে নেই।

কখন?

ঘণ্টা দু'য়েক আগে। চা নিয়ে গিয়ে দেখলাম—

কিসে কিসে হাত দিয়েছিলে?

চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে থেকে প্রৌঢ়া বললে— শুধু নাড়ি দেখেছিলাম। চলছিল না। কিন্তু শরীর বেশ গরম। আসুন এই দিকে।

এবার ঢুকতে হলো একটা গম্বুজ ঘরে। এখানে এক ধারে রুপোর বাতিদানে জ্বলছে মোমবাতি। আর একধারে লোহার কড়াইতে কাঠকয়লার অঙ্গারে পুড়ছে ওষধি গন্ধ-দ্রব্য। বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে ভীষণ গন্ধে। দম আটকে আসতে চাইছে। একদম শেষে খোদাই করা আবলুসকাঠের উঁচু পায়া একটা মঞ্চ। সেখানে রয়েছে একটা অতিকায় কাষ্ঠাসন— সিংহাসন বললেই চলে। লাল সিল্কের কুশনে হেলান দিয়ে বসে এক নিস্পন্দ কাষ্ঠবৎ নারীমূর্তি। বয়স কম করে পঞ্চাশ। পরনে রক্তলাল সিল্কের হাউসকোট। মাথার পাকা চুল চুড়ো করে বাঁধা। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল— সর্বত্র জড়োয়া ঝিকমিক করছে মোমবাতির আলোয়।

পায়ে পায়ে মঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন শেখর। ইন্দ্রনাথ আর অন্য সকলে রইল পেছনে।

প্রৌঢ়ার চোখের পাতা পড়ছে না— চক্ষুমণিকায় প্রাণ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

স্বরগাম্ভীর্য বজায় রেখে শেখর বললেন— কথা বলতে চেয়েছেন?

শুধু একটা কথা, কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রাম নিম্নগ্রাম নেই— অমানবিক স্বর— খুনীকে অ্যারেস্ট করুন।

খুনীর নাম জানেন?

নাগরাজন— বংশ শত্রু নাগরাজন। বংশ বংশ ধরে শত্রুতা করে এসেছে, এখন শেষ করে দিল শেষ মানুষটাকে মেরে।

পেছন থেকে টুক করে শেখরের পাশে এসে কানে কানে বললে সেকেণ্ড অফিসার— খালের ওপারে থাকেন— নাগরাজন বংশের শেষ বংশধর।

ঘাড় বেঁকিয়ে সিংহাসনে মূর্তির দিকে চেয়েছিলেন শেখর। এখন প্রশ্ন করলেন সেইভাবেই— মিস্টার নাগরাজন এসেছিলেন আজ রাতে?

বাইরের মহলের খবর আমি রাখি না।

আর কিছু বলবেন?

না।

ছেলেটা ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মস্ত মস্ত হলঘর আর লম্বা লম্বা করিডরের ভেতর দিয়ে। কালজীর্ণ সব কিছুই। নৈঃশব্দ্য সর্বত্র। অতীতের প্রেতাত্মা লক্ষ নয়ন মেলে যেন দেখে যাচ্ছে এই ক'জনকে। এককালের নিষ্ঠুরতা আর রক্তক্ষরণ এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায় বিরাজমান। ভৌতিক পরিবেশ চাপ সৃষ্টি করে চলেছে মনের মধ্যে। গা ছমছম করছে প্রত্যেকেরই।

একটা বিরাট দরজার দু'টো কপাট খুলে ধরল ছেলেটা। শেখর তাকে বললেন— যাও। এখানে থেকো না।

রাজা সাহেবের পরনে লাল টকটকে সিল্কের চোগু— পা পর্যন্ত লুটোচ্ছে। এই বয়েসে এহেন উগ্র বর্ণ তাঁকে মানাচ্ছে না। কিন্তু তিনি এখন পাবলিকের পছন্দ অপছন্দের বাইরে চলে গেছেন। টেবিলের পাশের লাল ভেলভেট মোড়া হাতল চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছেন সামনে দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে। টেবিলের মোমবাতির আলোয় দেখা যাচ্ছে বীভৎসভাবে বিকৃত মুখাবয়ব। মুখের বাঁ দিক ভয়ঙ্কর আঘাতে ভেঙে ভেতরে বসে গেছে, বাঁ চোখ কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে সরু সরু লাল টিশুর দৌলতে ঝুলছে বাঁ গালের ওপর। বিষম আতঙ্ক চোখেমুখে। মুখবিবর ব্যাদিত যেন মরণ চিৎকার গলা চিরে বের করতে গেছিলেন। বাঁ কাঁধের জামায় তাল তাল রক্ত। লম্বা ঢিলে হাতা থেকে দু-হাত বেরিয়ে ঝুলছে চেয়ারের দু-পাশে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ে চোট পড়েছে বাঁ কপালে— এত জোরে যে পেছনে ঠিকরে বসে পড়েছেন হাতল চেয়ারে সামনে দু-পা ছড়িয়ে। চেয়ারের পাশে মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটা খাটো হাতলের চাবুক— শুঁড় অনেকগুলো। শুঁড়ে লেগে ফুলের পাপড়ি— সেই ফুল রয়েছে টেবিলের ওপরকার ভাঙা ফুলদানিতে। মেঝেতে।

সংক্ষেপে, নিহত ব্যক্তির মুখের আধখানা গুঁড়িয়ে গেছে মোক্ষম এক মারে।

প্রায় ষাট ফুট লম্বা এই গ্যালারি এককালে নিশ্চয় চওড়া বারান্দা ছিল। সারি সারি থাম রয়েছে খালের দিকে। পরে থামগুলোর মাঝে দেওয়াল তুলে ঘর বানানো হয়েছে। টেবিলের পাশে রয়েছে একটা ফুটখানেক উঁচু কাঠের মঞ্চ। তার পাশে একটা সোফা— বসবার জন্যে। এককালে গান-বাজনা হতো নিশ্চয় এই মঞ্চে। থামের সামনে সামনে রয়েছে খান বারো চেয়ার। এছাড়া ঘরে নেই কোনও আসবাব।

খাল আর ব্রিজ এখান থেকে দেখা যায় সুস্পষ্ট।

শেখর চেয়েছিলেন বাংলার বিখ্যাত ডিকেটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্রের দিকে। তার কাছে জটিল কেস হেঁটে হেঁটে আসে—আজ সে নিজেই এসেছে জটিল কেসের মধ্যে।

কিন্তু এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। স্বপ্নালু চোখে শুধু দেখে যাচ্ছিল। শেখর অবশ্য জানেন, দধীচির হাড় দিয়ে গড়া কবি-কবি চেহারার এই মানুষটা যখন সূত্রের অশনি সঙ্কেত দেবে, তখন তা হবে অমোঘ— পার পাবে না প্রকৃত অপরাধী।

ভাবনা শেষ করে শেখরের পানে চেয়ে সুতনু সুবেশ কবিবর (আকৃতিতে) বললে মৃদু স্বরে— খুনীকে রাজা সাহেব দরজা খুলে ঢুকিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাকে বসতে চেয়ার দেননি। তারপরেই ঝগড়া লাগে, হয়তো হাতাহাতিও হয়। তাই চাবুক আর ভাঙা ফুলদানি পড়ে মেঝেতে। খুনী মুগুরের মতো ভারী কিছু দিয়ে রাজা সাহেবের মাথায় মারে। গায়ে তার অসুরের জোর— এক ঘায়ে মাথার অর্ধেক উড়িয়ে দিয়েছে।— রান্নাঘরের মেয়েটাকে ডেকে পাঠান।

সেকেণ্ড অফিসার গিয়ে ডেকে নিয়ে এল প্রৌঢ়াকে। সে যখন এল, তখন ইন্দ্রনাথ আর শেখর দু'টো চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছে। কথাও হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে। ইন্দ্রনাথ শেখরকে দিয়ে জেরা করে গেল রাঁধুনিকে।

জেরা হল এইরকম :

শেখর— তোমার নাম?

রাঁধুনি— অনসূয়া।

শেখর— এ বাড়িতে কদ্দিন আছো?

অনসূয়া— জন্ম থেকে।

শেখর— বুঝেছি। রানী সাহেবার মাথা কি খারাপ?

অনসূয়া— না। মনের ওপর চাপ পড়লে আগের কথা আর এখনকার কথা গুলিয়ে ফেলেন।

শেখর— রাজা সাহেবকে ঘেন্না করতে?

অনসূয়া— কী করে জানলেন?

শেখর— মরে গেছেন, কিন্তু ঘেন্নার চোখে ডেডবডি দেখেছো বলে। ঘেন্না করতে কেন?

অনসূয়া— নরপিশাচ ছিলেন বলে। এইভাবেই ওঁর মরণ হওয়া উচিত ছিল। ঠিক হয়েছে।

শেখর— রানী সাহেবা কিন্তু তা বলেননি। খুশি হননি— ভেঙে পড়েছেন। স্বামী যদি নরপিশাচ হয়—

অনসূয়া— উনি দেখে পাথর হয়ে গেছেন। বাইরের বিষ নিজের শরীরে ঢুকিয়েছেন—

শেখর— বাইরের বিষ?

অনসূয়া— রোজ বাজারের মেয়েছেলে নিয়ে আসতেন, নগরপল্লীর

মেয়েও বাদ যেত না...রোজ...রোজ...শুধু নাচাতেন...নোংরা নাচ...ওই স্টেজের ওপর...।

শেখর— শুধু নাচিয়ে ছেড়ে দিতেন?

অনসূয়া— সে বান্দাই ছিলেন না। নগরপল্লীর রোগ নিজের শরীরে টেনে এনেছিলেন, দিয়েছিলেন রানী সাহেবাকে... শরীর ভেঙেছে তো এই কারণেই।

শেখর— রাজা সাহেবের প্রেতাত্মা কিন্তু এখনও ঘরে রয়েছেন।

অনসূয়া— বয়ে গেল। এই হানাবাড়িতে অনেক ভূত দেখেছি, ঝড়ের রাতে... বাদলা রাতে... যাদের পিটিয়ে মারা হয়েছে এইখানে... না খাইয়ে মারা হয়েছে পাতাল ঘরে।

শেখর— সে তো একশো বছর আগের কথা।

অনসূয়া— বর্বর বংশ, চোদ্দপুরুষ।

শেখর— পিটিয়ে খুন? রাজা সাহেবের হাতেও ঘটেছে নাকি?

অনসূয়া— বছর ছয়েক আগেই ঘটেছে। চাবকে মারলেন।

শেখর— কাকে?

অনসূয়া— একটা কেনা মেয়েকে। ওই সোফায় বসে...

শেখর— থানায় তো খবর যায়নি।

অনসূয়া— এ বাড়ির কোন খবর পাঁচিলের বাইরে যায় না। বাগানের বাঁশঝাড়ের মাটিতে হাড়গোড় পাবেন।

শেখর— মেঝের ওই চাবুকটা আগে দেখেছ?

অনসূয়া— রাজা সাহেবের সাধের খেলনা।

শেখর— মিস্টার নাগরাজন মানুষ কি রকম?

অনসূয়া— রাজা সাহেবের মতো অমানুষ নন। মস্ত শিকারী। হৃদয় আছে।

শেখর— কিন্তু রানী সাহেবা বলছেন, উনিই মেরেছেন রাজা সাহেবকে।

অনসূয়া— ওঁর মাথার ঠিক নেই।

শেখর— তাহলে কে মেরেছে রাজা সাহেবকে?

অনসূয়া— বেশ্যার দালাল।

শেখর— এ বাড়িতে আগে এসেছিল?

অনসূয়া— আগে রোজ আসত নতুন মেয়েছেলে— সঙ্গে বাজনদার। পটাপট মানুষ মরছে, মেয়েদের বাজারও খালি হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আসতেন মিস্টার নাগরাজন— খালের ওপার থেকে— মিস্টার পিশারোট্টিও আসতেন।

শেখর— তিন বন্ধু?

অনসূয়া— গলায় গলায়। একই ধাঁচের—

শেখর— এই যে বললে, মিস্টার নাগরাজন রাজা সাহেবের মতো অমানুষ ছিলেন না—

অনসূয়া— আমি বলতে চাইছি, তিন বন্ধু ছিলেন আগের যুগের মানুষ— এ যুগকে সইতে পারতেন না।

শেখর— রানী সাহেবার চিকিৎসা কে করেন?

অনসূয়া— ডক্টর ল্যাজারাস।

শেখর— সে ভদ্রলোক কী রকম?

অনসূয়া— পাক্কা শয়তান। মেয়েছেলে দেখলেই লালা পড়ে। কিন্তু অক্ষম।

শেখর— কী বলতে চাইছ?

অনসূয়া— সব্বাই জানে। ঢোঁড়া সাপ।

শেখর— এখন এই পর্যন্ত। যাও।

ঘর নিস্তব্ধ। থুৎনি চুলকে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। সোফার পায়ার কাছে পড়ে থাকা ছোট্ট একটা বস্তু খুঁটে তুলে নিয়ে মোমবাতির আলোর সামনে ধরল।

রুপোয় গাঁথা লাল পাথরের একটা লম্বা ঝুলে থাকা পেনডাণ্ট দুল। হুকের কাছে লেগে সামান্য রক্ত।

নির্নিমেষে দেখতে দেখতে শেখর বললেন— এ ঘরে আজ রাতে বাইরের মেয়েছেলে এসেছিল।— ছেলেটাকে আনুন।

বেরিয়ে গেল সেকেণ্ড অফিসার।

লণ্ঠন দুলিয়ে ভয়ে ভয়ে এল সে। মজবুত বেঁটে গড়ন। কিন্তু ভীষণ নার্ভাস। গোল গোল চোখকে কিছুতেই স্বাভাবিক করতে পারছে না। কানের পাতা দু'টো বেশ লম্বা। গর্দভ-কর্ণ বলা চলে।

সোজা জানতে চাইলেন শেখর— আজ রাতে যে মেয়েটা এসেছিল, সে কে?

আঁতকে উঠল কিশোর— না... না... এ কাজ সে করতে পারে না... কতই বা বয়স...।

খুন না করতে পারে, কিন্তু খবর তো দিতে পারে। কে সে?

বার কয়েক ঢোক গেলার পর এল জবাব— দিন দশেক আগে প্রথম এসেছিল... চাকর-বাকর চলে যাওয়ার পর... লুকিয়ে... রাজা সাহেব চাননি আমি আর মা দেখে ফেলি দু'জনকে—

দু'জন এসেছিল?

আজ্ঞে। বাজনদার। তাকে সঙ্গে না নিয়ে আসত না। আমি লুকিয়ে দেখেছিলাম... গলা খুব মিঠে... মেয়েটার...

গানের গলা?

আজ্ঞে। কান জুড়িয়ে যায়।

লোকটার কথা বলো।

উঠোনে এত কম আলো... ভালভাবে দেখতে পাইনি। গাঁট্টাগোট্টা, বেঁটে। হাতে

ছোট ঢোল। মেয়েটাকে দেখতে ভাল... কম বয়স... নিরীহ মুখ। কিন্তু নেচেছে... ঢোলের আওয়াজ পেয়েছি—

আজ রাতে ওরাই এসেছিল?

আমি তো রান্নাঘরে ছিলাম।

যাও।

ইন্দ্রনাথ বললে— হ্যাঁ, ওরাই এসেছিল। পেনডেন্ট দুল তার প্রমাণ, অনসূয়া ঠারে বলে গেল, খুন করেছে দালাল। চাবুক মারতে গেছিলেন রাজা সাহেব— মেয়েটাকে— দালাল সহ্য করেনি। চাবুক কেড়ে নিয়ে পিটিয়েছে হাতুড়ি দিয়ে— ঢোল যারা বাজায়, তাদের কাছে হাতুড়ি থাকে। নিচু ক্লাস বলেই চেয়ার এগিয়ে তাকে বসতে দেওয়া হয়নি। তারপর পালিয়েছে ছোট দরজার ছিটকিনি খুলে। পতিতাপল্লীতে খুঁজলেই এ মেয়েকে পাওয়া যাবে। দেখা যাক, আর সূত্র পাওয়া যায় কিনা, আপনি দেখুন টেবিল, সোফা আর প্ল্যাটফর্ম। আমি দেখছি এদিক ওদিক।

দরদালানের মেঝে দেখতে দেখতে বাঁ দিকের জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। পোড়া মোমবাতির কটু গন্ধ ভাসছে বাতাসে। তাই বাইরের বাতাসের জন্যে তুলে দিয়েছিল বাঁ দিকের জানলায় ঝুলন্ত বাঁশের পর্দা। ডানদিকের চওড়া গোবরাটে হাত রেখে বাইরে মাথা বের করে দেখেছিল, গাড়িবারান্দার কার্ণিশ খালপাড় পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে থামের ওপর। থামওয়ালা বারান্দা যেরকম হয়। খালের কালো জল দেখা যাচ্ছে জানলা থেকে। বাঁ দিকে বাড়ির পাঁচিল শেষ হয়েছে খালপাড় পর্যন্ত—সেখানে রয়েছে চৌকোনো শান্ত্রী-ঘর। ডানদিকেও বাড়ির পাঁচিল শেষ হয়েছে খালপাড়ে—চৌকোনো শান্ত্রীঘর রয়েছে সেখানেও। এখানে খাল বাঁক নিয়েছে আচমকা—তাই আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুই শান্ত্রী ঘরের মাঝের খালপাড়ে রয়েছে ছোট ছোট গাছ আর ঝোপঝাড়। তার ওদিকে দেখা যাচ্ছে ব্রিজের মাঝের উঁচু অংশ।

খালের ওপারে উঁচু জায়গায় রয়েছে একটা দোতলা বাড়ি।

রাজা সাহেবের বন্ধু নাগরাজনের বাড়ি নিশ্চয়। সেকেলে নকশার বাড়ি। গম্বুজ আর মিনারের চুড়োগুলো মাথা উঁচিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। ইউক্যালিপটাস বীথির মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ব্যালকনি। লম্বা গাছ বাড়িটার বাঁ দিকের খানিকটা ঢেকে রেখে দিয়েছে। এদিকে রয়েছে ব্রিজ।

পাঁকের দুর্গন্ধে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ইন্দ্র। দেখল, টেবিলে ঝুঁকে পড়ে চিনেমাটির ভাঙা ফুলদানির টুকরোগুলো জোড়া লাগাচ্ছেন শেখর।

কিছু পেয়েছেন মনে হচ্ছে? কাছে গিয়ে বলেছিল ইন্দ্র।

পেয়েছি। মিস্টার পিশারোত্তি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। খুনী দাঁড়িয়েছিল সামনে, উনি বসেছিলেন চেয়ারে। কথা কাটাকাটি চরমে পৌঁছতেই চাবুক তুলে মারতে গেছিলেন—ফুলদানির ফুল লেগে যায় চাবুকের শুঁড়ে—চায়ের দাগ লাগে

চাবুকের হাতলে... তখন হাতুড়ি হাঁকাতে আসে খুনী খুব সম্ভব হাত থেকে চাবুক কেড়ে নিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে... বাঁচবার জন্যে হাতের কাছে ফুলদানি পেয়ে তুলে নিয়েও ছুঁড়ে মারার সময় পাননি মিস্টার পিশারোট্টি— মার খেয়ে পড়ে গেছিলেন চেয়ারে— ফুলদানি হাত থেকে খসে পড়েছিল মেঝেতে। পাথরে মেঝে— পড়েই খানখান হয়েছে।

জোড়া লাগানো ফুলদানির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে ইন্দ্র— আশ্চর্য।

কী আশ্চর্য?

ফুলদানির গায়ের ছবিটা। ইউক্যালিপটাস বীথি। পেছনে দোতলা গম্বুজ আর মিনারওলা বাড়ি। দোতলায় সরু বারান্দা। নীল রঙে আঁকা এই দৃশ্য একমাত্র দেখলাম রয়েছে খালের ওপারে।

মিস্টার নাগরাজনের বাড়ি।

হ্যাঁ। তাই তো শুনলাম রাঁধুনির মুখে।

কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই।

তারপর আস্তে আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ— মেঝেটা ভাল করে দেখা যাক। থামের সামনে মেঝে এখনও দেখিনি।

আমিও দেখিনি। চলুন।

সেখানেই পাওয়া গেল দলাপাকানো সাদা রুমালটা। বড় রুমাল। স্কার্ফ বললেই চলে। ঠিক মাঝখানে লেগে রক্তের দাগ।

হাতুড়ির রক্ত মুছে ফেলে দিয়ে গেছে, শেখরের মন্তব্য।

ইন্দ্রনাথ দেখল রুমালের চারকোণ ভিজে— মাঝখানটা নয়— সেখানে রক্তের দাগ প্রায় শুকিয়ে এসেছে। কিনারার সেলাইয়ের কাছে লেগে পচা শ্যাওলা।

বললে— অদ্ভুত।

কেন? শেখর এখন খর নয়ন।

এইমাত্র আমি বাঁশের পর্দা তুলতে গিয়ে বাঁ দিকের জানলা গোবরাটে হাত রেখেছিলাম— সেখানে ধুলো ছিল না। তারপর ডানদিকের জানলার গোবরাটে হাত রেখে ঝুঁকে পড়েছিলাম— হাতে ধুলো লাগল। আসুন, দেখে যান।

সত্যিই তাই। বাঁ দিকের জানলার গোবরাটে এক কণা ধুলো নেই— সদ্য পরিষ্কার করা হয়েছে। ডানদিকের তিনটে জানলার গোবরাট বিলক্ষণ ধূলিময়।

আঙুল তুলে বাইরের চওড়া কার্নিশ দেখিয়ে বলেছিল ইন্দ্রনাথ— থামের ওপর ব্যালকনি। পচা গন্ধ পাচ্ছেন? পাঁক আর শ্যাওলার গন্ধ। কেউ সাঁতরে খাল পেরিয়ে এসে থাম বেয়ে ব্যালকনিতে উঠে বাঁ দিকের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। তারই পায়ের আর গায়ের দাগ জানলার গোবরাটে কেউ মুছে সাফ করেছে পরে।

শেখর থ।

ইন্দ্র বললে—আমার টেনে খেলার অভ্যেস।

শেখর বুঝতে পারলেন না।

বুঝিয়ে দিল ইন্দ্র—কলকাতার পোলা তো ঘুড়ি ওড়ানোর অভ্যেস ছিল, আমি টেনে খেলতাম, লেটে নয়।

টেনে মানে? লেটে মানে?

টেনে মানে সুতো ছাড়তে নেই—টানতে টানতে অন্য ঘুড়ির সুতো কেটে দেওয়া। লেটে মানে, সুতো ছেড়ে ছেড়ে খেলা তাতে বড় সময় লাগে—হারজিৎ অনেকটা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে—নিজের এলেমের ওপর নয়।

তাহলে টেনেই খেলুন।

রাত বাড়ছে।

বাড়ুক। ঢিলে দিলেই খুনীরা পগারপার হতে পারে।

খুনীরা?

ডিক্সিট বেমক্কা আছড়ে পড়েননি—কাল সকালে মিসেস ডিক্সিট তো আসছে—সেখানেও টেনে খেলবেন, এখন কাকে টান দেবেন?

মিস্টার নাগরাজনকে।

ব্রিজের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নিচের খালের জল দেখছে ইন্দ্র, শেখর আর পটল। জল কম, টুকরো গাছ, পাতা প্রায় স্থির হয়ে ভাসছে, মশা বাড়ছে এই কারণেই। ভনভন করছে কানের কাছে। বৃষ্টি নামলে বাঁচোয়া।

ব্রিজ থেকে নেমে দোতলা ভিলাবাড়ির বাঁশের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল তিনজনে। ওপরের জানলাগুলো অন্ধকার। বাড়ি নিঝুম নিস্তব্ধ। গায়ের জোর দেখাল গুঁফো পটল। ভীষণ আওয়াজে নড়ে উঠল বাঁশ ফটক। গালের তিন খানা চুলে হৃষ্টচিত্তে টান দিয়ে গেল সেকেণ্ড অফিসার। খুলে গেল একতলার সদর দরজা। একহাতে জ্বলন্ত মোমবাতি উঁচু করে রাতের উৎপাতদের নিরীক্ষণ করছে যে ব্যক্তি, আকারে তাকে বনমানুষ ভ্রম হতে পারে এই আলো আঁধারিতে, গোল কাঁধ আজানু লম্বিত বাহু। যে হাতটা ওপরে তুলে মোমবাতি ধরে রেখেছে সেই হাতের চোঙার ঢিলে আস্তিন নেমে আসায় বাহুর বড় বড় লোম দেখা যাচ্ছে। কানে বড় বড় চুল, কানও বিদঘুটে বড়।

কে ওখানে?

পুলিশ-হুঙ্কারটা পটলের।

শেখর খাটো গলায় বললেন আস্তে। পরক্ষণেই গলা চড়িয়ে—আমি শেখর দারোগা।

আরে আরে আসুন, অন্ধকারে ঠাহর করতে পারিনি, পুলিশের ড্রেসও তো নেই গায়ে। হন্তদন্ত হয়ে টলমল পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন বনমানুষ আকৃতির পুরুষ—ইনি কে?

প্রশ্নটা ইন্দ্রনাথের বিচিত্র বঙ্গবেশ দর্শনের পর। পরিচয় পর্ব শেষ করে শেখর বললেন—চলুন, ভেতরে বসা যাক—

ইন্দ্রনাথ বললে—ওপরের ওই বারান্দায় যেখানে বসলে খালের ওপারে রাজাসাহেবের দরদালান দেখা যায়।

ইন্দ্রনাথের অনুমান সঠিক। দোতলায় খালের দিকে একটা ছোট ঘর। ঘরের সামনে ছোট বারান্দা। বারান্দা থেকে তো বটেই ঘরে বসে জানলা দিয়েও দেখা যায় খালের ওপারে সারি সারি থামের ওপর দরদালান। এলাহি ভাস্কর্য। পয়সা থাকলে এমন চমক দেখানো যায়। ঘরের ভেতর গদিমোড়া ডেকচেয়ারে বসলে আরও ভাল দেখা যায়।

হেসে বললেন শেখর—পেটে খুব পড়েছে দেখছি, যা গন্ধ বেরচ্ছে—

কী করি বলুন। সবে ঝিমুনি এসেছে—

এই ডেকচেয়ারে?

হ্যাঁ।

বাড়ির লোকজন কোথায়?

সব পাহাড়ে —মশার ভয়। রান্নাবান্নার মেয়েটার মা মারা গেছে— আজ রাতে সে-ও নেই। একা।

বিয়ে-থা না করলেই এই হয়।

ফুটো কাপ্তেনদের বিয়ে না করাই ভাল।

আপনি ফুটো কাপ্তেন? অঞ্চলের নামী তিনখানা বাড়ির একখানা আপনার—

দেনার দায়ে সেটাও বাঁধা পড়েছে।

বলেন কী।

নাম ভাঙিয়েই চলছে। পয়সা আছে বটে ওই পিশারোট্টি আর ডিক্সিটের। পিশারোট্টিরা ছিল এখানকার সব জমির মালিক— রাজা তো ওই কারণেই—এখন জমি জমা বেচে দিলেও হাতে যে টাকা আছে, সাত পুরুষ বসে খেতে পারবে, যদিও তিনকুলে কেউ নেই। একই অবস্থা দেখুন ডিক্সিটের। পয়সা বানাতে জানে—বাণিজ্য বোঝে—কিন্তু মরলো পা পিছলে, বংশের শেষ প্রদীপ নিভে গেল—

পিশারোট্টি বংশও নিভে গেল—একটু আগে। মোমবাতির আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল ধক করে উঠল নাগরাজনের চোখ—তার মানে?

খুন হয়েছেন—একটু আগে।

মশার ভনভনানি ছাড়া ঘরে কোনও শব্দ নেই, তারপর নাগরাজন বললে স্খলিত স্বরে—চোখ গেছে নাকি?

আধখানা মাথা সমেত একখানা চোখ।

বাকি রইল আমার মস্তক।

ছড়ার ভবিষ্যৎবাণী আপনি বিশ্বাস করেন?

না করে উপায়?

মিস্টার ডিক্সিট তো পা পিছলে পড়েছেন?

খাটে শোয়া তো বন্ধ হয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর ইন্দ্রনাথ জেরা করে গেল এইভাবে— এখান থেকে পিশারোট্টির দরদালান দেখা যায়। আপনি দেখেন?

দেখতেই হয়। দেখাতে চায়।

কে দেখাতে চায়?

চাইত। পিশারোট্টি।

কি দেখাতে চাইতেন?

নাচিয়ে মেয়েদের।

প্ল্যাটফর্মে নাচত মেয়েরা।

হ্যাঁ, বসে বসে দেখত পিশারোট্টি— সেরকম বাজারি নাচিয়ে হলে আমাকে, ডিক্সিটকে এমন কি ডক্টর ল্যাজারাসকে ডেকে পাঠাত, সে এক নরক গুলজার।

অন্য রকম নাচিয়ে হলে?

ঈর্ষা... ঈর্ষা ...জানলা খুলে দিয়ে দেখাত যাতে আমার বুক জ্বলে যায়।

এই রকম নাচিয়ে আজ রাতে এসেছিল?

লালি? হ্যাঁ, এসেছিল। চোখের ইশারা করছিল। আমার দিকে।

সঙ্গে একজন গাট্টাগোট্টা জোয়ান এসেছিল ঢোল নিয়ে?

জোয়ান সে নয়—আধবুড়ো বেঁটে। প্রতিবারই আসে লালি-র সঙ্গে।

লালি কে?

বাজারের মেয়ে ছেলে নয়। মিষ্টি চেহারা। কম বয়স খাসা গলা। এই তো কদিন আসছে—বাজারে আর বাই-নাচিয়ে পাওয়া যাচ্ছে না বলে।

রোজ চলে নাকি নাচের আসর?

রোজ। নইলে রক্ত নাচবে কেন? বুড়ো রক্ত তো—তাতানোর জন্যে চাই জোয়ানি—লজ্জা টজ্জা থাকলে চলবে না—এ অঞ্চলের যা রেওয়াজ।

বুঝেছি। লালি কোথায় থাকে?

তাতো বলতে পারব না, পিশারোট্টি এই একটা মেয়ের ব্যাপারে মন খোলে না আমার কাছে।

কারণ আপনার এ দোষ আছে বলে।

বংশপরম্পরায় আছে। এটা দোষ নয়—দরকার।

ও। আজকে লালিকে আসতে দেখেছিলেন। তার নাচ দেখেছিলেন?

তারিয়ে তারিয়ে দেখব বলে নিচে মদের বোতল আনতে গেছিলাম। এসে দেখলাম চলে গেছে।

ঘর অন্ধকার?

না, একটা মোমবাতি জ্বলছিল। ওই তো এখনও জ্বলছে।

যে চেয়ারে পিশারোট্টি বসে আছেন, সেটাই শুধু দেখতে পাচ্ছেন না। হাতুড়ি বা মুগুরের মারে মুখের বাঁ দিক নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেবিলের ফুলদানিটা আছড়ে ভেঙেছেন মরবার আগে। ফুলদানিতে যে ছবির প্যাটার্ন, সেটা আপনার

এই বাড়ির প্যাটার্ন। নাগরাজন একটু চেয়ে রইলেন। চোখ পিট পিট করলেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ এই বাড়ির প্যাটার্ন। ইউক্যালিপটাস প্যাটার্ন। এ অঞ্চলের বিখ্যাত প্যাটার্ন। চিনেমাটির ফুলদানি, প্লেট—সব কিছুতেই এই ব্লু প্যাটার্ন থাকলে বেশি বিকোয়। কারণ এর পেছনে আছে একটা রোমান্টিক গল্প। এই বাড়ি নিয়ে।

রোম্যান্টিক?

একশ বছর আগের কথা। আমার ঠাকুর্দার বাবা পাঁচ বাট সোনা দিয়ে কিনে ছিলেন একটি মেয়েকে। তার গায়ের রঙ চেহারা ইউক্যালিপটাস গাছের মতো। মিহি, মসৃণ সিধে আঙুলের লতায় পাতায় হাতে পায়ে কোমরে ঝিকিমিকি। অপূর্ব সুন্দরী। ঠাকুর্দার বাবা তখন এই ভিলা বানিয়ে ইউক্যালিপটাস গাছের সারি বসান। মেয়েটা কিন্তু ডিক্মিটদের একটি ছেলের প্রেমে পড়ে। পালিয়ে যাচ্ছিল ব্রিজের ওপর দিয়ে নৌকার দিকে, নৌকো নিয়ে একজন বসেছিল ব্রীজের শেষে একটা প্যাভিলিয়নে— সেই পটমণ্ডপ এখন নেই—ঠাকুর্দা ভেঙে ফেলেন—খুঁটিগুলো জলের মধ্যে এখনও দেখতে পাবেন। ঠাকুর্দার বাবা লাঠি নিয়ে ওদের তাড়া করেন। কিন্তু ষাট বছর বয়েসে ওই উত্তেজনা সইতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। প্যারালিসিসে ছ-বছর বেঁচে ছিলেন। এইখানে বসে ব্রিজের দিকে চেয়ে থাকতেন। ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে যায় পাহাড়ের ওপারে—তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কাহিনীটা বেঁচে আছে। বাঁচিয়ে রেখেছে এখানকার একমাত্র চিনেমাটির বাসন কারখানা—ইউক্যালিপটাস প্যাটার্ন বানিয়ে। অভিশপ্ত প্যাটার্ন।

হ্যাঁ অভিশপ্ত প্যাটার্ন। একটু থেমে বললে ইন্দ্রনাথ সেই পরমাসুন্দরীর নাম কী ছিল?

লালি।

কিছুক্ষণ সব চুপ। তারপর—তাই বুঝি এখনকার লালি মেয়েটাকে নিয়ে আপনার বুকে জ্বালা ধরাতেন মিস্টার পিশারোট্টি?

হ্যাঁ। আমরা বংশ পরম্পরায় ওঁর জমিজমা লাঠি সড়কি নিয়ে পাহারা দিয়ে গেছি। এখন শিকার নিয়ে মেতে থাকি। কিন্তু মেয়ে শিকারে উনি যে আমাদের টেক্কা মারতে পারেন—সেটাই দেখাতেন।

রূপোর পেনডেন্টে লাল পাথরের দুল দেখিয়ে ইন্দ্রনাথ বলেছিল—এই দুই দুল লালি পরত?

হ্যাঁ। কোথায় পেলেন?

ওই দরদালানে।

ফেলে গেল কেন? ও বুঝেছি।

কী বুঝেছেন?

চাবুকপেটা হচ্ছিল বলে।

চাবুকপেটা?

কশাই ওই পিশারেট্টি বংশ। শুধু নাচ নয় শুধু নষ্টামি নয়, পিটিয়ে না মারলে পুরো আনন্দ পেত না।

ফের একটু থামল ইন্দ্রনাথ তারপর বললে খুব আস্তে আপনাকে এই প্রথম দেখছি—অথচ মনে হচ্ছে যেন আগেও দেখেছি। কেন বলুন তো?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন নাগরাজন। চোখে চোখে রেখে ইন্দ্রনাথ বললে—রানী সাহেবার বিশ্বাস আপনিই খুন করেছেন সাহেবকে।

আমি!

খাল সাঁতরে গেছিলেন থামের তলায়, থাম বেয়ে উঠেছিলেন ব্যালকনিতে—একমাত্র আপনিই পারেন—শিকারী যে, গাছে চড়া অভ্যেস আছে—জানলা গলে ভেতরে ঢুকেছিলেন। বেরিয়ে এসেছিলেন জানলা গলেই। চা নিয়ে রাঁধুনি তারপরেই ঘরে ঢুকেছিল— মনিবের মৃতদেহ দেখে আঁচ করে নিয়েছিল খুনী কে—তাই জানলার সামনে দৌড়ে গেছিল—জানলার গোবরাটে জলকাদা মুছে সাফ করে দিয়েছিল— সে আপনাকে অন্য নজরে দেখে বলেই এত কাণ্ড করেছিল—হলেই বা দাসী—আপনি তো চিরকুমার মিস্টার নাগরাজন।

ঝুঁকে বসল ইন্দ্রনাথ—কেন আপনাকে এর আগেও দেখেছি মনে হচ্ছিল জানেন? রাঁধুনির ছেলেটাকে দেখতে অবিকল আপনার মতো—একই রকম বড় কান—বজ্রবাঁটুল চেহারা—রাণীসাহেবার রাগ এই কারণেই। দাসী তাঁর—

ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন নাগরাজন।

তারপর সংযত রসনায় বললেন—কিন্তু আমি তো খুন করিনি পিশারোট্টিকে।

আবার সেই পিশারোট্টি ভবন। এবার আর ভেতরে নয়। পুলিশ পাহারা ছিল দরজায়। রাঁধুনিকে ডেকে নিয়ে এল সেখানে।

তার আমসি মুখের দিকে শক্ত চোখে সেকেণ্ড কয়েক তাকিয়ে রইলেন শেখর। পুলিশের অন্তর্ভেদী চাহনি। ভেতরের কলকব্জা নিঃশব্দে নাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে।

নড়ে গেল বইকি প্রৌঢ়া। মিথ্যের ভিত নড়বড়েই হয়।

বললেন শেখর—তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিসে কিসে হাত দিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে, শুধু নাড়ি দেখেছিলাম। মিথ্যে কথা।

ঢোক গিলল অনসূয়া।

শেখর বললেন—তুমি জানলার গোবরাটটা সাফ করছিলে, জলকাদা লেগেছিল, মুছে দিয়েছিল। কার গায়ের জলকাদা?

তাকে দেখিনি।

চা নিয়ে গেছিলে, বলেছিল। মিথ্যে কথা, নিয়ে গেলে আর একটা চায়ের কাপ থাকত টেবিলে—

নিয়ে চলে এসেছিলাম—

গোবরাটটা দেখেছিলে তার আগে? কেন জানলার সামনে গেছিলে? কিসের টানে? খালের ওপারে দোতলার বাড়িটার বারান্দায় কাউকে দেখবে বলে?

অনসূয়ার ঠোঁট কাঁপছে,

তাকে বাঁচানোর জন্যে দরদ উথলে উঠেছিল? তোমার ছেলের বাবা কই?

চোখ নামিয়ে নিল অনসূয়া।

রাত দুটো।

ইন্দ্রনাথকে চোঙদারের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে শেখর ফের এলেন ভাটিখানায়। একটা বিষয় যাচাই করে নিতে। নীলকান্ত আর প্রবালের গল্প শুনিয়েই কেন পালিয়ে গেছিল পুতুল-নাচিয়ে বুড়ো।

নীলকান্তকে চেনে কাউন্টারের বুড়ো, তার কাছে পাওয়া যাবে মেয়েটার খবর, তার ভ্রূকুটি, তার বজ্রমুঠির খেল কিছুতেই যে ভুলতে পারছেন না শেখর।

যথারীতি ভাটিখানা ফাঁকা। বুড়ো ঝিমোচ্ছে কাউন্টারের টুলে বসে। শেখরের পায়ের আওয়াজে ঝিমুনি কেটে গেলেও চোখ রইল নিষ্প্রভ। তারকারন্ধ্রে আলো দেখা গেল শেখরের পরিচয় পাওয়ার পর।

ভনিতা বাদ দিলেন শেখর—মেয়েটা পয়সা নিতে এসেছিল?

আজ্ঞে।

দুই বোনকেই চেনো?

আজ্ঞে।

কোথায় থাকে?

ওদের বাবা যেখানে, ওরা সেখানে।

কোথায় থাকে বাবা?

পুতুল-নাচিয়ে ঠিকানার ঠিক নেই।

পুতুল-নাচিয়ে!

আপনার পাশেই তো বসেছিল।

শেখর অবাক। নীলকান্তা আর প্রবালের বাবা ওই পুতুল-নাচিয়ে?

আজ্ঞে, ওরে ডাক নাম নীলা আর লালি। যমজ কিনা। নীলার কানে থাকে নীল পাথরের দুল, লালির কানে লাল পাথরের দুল।

লালি! বলেই, চুপ করে গেলেন শেখর।

নাগরাজনের মুখে এই নাম তিনি শুনেছেন একটু আগে। নেচে গেছিল পিশারোট্টির দর দালানে।

লালি!

ইন্দ্রনাথ রুদ্র কিছু একটা আন্দাজ করেছে বলেই একটা টিপস দিয়ে গেছে শেখরকে বন্ধু গৃহে প্রবেশের আগে। নাগরাজন ডেকচেয়ারে ঝিমোচ্ছিলেন নিশ্চয় কারোর পথ চেয়ে। ডেকচেয়ার ঘুমোনোর জায়গা নয়, শেখর কি আজ রাতেই আর একবার যাবেন নাগরাজনের ভিলায়?

সেই একজন তাহলে লালি।

ব্রিজ পেরতে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন শেখর। স্লুইস গেট নিশ্চয় খুলে

দেওয়া হয়েছে, খালের জল আর স্থির নয়—পাক খেয়ে খেয়ে ছুটছে—বাঁকের কাছে স্রোত বেশ ভয়ঙ্কর।

মশা তাড়ানোর আয়োজন তাহলে আরম্ভ হয়েছে?

ব্রিজের নিচে ঝুলছে একটা মাত্র লণ্ঠন। ম্যাড়মেড়ে আলোয় দেখা যাচ্ছে খরস্রোত। আগাছাগুলো এখন ডুবু-ডুবু, কিন্তু কি যেন নড়ছে প্রায় ডোবা আগাছা জঙ্গলে? ঝুঁকে পড়লেন শেখর। একটা হাত জল থেকে উঠেই ফের ডুবে গেল। জল অস্থির—ঠিক সেইখানে। আ াছা আন্দোলিত—নিশ্চয় কেউ ডুবছে। তার পা আটকে গেছে জলজ লতায়। আর কিছু না ভেবেই রেলিং টপকে জলে ঝাঁপ দিলেন শেখর। জল তোলপাড় করে স্রোতের টান কাটিয়ে যেতে যেতে দেখলেন একরাশ কালো চুল ভেসে উঠেই ফের ডুবে গেল তলায়।

এত লম্বা চুল?

এবার জলে ডুব দিলেন শেখর। একটু হাতড়াতেই দু-হাতে ঠেকল জলজ জঙ্গল। জল যখন কম ছিল, তখন গজিয়েছে, শেকড় চালিয়েছে খালের মাটিতে, এখন জল বেড়েছে— কিন্তু শেকড় উপড়ে নিয়ে ভেসে যেতে পারছে না।

এইখানেই আটকে আছে একটা নারী দেহ।

বুঝলেন ডুব সাঁতার দিয়ে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে যাওয়ার সময়ে। বিবসনা।

চুল খামচে ধরে জলের ওপর মুখটা ভাসিয়ে তুলে স্তম্ভিত হলেন।

চোখ বন্ধ। বেঁচে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু চেনা যাচ্ছে। নীলকান্তা ওরফে নীলা।

এখন ওরা খালপাড়ের শক্ত জমিতে। ঝোপের মধ্যে উপুড় করে দিয়ে হাত ধরে ওঠাচ্ছেন নামাচ্ছেন শেখর, হড়হড় করে জল বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎপাত করে দিয়ে সারা শরীরে কসরৎ প্রয়োগ করে গেলেন। আরও জল বেরলো মুখ দিয়ে—খুলে গেল চোখের পাতা। প্রাণ যায়নি এখনও। জ্ঞানও ফিরে এসেছে, টনটনে জ্ঞান। ওই অবস্থাতেই সেকি দাবড়ানি—গায়ের ওপর থেকে সরুন না।

যাচ্চলে। ভাটিখানায় জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল একটু আগে। এখন মুখ খিঁচুনি প্রাণে বাঁচালাম বলে। এত রাতে সাঁতার কাটবার শখ হয়েছিল কেন, জামাকাপড় কোথায়?

অন্ধকারে যেন জ্বলে উঠল নীলার দুই চোখ—ওই বাড়িটায়। আঙুল তুলে নাগরাজনের বাড়ি দেখাচ্ছে নীলা। খালের এ পাড়েই যে উঠেছে দুজনে।

গেছিলে কেন?

কথা জিজ্ঞেস করবার আপনি কে?

আমি যে এখানকার দারোগা।

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর—ডেকেছিল বলে।

তোমাকে? শেখরের মনে পড়ে যায় ইন্দ্রনাথের ইঙ্গিত—নাগরাজন নিশ্চয় কারও প্রতীক্ষায় ছিলেন, প্রতীক্ষা তাহলে নীলার জন্যে।

কিন্তু ভুল ভাঙল জবাব শুনে—আমাকে না—আমার বোনকে। লালিকে?

কেন?

নাচ দেখবে বলে। আরও কিছু। হাড় বদমাস। তাই আমি গেছিলাম টাইট দিতে।

দিয়েছ?

পারলাম না। গায়ে অসুরের জোর। জ্যাকেট-ফ্যাকেট ছিঁড়ে দিতেই পালাচ্ছিলাম।

তুমি না বল মেয়ে?

সময় যে পেলাম না। হয়েছে? এবার উঠুন। ওহো! দাম চাই? প্রাণে বাঁচিয়েছেন বলে?

বাজে বকোনা। যাবে কী করে? জামাকাপড় তো—কথা আটকে গেল মুখে। কারণ, মুখ দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে নীলা।

এখন দুজনে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে, যেন আপন মনে বললে নীলা—বাবা ঠিকই বলে, গরিবের মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে না। আমি তো চাইনি। তুমিই—

দাম দিলাম। এই ভাবেই তো দাম আদায় করেন।

আমি করি না। বিয়েই করিনি।

সে কী!

এবার করব।

বউ ঠিক হয়ে গেছে? তাকে ছেড়ে আমাকে—

তুমিই সেই বউ।

শেখর নিজের জামা আর ট্রাউজার পরিয়ে দিল নীলাকে। নির্জন পথ বেয়ে এল চামুণ্ডা মন্দিরের কাছে।

থমকে গেল নীলা—আর যাবেন না। দুর্নাম রটবে।

আবার কবে কখন দেখা হবে?

একটু ভেবে নীলা বললে—কালকে দুপুরে ভাটিখানায়। বড় ঘরের মেয়ে তো নই—পরপুরুষের সঙ্গে এখানে ওখানে দেখা করা যায়।

গলি ঘুঁজির মধ্যে মিলিয়ে গেল দীর্ঘাঙ্গী নীলা। কিন্তু অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে পারেননি শেখর ঘটনার ঘনঘটায়।

পরের দিন সকালে চোঙদারের বাড়িতে গিয়েই অবশ্য ইন্দ্রনাথকে শুনিয়ে দিলেন রাতের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। শুধু চেপে গেলেন জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলায় ওঁদের খেলার কথা। চোঙদার অবশ্য মুখ মুচকে বলেছিল। প্রতি অঙ্গ কাঁদে।...

ফচকেমি ছাড় চঞ্চল, ইন্দ্রনাথ বিরক্ত—শেখর সাহেব, মিস্টার নাগরাজনের বাড়ি আর যাননি?

সবই তো শুনে ফেললাম নীলার মুখে, কথাটা বলতে গিয়ে ঈষৎ রক্তিম হয়েছিলেন শেখর।

যেন না দেখে ইন্দ্রনাথ বলেছিল আপন মনে—বল-মেয়ে এত সহজে ছেড়ে দিল? পালিয়ে এল? এক কাজ করুন। লালিকে খুঁজুন। সব জানবেন। নিচে কেউ এল মনে হচ্ছে? বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে দেখলেন শেখর, পালকি থেকে নামছেন এক মহিলা?

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—মিসেস ডিক্সিট।

বলেই দ্রুত বলে গেলেন—সেকেণ্ড অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মিসেস ডিক্সিটের পূর্ব পরিচয়। উনি জানেন না। তেরো বছর আগে হঠাৎ বউ হয়েছিলেন মিস্টার ডিক্সিটের। বয়স এখন তিরিশ। সাংঘাতিক সুন্দরী। কিন্নরকণ্ঠী।

চোঙদারের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ শুধু বলেছিল—তোর রান্নাঘরে চিনেমাটির চমৎকার প্লেট দেখেছি, নীলরঙের আঁকা ইউক্যালিপটাস প্যাটার্ন ওই প্লেটে যা হয় কিছু খাবার এনে রাখবি মিসেস ডিক্সিটের সামনে। হাঁ করে তাকাস না—যা।

ঘটনার আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত—এই দুটি মহা গুণ ইন্দ্রনাথের আছে। তখন ও জ্যামিতিক ছকে ভেবে নেয়, অমুক পয়েন্টের সঙ্গে অমুক পয়েন্ট জুড়ে সোজা লাইন টানলে কোন পয়েন্টে ঠেকেছে। সম্ভাবনাময় সেই পয়েন্টেই মানসিক শক্তি সংহত করে পূর্ণমাত্রায়। ও বলে, এই হলো যুক্তির রেখাচিত্র। অপরাধী অন্বেষণের সময়ে এই ভাবেই তদন্তের ডালপালা ছড়িয়ে দিতে হয় আপাতত অবিশ্বাস্য ক্ষেত্র অভিমুখে। এটা ওর নিজস্ব তত্ত্ব। অপরাধ বিজ্ঞান পড়ে শেখেনি। মিসেস ডিক্সিটের সামনে ইউক্যালিপটাস প্যাটার্নের প্লেট হাজির করেছিল এই মতলব নিয়েই।

এই নারী এর মধ্যেই রহস্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে ফেলেছেন। তিনি যুবতী। সুন্দরী কিন্নরকণ্ঠী। এই শহরের তিন নগরপতির একজন তাঁকে সহধর্মিনী বানিয়েছেন যখন তিনি ছিলেন সপ্তদশী। বৃদ্ধকে স্বামীত্বে বরণ করলেন অথচ তাঁর পূর্ব ইতিহাস বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অজানা। বৃদ্ধকে স্বামীত্বে বরণে তাঁর আপত্তি নেই। আবার ডক্টর ল্যাজারাসের মতো পৌরুষহীন পুরুষের সঙ্গে চেনাশোনা আছে বিলক্ষণ। তাঁর বসন্ত-কাননে এখনও বসন্ত-সমীর বইছে, সৌরভ-সুধা কি পৌঁছায়নি নাগরাজন নিকেতন? অথবা পিশারোট্টি ভবনে? তিন বন্ধুই তো নারীতনুর রহস্য পিপাসী। সপ্তদশ বসন্তের একগাছি মালা পরলেন ডিক্সিট—সুবাসে মাতাল করেননি কেন দুই প্রাণ প্রিয় সখাকে—যে সুবাস ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন বলেনি কি তাদের কানে কানে—লও লজ্জা, লও বস্ত্র, লও আবরণ। এ তরুণ তনুখানি লও চুরি করে পরকীয়ার সুখশ্রমে দাও মোরে ভরে।

সেই পরমা সুন্দরী এখন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। এই তিরিশ বছরেও তাঁকে সুতনুকা বলা চলে অনায়াসেই। গাত্রবর্ণে গোলাপী আভা, টানাটানা চোখ আনত, কিন্তু বিষাদ ভারাক্রান্ত নয়। আঙুলে নীল পাথরের আংটি। কানে নীল পাথরের দুল, শেখরের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন কিন্নর কণ্ঠে—আপনিই দারোগা, দেখা করতে চেয়েছিলেন?

শেখরের পরনে এখন দারোগা উর্দি। বললেন—বসুন। শহর জুড়ে মৃত্যুর দামামা বাজছে—রেহাই পেল না দুটো বড় ফ্যামিলি।

দুটো চেয়ারে বসতে বসতে ধনুক ভুরু তুললেন শ্রীমতী ডিক্সিট। কণ্ঠে যেন অপেরা মিউজিক।

কাল রাতে দেহ রেখেছেন রাজাসাহেব। খুন। প্রসাধনচর্চিত চোখের পাতা কেঁপে গেল—অসৎ। প্রসাধন লিপ্ত অধর দ্বিধাবিভক্ত হল সামান্য।

পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন তারের যন্ত্রের সুরে—এখানে মৃত্যুর হাওয়া। তাই আমি চলে যাচ্ছি পাহাড় ভিলায়। স্বামীর ভাইপোর কাছে। ওয়ারিশ আমি একা—তবুও কিছু কথা দরকার।

চোঙদার ব্যথিতবদনে গুলি চোখে এতক্ষণ সুন্দরীকে গিলছিল। এবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিল চিনেমাটির ইউক্যালিপটাস প্যাটার্নের প্লেট—তাতে রয়েছে দুটি কেক।

শ্রীমতির চোখ ঘুরে গেল প্লেটের দিকে। অমনি শঙ্কার চকিত শিহরণ দেখা দিল দুই কৃষ্ণ নয়নে।

প্লেট স্পর্শ করলেন না। উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—সদ্য বিধবা হয়েছি। কিছু আচার মেনে চলতে হচ্ছে। দেখা করতে চেয়েছিলেন—দেখা করে গেলাম। পোস্টমর্টেম কি শেষ হয়েছে? বডি পেলেই দাহ করা যেত।

দেখছি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন শেখর। নমস্কার বিনিময়ের পর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন সুতনুকা। যাবার আগে অপাঙ্গে দেখে গেলেন ইন্দ্রনাথকে।

চিবুক চুলকে ইন্দ্রনাথ বললে সহর্ষে—ইউরেকা। নীল প্লেট ওর প্রাণে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। ইউক্যালিপটাস ভিলা ওঁর মনে নাড়া দিয়েছে। নীল রঙ কিন্তু প্রিয়—কানে আর আঙুলের পাথরে তা ধরে রেখেছেন। শেখর সাহেব, ওঁর পেছন পেছন আমরা যাব।

কোথায়?

ওঁর বাড়িতে—ডিক্সিট ভবনে। চঞ্চল, মুখখানা বাংলা পাঁচ-এর মতো করে আছিস কেন রে?

কী কপাল মাইরি, আমার এই চেহারাটা একবারও চেয়ে দেখলেন না—অথচ খাতির করে প্লেট বাড়িয়ে দিলাম।

গন্ডদেশের আঁচিলের তিনখানা চুল প্রবলবেগে আকর্ষণ করতে করতে বিপুল বেগে প্রবেশ করল সেকেন্ড অফিসার রামানুজ পটল। পেয়েছি, পেয়েছি, লালি ছুঁড়িকে পেয়েছি।

ল্যাংগুয়েজ...ল্যাংগুয়েজ...অন ডিউটি প্রপার ল্যাংগুয়েজ ইউজ করবেন। শেখরের কণ্ঠে মৃদু তিরস্কার—কোথায় পেলেন?

ঠিকানা পেয়েছি। চামুণ্ডা মন্দিরেব ওদিকে ওই যে গাছপালার মধ্যে ছোট ছোট বাড়ি আছে—ওইদিকে থাকে। চর পাঠিয়েছি।

ইন্দ্রনাথের সহাস্য বদনের দিকে না তাকিয়ে শেখর বললে—সেতো আমিও জানি, দুই যমজবোন ঢোলদার বাপকে নিয়ে ওদিকেই থাকে। খবরটা আমিই আপনাকে দিতে যাচ্ছিলাম। কিভাবে জানলাম? সে অনেক কথা। আপনি লোক লাগিয়েছেন যখন...ভালো কথা, এই মিসেস ডিক্সিট ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে তলিয়ে খবর নিন। সপ্তদশী তরুণী কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন এবং—

বলে, তাকালেন ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ পাদপূরণ করলেন এইভাবে—সেখান থেকেই সোজা ডিক্সিট মশায়ের ঘরে উঠেছিলেন কিনা।

ওরা এখন ডিক্সিট মশায়ের বাড়িতে। লাইব্রেরি ওঠার যে সিঁড়ির নিচে ভদ্রলোকের চূর্ণ করোটি বিগত প্রাণ কলেবর পাওয়া গেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে। শ্রীমতী ডিক্সিট আশা করতে পারেননি দুই মূর্তিমান ওঁর পিছন পিছন চলে আসবে। তাই তিনি ভয়ানক চমকে উঠেও মুহূর্তের মধ্যে মুখভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে ফেললেন। এখন তিনি শশব্যস্ত হয়ে দেখাচ্ছেন, সিঁড়ির ওপরে কোনখানে জ্বলন্ত মোমবাতি পড়ে নিভে গেছিল। গড়িয়ে নেমে আসার সময়ে সিঁড়ির কোন ধাপে একপাটি চটি খুলে পড়েছিল। রেলিংয়ের কোন ছুঁচোলো ডগায় মাথা ঠুকে করোটি গুঁড়িয়েছিল। মৃতদেহ কোনখানে কিভাবে পড়েছিল। তখন তিনি দারোগার দিকে যত না তাকাচ্ছিলেন, তার চেয়ে বেশি তাকাচ্ছিলেন ইন্দ্রনাথের দিকে। তার ভাবলেশহীন মুখ দেখে কিছুই আঁচ করতে না পারলেও অণু পরমাণু দিয়ে নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, দেবকান্তি এই মানুষটা রঞ্জনরশ্মি চক্ষু দিয়ে সব কিছুই দেখছে। অভিনয় ক্ষমতায় কেউ যে কমতি নয়, তারই মহড়া চলছে।

মিসেস ডিক্সিটের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, অচিরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ বললে—লাইব্রেরি ঘরটা দেখব—যে-ঘর থেকে উনি বেরিয়েছিলেন।

লাইব্রেরি ঘর।

এই ঘরেই বসেছিলেন ডক্টর ল্যাজারাস।

এরা বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকে পুলিশ শান্ত্রীকে নিয়ে চলে এসেছিল লাইব্রেরি ঘরের সিঁড়ির নিচের দরজায়। প্রহরা ছিল এই দরজায়—প্রাঙ্গণের সামনে দরজা।

এই দরজা দিয়েই ইন্দ্র আর শেখর ঢুকে যখন সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে খাড়াই সোপানের ওপরে তাকিয়েছিল, দেখেছিল চাতালে বেগে বেরিয়ে এলেন ডিক্সিট মশায়ের সদ্য বিধবা—রঙে রসে যেন উথলে উঠছিলেন—ছিলেন এতক্ষণ লাইব্রেরি ঘরেই—সিঁড়ির নিচে কথাবার্তার আওয়াজ কানে যেতেই বেরিয়ে এসেছিলেন। যাঁদের সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে এলেন, সেই তাঁদের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অণুক্ষণের জন্যে হকচকিয়ে গিয়ে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন।

কিন্তু একবারও বলেননি, কঠিন বস্তু ডক্টর ল্যাজারাস উপবিষ্ট রয়েছেন গ্রন্থাগার কক্ষে।

ইন্দ্র আর শেখরের তা জানা ছিল না।

ল্যাজারাসও জানতেন না, কারা এসেছে। লাইব্রেরির দু-পাশের দেওয়ালের মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত তাক বোঝাই বইগুলির সামনে ঘাড় উঁচু করে বই দেখছিলেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, বই ওর বন্ধু। পণ্ডিত মানুষ তো। অকারণে এ অঞ্চলের সেরা বদ্যি হননি। দোষ একটাই, তা আগেই বর্ণিত হয়েছে।

এই দোষের আকর্ষণেই উনি এসে দোতলার গ্রন্থাগার কক্ষে খোশ গল্প জুড়েছিলেন নিশ্চয় সদ্য পতিহীনা পরমার সঙ্গে। পুলিশের চোখ এড়িয়ে। কিভাবে, তা ইন্দ্রনাথের নজরে এসে গেল অচিরেই।

পুলিশ দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলেন ল্যাজারাস। কিন্নরকণ্ঠী শ্রীমতী ডিক্সিট তো তাঁকে সতর্ক করবার সময় পাননি। তিনি আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওদের নিচের তলায় কথায় কথায় আটকে রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু বাক্য বীরাঙ্গনার সঙ্গে বাক্য সমরে অবতীর্ণ না হয়ে ইন্দ্রনাথ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তার যুক্তির রেখাচিত্র মনে মনে সাজাচ্ছিল।

তাই দেখতে চেয়েছিল লাইব্রেরি ঘর।

দেখতে পেল, ডক্টর ল্যাজারাসকে।

কিন্নরকণ্ঠী অপরূপা এতটুকু সময় নষ্ট না করে মুহূর্তে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন ল্যাজারাসের দিকে—কখন এলেন?

ধরিয়ে দিলেন কী বলতে হবে। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম ল্যাজারাসের—চতুরিকা শ্রীমতী ডিক্সিটের তুলনায় কম। তাই যখন তিনি কথার বাক্স হাতড়াচ্ছেন জবাবের অন্বেষণে, ক্ষুরবুদ্ধি ইন্দ্রনাথ ছুঁড়ে দিল তিন শব্দের বড় মারাত্মক একটা প্রশ্ন—কোনদিক দিয়ে এলেন?

চোখ প্রায় ছানাবড়া হয়ে এল ডক্টর ল্যাজারাসের।

মসৃণ কণ্ঠে বলে গেল ইন্দ্রনাথ—অন্দর মহল থেকে নিশ্চয় আসেননি। লাইব্রেরির সিঁড়ি বেয়েও ওঠেননি—পুলিশ কনস্টেবলের কাছে আগেই খবর

পেতাম। তাহলে এই ঘরে ঢোকবার আর একটা পথ আছে। যে পথ দিয়ে আপনি এসেছেন। কোথায় সেটা?

যন্ত্রচালিতের মতো ডান হস্ত তুলে তর্জনী নির্দেশে দেওয়ালের গায়ে একটা গোল দরজা দেখালেন ল্যাজারাস।

সাত তাড়াতাড়ি বললেন কিন্নরকণ্ঠী কণ্ঠে লহরা তুলে—ড্রেসিং রুম দিয়ে এলেন? বেশ করেছেন। বলেই ফিরলেন ইন্দ্রনাথের দিকে। এই প্রথম সেয়ানে সেয়ানে লড়াই শুরু হলো। কথার বাণে আর চোখের বাণে—আমার স্বামী ওই ঘর দিয়েই ভিজিটর ঢোকাতেন, বের করে দিতেন—বাইরের কাউকে ডাকাডাকির দরকার হতো না। সিঁড়ি দিয়ে নামলেই বাগান। বাগানের পর পাঁচিল। দরজা খুললেই রাস্তা। ঘরটাকে বলা যায় ওয়েটিং রুম। কিন্তু অনেক দিন সাফসুতরো হয়নি। লোক ডেকে সাফ করিয়ে দিই—

চোখের বাণে টলে না গিয়ে এবং কথার বাণে মজে না গিয়ে বাঁ হাতে চুনোট করা কোঁচার খুঁট পাঞ্জাবির পকেটে রাখতে রাখতে সটান এগিয়ে গিয়ে গোল দরজা খুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ।

ঘরটা ছোট। একপাশে বিরাট পালঙ্ক। আর এক পাশে রুপোর ফ্রেমে গোল কাঁচ বসানো মস্ত আয়না সহ ড্রেসিং টেবিল। সব ফার্নিচারেরই পায়া সিংহের থাবার অনুকরণে—রোজউড দিয়ে তৈরি। সেকেলে বনেদিয়ানার ছাপ বিছানার চাদরেও—যদিও এখন তা লণ্ডভণ্ড। ঘরে কোনও চেয়ার নেই। খাট আর ড্রেসিং টেবিলের মাঝখান দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে ওদিকের দেওয়ালের দরজার সামনে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। এখানেও সেই গোল দরজা। ভেতরের খিল নামিয়ে পাল্লা খুলে দিতেই দেখা গেল ফুলের বাগান—গোল দরজার সামনে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় সেখানে—বাগানের পর পাঁচিল—পাঁচিলের গায়ে একটা ছোট দরজা—এখন ভেতর থেকে খিল তোলা।

এ ঘর নিস্তব্ধ। ইন্দ্রনাথ পাথরের মূর্তির মতো সেদিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে চলে এল ড্রেসিং টেবিলের সামনে—যেন বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকবার সময়ে ভেবে নিয়েছে কর্মপন্থা। সাজবার জিনিসপত্র সবই প্রাচীন আমলের—এ বাড়িতে আধুনিকতার প্রবেশ নেই কোথাও। এহেন আধুনিকা বীতরাগ অপিচ দেখেনি ইন্দ্রনাথ। সবই প্রমীলা প্রসাধনের দ্রব্য। একটা এক ফুট লম্বা, দু ফুট চওড়া, ছ ইঞ্চি মোটা কাচের শিল। শিল বলাই সঙ্গত বস্তুটাকে। রঙ মেশানোর বস্তু। তার ওপর লেগে খানিকটা কালো রঙ। ভুরু আঁকবার সরু তুলির ডগায় লেগে কালো রঙ। পাশেই রুপোর বাটিতে একটু রুপোলি জল—রঙ গোলবার জন্যে। ভুরু যাতে চিকমিক করে—ঝিলিক মেরে যায় ভ্রু ভঙ্গিমার সময়ে। ইন্দ্রনাথ শিল সাইজের স্ফটিকখণ্ড তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলে। এবার এল বিশাল পালঙ্কের সামনে। লাটখাট কিংখাপের চাদরের দিকে একটু চেয়ে থেকে নাক নামিয়ে শুঁকল চাদরের গন্ধ। না শুঁকলেও চলত—সে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল খাটের পাশে দাঁড়িয়ে।

তারপরেই হেঁট হয়ে বসে পড়ল খাটের একটা সিংহ-পায়ার কাছে—সেখানে লণ্ডভণ্ড চাদরের একটা কোণা লুটোচ্ছে। সাদা পাথরের মেঝেতে কিছু একটা দাগ লেগেছিল—মোছা সত্ত্বেও বহিরেখা পুরো মোছেনি। চাদরের যে কোণটা লুটোচ্ছিল, তা তুলে নিয়ে দেখল যে-জায়গাটা মুড়ে সেলাই করা হয়েছে, সেই জায়গাটা। বাইরের দিকে কালচে দাগ রগড়ে তুলে ফেলা হয়েছে—কিন্তু উল্টোদিকে দাগ ফুঁড়ে বেরিয়েছে—সেখানটা মোছা যায়নি। চাদরের কোণ যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

এই সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রয়োজনে যে শরীরি আতঙ্ক হয়ে যায়, দধীচি-অস্থিতে তখন বিদ্যুৎ খেলে। তখন থাকে নির্বিকার—কণ্ঠে জাগ্রত হয় বজ্রের অট্টহাস্য। ইন্দ্রনাথ রুদ্র কিংবদন্তী হতে চলেছে এই সব কারণেই।

ভয় পেলেন শেখর। ভয় পেলেন কিন্নরকণ্ঠী। ভয় পেলেন ল্যাজারাস। কণ্ঠের রণদুন্দুভি অসাড় করে আনল এঁদের প্রত্যেককে পরমুহূর্তে—চমৎকার! চমৎকার! অতীব চমৎকার! এখন বাকি রইল শুধু বাড়ির কর্তার পড়ার টেবিলটা।

বলতে বলতে হনহনিয়ে ইন্দ্র চলে এল আবলুস কাঠের তৈরি পেল্লায় পড়ার টেবিলের সামনে। ইলাহি প্যাটার্নের টেবিল। জমকাল নকশার জলুস চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। পাশের পিঠ উঁচু লাল কুশনের গদিমোড়া টেবিলটাও অনুরূপ। এই চেয়ারে যিনি বসতেন তিনি কেতাব প্রিয় ছিলেন বলেই টেবিলের ওপর খোলা রয়েছে চামড়ায় বাঁধাই একটা প্রকাণ্ড বই। পড়ছিলেন নিশ্চয় মরণ আসবার আগে—কিন্তু লিখছিলেন না। কারণ, মান্ধাতার আমলের রুপোর দোয়াতদানির ঢাকনি বন্ধ। পালক-কলম যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা অবস্থায় রয়েছে। টেবিলের কোথাও ঝরনা কলম অথবা ডট পেন নেই। মডার্ন লেখনি দু'চক্ষের বিষ ছিল এই বাড়ির নীলরক্তের মানুষটার।

এতক্ষণ পরে এই প্রথম কিন্নরকণ্ঠী ললনার চোখে চোখ রাখল ইন্দ্রনাথ। ওর চোখে এখন কমল হীরের ঝলক—কণ্ঠে যেন অকস্মাৎ বাজ পড়ার কড় কড়াৎ আওয়াজ—ঘরে ঘরে মোমবাতি জ্বালায় যে, তাকে ডাকুন।

এল সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। বিজয় সিংহের দেশের মানুষ এই বাঙালিবাবুটার ফুলবাবু চেহারার আড়ালে যে রণ কৃপাণ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা সে টের পেয়েছে স্বীয় শরীরের প্রতিটি কোষের কম্পন থেকে। ইন্দ্রনাথ তাকে কাড়া-নাকাড়া গলায় ইংরেজিতে যা জিজ্ঞেস করেছিল, শেখর তার তর্জমা শোনাতেই তড়িঘড়ি জবাবটা দিল এইভাবে—আজ্ঞে লাইব্রেরি ঘরে আগে মোমবাতি বসিয়ে একটা মোটা মোমবাতি নিয়ে সন্ধ্যে সাতটায় চলে যাই সিঁড়িতে—যাতে ঘণ্টা পাঁচেক জ্বলে থাকে।

তাকে বিদায় দিয়ে রণং দেহী ইন্দ্রনাথ এবার ঘুরে দাঁড়াল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা দু'টি মূর্তির দিকে। তাঁদের একজন কিন্নরকণ্ঠী বিধবা—অপর জন অক্ষম নারীপিয়াসী ডক্টর ল্যাজারাস।

বললে, গুরু গুরু গলায়—মার্ডার। পা পিছলে পড়ে মাথা ফাটাননি—পিটিয়ে মাথা ফাটানো হয়েছে। ওই ঘরে—যার একটা নাম ওয়েটিং রুম—কিন্তু ওয়েট করার জন্যে একটা চেয়ারও রাখা হয়নি—আছে শোবার জন্যে পালঙ্ক। যে পালঙ্কে লেগে রয়েছে যুঁইয়ের আতরের খোশবাই—একই খোশবাই শ্রীমতীর বসনেও, প্রিয় খোশবাই কেউ বদলায় না। ডাক্তার সাহেব ওই ঘর দিয়ে আজকে এসেছিলেন মহিলা সঙ্গের জন্যে মহিলারই আমন্ত্রণ আর আপ্যায়ণ গ্রহণ করে। কাল রাতেও এসেছিলেন পালঙ্কে প্রতীক্ষা করার জন্যে। এমন সময়ে বাড়ির কর্তার প্রবেশ ঘটে। ড্রেসিং টেবিলের ভারী কাঁচ তুলে নিয়ে এক ঘা মাথায় মারতেই খুলি ফেটে ভেতরে ঢুকে যায়। রক্ত পড়েছিল কিংখাপের চাদরের কোণে আর পাথরের মেঝেতে। মেঝের রক্ত সাফ করা হয়েছে। চাদরের বাইরের রক্তও মোছা হয়েছে—কিন্তু মোটা চাদরের উল্টো পিঠে দাগ ফুটে বেরিয়ে রয়েছে—তা আর তোলবার সময় পাওয়া যায়নি। তাই সাফসুতরোর কথা বলছিলেন ম্যাডাম—যিনি রুপোলি জলে কালো ভুরু এঁকেছিলেন কাল রাতে—এঁকেছেন এখনও।

মিস্টার শেখর, মিস্টার ডিক্সিটের গালে কালো ধ্যাবড়া দাগ লেগে থাকার কারণ ওই কাঁচের ব্লক।

এইবার নিনাদ জাগ্রত হলো শাণিত চক্ষু কিন্নরকণ্ঠীর কণ্ঠে, উচ্চগ্রামে—গল্পকথা। প্রমাণ নেই।

আছে, সপেটা সমান নিনাদে বলে গেল ইন্দ্রনাথ—সন্ধ্যে সাতটায় ঘণ্টা পাঁচেকের জন্যে যে মোমবাতি জ্বলার কথা সিঁড়িতে—সেই মোমবাতি জ্বলেছে রাত বারোটা পর্যন্ত। সিঁড়ি অন্ধকার ছিল না রাত দশটায়। তা সত্ত্বেও নাকি মোমবাতি নিয়ে গেছিলেন মিস্টার ডিক্সিট। ইউ ড্যাম লায়ার—বোথ অফ ইউ! শেখর সাহেব, এরপর যা করবার তা আপনি করবেন। আমি—

ঝড়ের বেগে ঘরে এলেন রামানুজ পটল আঁচিলের তিনখানা চুল প্রায় ছিঁড়ে ফেলেন আর কি—সুইসাইড করেছেন!

কে? সিধে হয়ে গেলেন শেখর।

রানী সাহেবা!

এ ঘরের কড়িকাঠ উঁচু বটে, কিন্তু এ-দেওয়াল থেকে ও-দেওয়াল পর্যন্ত কাঠের ব্যাটম লাগানো আছে কড়ির মালার ঝালর-পর্দা ঝোলানোর জন্যে। পর্দা সরানো দু-পাশে। ব্যাটমের মাঝখানে সিল্কের দড়িতে ফাঁস বানিয়ে গলায় লাগিয়ে ঝুলে পড়েছেন শ্রীমতী পিশারোট্টি। পায়ের নিচে উল্টে পড়ে রয়েছে একটা টুল।

ঝুলন্ত মূর্তি ঘিরে দাঁড়িয়ে শেখব, ইন্দ্রনাথ আর অনসূয়া।

শেখরেব প্রশ্ন—কখন দেখলে?

অনসূয়া বললে—এই তো ঘণ্টাখানেক আগে।

একমাত্র ইনিই বলেছিলেন, রাজা সাহেবকে খুন করেছেন মিস্টার নাগরাজন।

গোবরাট মুছে সাফ করেছিলে তুমি—খুনীকে বাঁচানোর জন্যে। তাঁকে বাঁচানোর জন্যে এঁকেও তুমি ঝুলিয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলে, তাই না, অনসূয়া?

পুলিশ ফাঁড়ি।

লালি আর তার বাবা পুতুল-নাচিয়ে হাজির সেখানে।

প্রবল বিক্রমে আঁচিলের চুল তিনখানা প্রায় উৎপাটন করার উপক্রম করেছে সেকেন্ড অফিসার। লোকজন লাগিয়ে চামুণ্ডা মন্দিরের ওদিকের জঙ্গলের মধ্যের এক হানাবাড়ি থেকে ধরে এনেছে লালি আর তার বাবাকে। এখন তারা রয়েছে অন্য ঘরে।

দারোগার ঘরে রিপোর্ট দিচ্ছে সেকেণ্ড অফিসার।

—স্যার, একদম ফাঁকা একতলা বাড়ি। বাড়িময় গাছ গজিয়েছে—কেউ ঘেঁষে না ভূতের ভয়ে। আমার লোক বাইরে থেকে শুনেছিল বাঁশির আওয়াজ। ভেতরে গিয়ে দেখলে, বাপ বাঁশি বাজাচ্ছে—ছোট মেয়ে লতিয়ে লতিয়ে নাচছে।

ছোট কি বড় জানলেন কী করে? যমজ তো। শেখর বললেন।

আজ্ঞে, এক মিনিটের ছোট বড়। বাপের কাছে শুনবেন।

বড় মেয়ে কোথায়?

আধঘণ্টা আগে সরে পড়েছে।

ডাকুন বাপ বেটিকে। না না, শুধু বাপকে।

শেখরের তীব্র চাহনির সামনে নুয়ে পড়েছিল আধবুড়ো পুতুল নাচিয়ে।

কণ্ঠস্বর ছিল তীব্রতর—চিনতে পারছো?

হ্যাঁ। ভাটিখানায় দেখেছিলাম।

তখন পুলিশ ড্রেস ছিল না। তাই দেখিয়ে ফেলেছিলে ম্যাজিক বাক্সের ছবি। তাই না?

আজ্ঞে।

দু'টো জায়গাই পরে দেখলাম। তখন মনে করতে পারিনি—

ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন—কোথায় দেখলেন?

শেখর বললেন—চাবুক মারার জায়গাটা রাজা সাহেবের দরদালান— তারপরে ছবিটা মিস্টার নাগরাজনের দোতলা ইউক্যালিপটাস ভিলা।

ইন্দ্রনাথ চুপ।

শেখর বলছেন পুতুল-নাচিয়েকে—প্রথম ছবিটা পুরো দেখালেন, দ্বিতীয় ছবিটা দেখালেন না—ইচ্ছে করে মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন। তাই না?

হ্যাঁ।

প্রথম ছবির ঘটনা তো ঘটে গেছে। দ্বিতীয় ছবিটার ঘটনা তো কাল্পনিক। ইচ্ছে হলে দেখাই, মন কেমন করলে দেখাই না।

অর্থ?

প্রথম ছবিতে যাকে দেখেছিলেন, চাবুক খাচ্ছে যে উপুড় হয়ে শুয়ে—সে

আমার বউ।

জেরায় ক্ষণেক বিরতি। অতঃপর—বউ?

যে চাবুক পেটাচ্ছে, সে রাজা সাহেব।

খুলে বলো।

রাজা সাহেবের চাকরি করতাম। বাজারে অনেক দেনা করে ফেলেছিলাম। রাজা সাহেব সব মিটিয়ে দিয়ে আমার বউকে কিনে নিয়েছিলেন। এই আদিম সমাজে সব হয়। আমার কিছু বলার ছিল না। ছ বছর আগে বউয়ের নাচ দেখেই শুধু শখ মেটেনি রাজা সাহেবের—পিটিয়ে মেরে বড় আনন্দ পেয়েছিলেন। পশু...আস্ত পশু...আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে দুই মেয়েকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকি। ভেতরের আগুন কিন্তু নেভেনি। কার্ড বোর্ডে ছবি এঁকে সেই দৃশ্য দেখাতাম আর প্রতিহিংসার আগুন মনের মধ্যে জিইয়ে রাখতাম! এই নরপশু বড়লোক তিনটের বিরুদ্ধে লোক খেপাতাম। ছড়াটা আমিই বানিয়েছি। ছোট মেয়েকে দিয়ে গাইয়ে শুনিয়েছি। বদলা নিতাম ওকে দিয়েই। ওকেই বলেছিলাম, ওর মা মরেছে কিভাবে—বড় মেয়েকে বলেছিলাম, অ্যাকসিডেন্টে মরেছে। কারণ? ছোট মেয়ে ঠাণ্ডা, বড় মেয়ে রগচটা। ছোট মেয়েকে দিয়ে লড়িয়ে দিতাম নাগরাজন আর পিশারোট্টিকে—প্রসাদ দিয়েছে তাকে—গরিবের ইজ্জত থাকে না—

তাই বুঝি ছোট মেয়ের আটপৌরে নাম রেখেছিলে লালি?

হ্যাঁ, লালি নামের এক পরমাসুন্দরীকে কিনেছিল নাগরাজনের ঠাকুর্দার বাবা...লালি নামে আর এক পরমাসুন্দরী বাই-নাচিয়ে উধাও হয়ে গেছিল তেরো বছর আগে—

সিধে হয়ে বসলেন শেখর—তেরো বছর আগে! সে কে?

পালটা প্রশ্ন রাখল পুতুল-নাচিয়ে। এখন তার চোখে জ্বালা—জানেন না?

না।

ডিক্সিটের বিধবা বউ।

ঘরে যেন বজ্রপাত ঘটল। তারপর সব চুপ, একটিপ নস্যি নিয়ে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করল ইন্দ্রনাথ।

ঝাঁকুনি খেয়েছেন শেখর—খুলে বলো।

নাগরাজন কিনেছিল লালিকে। রক্তের দোষ। ঠাকুর্দার বাবার মতো কিন্তু বিয়ে করতে চায়নি। এই লালি চালাক মেয়ে। পয়সা যেখানে, সে সেখানে। পিশারোট্টি বেশি দামে কিনল লালি-কে। কিন্তু বিয়ের নাম গন্ধ করল না—যদিও এই সমাজে একটার বেশি বিয়ে আজও চলে। ধুরন্ধর লালি তখন সোজা গিয়ে উঠল ডিক্সিটের ঘরে—বউ হয়ে সম্পত্তির লোভে।

নাগরাজনের ওপর নারী সাহেবা খাপ্পা এই কারণে?

হ্যাঁ। এরা তিন বন্ধুই রোজ মেয়ে পালটায়—পালটাত—কিন্তু লালি ছিল অন্য মেয়ে—ঘরের বউকেও হটিয়ে দিচ্ছিল—দুয়োরানি আদর খাচ্ছিল বেশি সুয়োরানির চেয়ে। নাগরাজনই সতীন বানিয়ে পাঠিয়েছে নষ্ট মেয়েটাকে। তাই—

তোমার ছোট মেয়ের ডাক নাম দিলে লালি—ভাল নাম প্রবাল। কেন?

দু'টো মানে লাল জিনিস। কিন্তু লালি নামের মধ্যে ইতিহাসের মোহ আছে—সেই মোহ দিয়ে ও টানুক দুই শয়তানকে—ভিড়িয়ে দিক—সরে যাক। মরবে দু'জনের একজন—যে বেশি বুড়ো—মারবে যে চেহারায় বনমানুষ—পুলিশ শেষ করবে তাকে। আর ডিক্সিট? তাকে খাবে আর এক লালি—সে মেয়ে সাংঘাতিক মেয়ে।

কিন্তু কাল রাতে লালিকে রাজা সাহেবের বাড়ি নিয়ে গিয়ে তার খালি গায়ের নাচ দেখছিলো নিজে ঢোল বাজিয়ে—বাপ হয়ে?

অবাক হলো পুতুল-নাচিয়ে—আমি তো যাইনি—কক্ষনো যাই না—আমি ঢোল বাজাই না—বাঁশি বাজাই।

তবে কে গেছিল সঙ্গে?

ভাটিখানার বাঁধা মস্তান। কুঁজো।

মেয়ের বডিগার্ড এক কুঁজো?

ওই কুঁজোর ছোড়া ছুরি কখনও ফসকায় না—

রাজা সাহেবকে মেরেছে কিন্তু হাতুড়ি দিয়ে—

সে মারেনি। জানলায় বাঁশের পর্দার আড়ালে বনমানুষের মতো একটা লোকের ছায়া পড়তেই রাজা সাহেব ছিটকে গেছিলেন—সেই ফাঁকে পালিয়ে আসে দু'জনেই—

এইখানে ইন্দ্রনাথ বললে শেখরকে—তখন কি হয়েছিল, তা লালির মুখেই শোনা যাক। এ যাক পাশের ঘরে।

লালি নতনয়নে ভীরু পদক্ষেপে ঘরে ঢুকতেই শেখর বললেন—তোমার এক কানে পটি লাগানো। দুল ছিঁড়ে পড়েছে বলে? এই নাও দুল।

লাল পাথরের রুপোর পেনডেণ্ট বাড়িয়ে দিলেন শেখর।

চোখের পাতা কাঁপছে লালির।

নরম গলায় বললেন শেখর—ভয় নেই। সব খুলে বলো।

রাজাসাহেব তোমাকে নাচাচ্ছিলেন দিনকয়েক ধরে?

হ্যাঁ। বাজারে আর মেয়ে পাচ্ছিলেন না।

তোমাকে দেখলেন কোথায়?

বাজারে নাচছিলাম, বাবা বাঁশি বাজাচ্ছিল—

দিদি?

তখন ছিল না।

তারপর?

বাবার সঙ্গে কথা হলো, বাবা বললে, পয়সা নেবে না—শুধু আপনাকে গান শুনিয়ে আসবে। ওর মা নেচেছে, দরকার হলে মেয়েও নাচবে।

ওই নাচ?

এই সমাজে ওটা দোষের নয়। একটা আর্ট। মনে করলেই হলো, ভগবানের দেওয়া জামা-কাপড় পরে আছি। ভগবানের সামনে নাচছি। মানুষই ভগবান।

ও। তারপর?

সঙ্গে যেত ঢোলকদাদা। একা যেতে দিত না বাবা। প্ল্যাটফর্ম থেকে দেখা যেত খালের ওপারের বাড়ির বারান্দায় বসে বনমানুষের মতো নাগরাজন—বাবা শিখিয়ে দিয়েছিল, ইশারা করবি—

অ। কাল কী হয়েছিল?

ক'দিন যাইনি। আমার ভাল্ লাগত না। বাজারে চেপে ধরলেন রাজা সাহেব। দিদিকে নিয়ে গেছিলাম আনাজ কিনতে। আমাকে আলাদা নিয়ে গিয়ে ভয় দেখালেন। বাবাকে নাকি লোক লাগিয়ে খুন করে দেবেন। আমাকেও মেরে ফেলবেন যেমনভাবে মেরেছেন আমার মা-কে। কিন্তু একটু গান-টান করে এলে কিছু করবেন না। বাবাকে বাঁচানোর জন্যে গেছিলাম রাত্রে—

সঙ্গে ঢোলকদাদা?

না, না। রাজা সাহেব একা যেতে বলেছিল। খিড়কির বাগানের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে নিয়ে ওপরে গিয়ে স্টেজে দাঁড়াতে বললেন—

নাচবার জন্যে?

হ্যাঁ। জামা-কাপড় বাইরের ঘরে খুলিয়ে ভেতরে নিয়ে এসেছিলেন। চেয়ারে বসে চেয়ে রইলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। জানলা খোলা। অস্বস্তি লাগছিল। হঠাৎ আমাকে কাছে ডাকলেন। গেলাম। উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একহাত পেছনে। সেই হাতে চাবুক ছিল। কটমট করে চেয়ে রইলেন। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন—তোর-মাকে চাবকে সুখ পেয়েছি, আয়, তোকেও চাবুক মারি। বলেই, পেছনের হাত সামনে এনে শপাং করে চাবুক মারলেন আমার বুকে। চাবুকের ডগায় কানের দুল ছিটকে গেল। চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। এমন সময়ে জানলার বাঁশের পর্দার দিকে তাকিয়ে কি রকম যেন হয়ে গেলেন। আমিও তাকালাম। কে যেন গুঁড়ি মেরে রয়েছে বাইরে। বনমানুষের মতো ছায়া। 'কে? কে?' বলে উনি চেঁচিয়ে উঠতেই আমি ছুট্রে পালিয়ে গেলাম। পাশের ঘর থেকে জামা-টামা নিয়ে বাগান দিয়ে রাস্তায় পড়ে ছুটলাম। কেউ ছিল না। কিছুদূর এসে মন ঠাণ্ডা করার জন্যে গান ধরেছিলাম। এমন সময়ে দু'টো বাজে লোক—

তারপর কি হয়েছে আমি জানি। নীরস গলায় বললেন, শেখর—বাবাকে বললে বাড়ি ফিরে?

হ্যাঁ। বাবা বললে, এবার পালাতে হবে। নইলে মেরে ফেলবে। দিদিকে কিছু না বলে ভাল করেছিস। কিছু বলিসনি।

শেখর চাইলেন ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্র বললে—ওকে পাশের ঘরে বাবার কাছে পাঠান। ভীষণ ভয় পেয়েছে।

বললে তারপরে—এই একটা মেয়ের কথার পর পুরো ব্যাপারটা ঘুরে গিয়ে

সিধে হয়ে গেল। ছোট বোনকে শাসাচ্ছেন রাজাসাহেব, এই দেখেই নালা হুঁশিয়ার হয়েছিল। রাতের অভিসারে বোন বেরিয়ে যেতেই পেছন পেছন গেছিল। পেছনের দরজা খুলে বোন ভেতরে ঢুকে যেতেই ঝাঁপড়ে পড়েছিল। ও বাড়িতে লুকিয়ে ঢোকার আর তো পথ নেই। দু'টো পাঁচিলই খালের ভেতর পর্যন্ত গেছে। তাই ব্রীজ পেরিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে জামা-কাপড় ঝোপে রেখে শুধু বড় রুমালের মাঝখানে একটা বল রেখে, সেই রুমাল মাথায় বেঁধে নিচে গিট দিয়েছিল—যেভাবে মেয়েরা বাঁধে চুল বাঁচাতে। এই কারণেই রুমালের চারটে কোণ ভেজা অবস্থায় দেখেছি। জিমন্যাস্টিক যে জানে, থাম বেয়ে ওঠা তার কাছে কিছু নয়। খালে জল কম ছিল সহজেই সাঁতরে ওপারে গিয়ে থাম বেয়ে ব্যালকনিতে ওঠে যখন জানলার গোবরাটে উঠে বসেছে, তখন গুঁড়িমারা ছায়া দেখে বনমানুষের ছায়া মনে করেছে লালি। সে পালিয়েছে। ঘরে নেমেছে তার দিদি। রণচণ্ডী মূর্তি। হাতে রুমালে জড়ানো লোহার বল। রাজাসাহেব বুঝলেন, মৃত্যু আসন্ন। একটা সূত্র রেখে যাওয়ার জন্যে চাবুক হাঁকড়ে ফুলদানি ভাঙলেন—কারণ ফুলদানি নীল রঙে আঁকা—লালির দিদির নাম নীলা। মুণ্ডু ভেঙে দিয়ে চলে আসবার সময়ে ভুল করে রুমালটা ফেলে এসেছিল—বল ছিল হাতে। খাল পেরানোর সময়ে বল ফেলে দেয় জলে। এপারে এসে জামা-কাপড় পরে ব্রীজ পেরিয়ে ভাটিখানায় যখন ঢুকেছিল, তখন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন আপনি। আর একটু বলতে দিন। পরে যখন খেয়াল হলো, মেয়েলি রুমালটা ফেলে এসেছে ঘরে তখন একই পন্থায় খাল সাঁতরে আসতে গিয়ে ডুবতে বসেছিল—স্লুইস খুলে দেওয়ার ফলে জলের স্রোত তখন ভয়ঙ্কর—তখন তাকে আপনি প্রাণে বাঁচান। প্রেমও করেন। এখন আমার একটা কথা রাখুন। নীলাকে বিয়ে করুন। ও খুন করেছে একটা খুন আটকানোর জন্যে। ভীতু বোনটাকেও বিয়ে করে কাছে রাখুন—এ তল্লাটে দুই বিয়ে তো দোষের নয়।

ঝড়ের মতো বক্তৃতা দিয়ে ইন্দ্রনাথ নরম চোখে চেয়ে রইল শেখরের দিকে।

বউয়ের কথায় সব মিঞাই লজ্জা পায়। মুখ লাল করে। শেখর তার ব্যতিক্রম হননি। শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন—নাগরাজন তাহলে নির্দোষ? মিসেস ডিক্সিট ইউক্যালিপটাস প্লেট দেখে শিউরে উঠলেন কেন? ওই বাড়িতেই যে কেনা মেয়ে হয়ে প্রথম গেছিলেন। নাগরাজন কিন্তু তাঁকে ভুলতে পারেননি। পয়সা খরচ করে কেনা নিদারুণ সুন্দরী।

মোটেই নয়। প্রাণের লালির সঙ্গে সময় কাটাতে যেতেন পালঙ্কে। দেখে ফেললেন মিস্টার ডিক্সিট। কাঁচের ব্লক দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে লাথির পর লাথি কষিয়ে গেলেন বুকের পাঁজরায়। তাই অত কালসিটের দাগ। অক্ষম ল্যাজারাসের পালঙ্কে অধিকার নেই—কিন্তু মিষ্টিমুখীর কথার বশ। তাই ফিনিশিং টাচ দিলেন ডেডবডি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ফেলে।

রানি সাহেবা আত্মহত্যা করলেন কেন?

আত্মহত্যা? না, না আপনি ঠিকই ধরেছেন। অনসূয়া ওঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ও তদন্ত আপনি সারুন।

এমন সময়ে ফের নাটকীয়ভাবে প্রবেশ ঘটল সেকেণ্ড অফিসারের—স্যার, স্যার, আবার খুন?

দাঁড়িয়ে উঠলেন শেখর—এবার কে?

নাগরাজন। চাকা-ছুরি ছুঁড়ে গলা কেটে দিয়েছে বেঁটে কুঁজো ঢোল বাজিয়ে।

সে কোথায়?

পগারপার।

আপন মনে বললে ইন্দ্রনাথ—বর্ণে বর্ণে সত্যি হলো ছড়ার তিন ভবিষ্যৎবাণী। বিয়ের নেমন্তন্নটা যেন পাই। ফাউ-গিন্নিকে ফাউ করে রাখার দরকার কী? হোয়েন ইন রোম, বি'আ রোম্যান। যে দেশের যে নিয়ম। গুডন্যাইট।

সু মি! সু মি!

বিচিত্র রহস্যের আধার এই বিশ্বে বিচিত্রতর রহস্য-কাহিনির লেখক হে মোর বন্ধু মৃগ, তুমি কি শুনেছো গ্রীক জাহাজের মৃত্যুরহস্য?

অহিন চৌধুরী-শিশির ভাদুড়ি স্টাইলে কথাগুলো ঝেড়ে দিয়ে একটিপ নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

আমি বুঝলাম, জব্বর কোনও কেসের এই হল গিয়ে মুখবন্ধ।

নিমীলিত নয়নে চেয়ে রইলাম। আমি যে জানি, এই সময়ে বাগড়া দিলে কথার খই আর ফুটবে না। ইন্দ্রনাথ এমনিতে স্বল্পবাক, ভাবুক। কিন্তু যখন বারফট্টাই শুরু করে, তখন বুঝে নিতে হয়, জবর খবর টগবগ করছে আমার এই দুরন্ত দুঃসাহসী বন্ধুটির পেটের মধ্যে।

তাই মুখে চাবি দিয়ে রইলাম।

তাম্রকূট চূর্ণ দিয়ে মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষগুলোকে চনমনে করে নিয়ে সেকেণ্ড কয়েক শিবনেত্র হয়ে বসে রইল ইন্দ্র।

তারপর শুনিয়ে গেল গ্রীক জাহাজের কবর কাহিনি।

ব্যাডরে লোকটার আসল পদবী ভদ্র। ঊর্ধ্বতন সব পুরুষ জন্মেছে এই ভারতবর্ষের মাটিতে। কিন্তু ভবঘুরে বলেই কোথাও শেকড় পাতেনি। রক্তে যার বাইরের টান, সে তো উড়ে উড়ে যাবেই দেশ থেকে দেশান্তরে। তাও কাজ-কারবার নিয়ে নয়। স্রেফ জিপসিদের দলে ভিড়ে।

এইভাবেই একদা গেছিল তুরস্কের মাটিতে। জিপসি হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমুদ্রের ধার বরাবর। এই জিপসিদের টান সমুদ্রের দিকে। সমুদ্র এদের টানে। এককালে এদের পূর্ব-পুরুষরা বোম্বেটে-হার্মাদ-জলদস্যু হয়েছিল। ছিল লুঠেরা। এখন রিক্ত। ভবঘুরে। কিন্তু সমুদ্রের ধারে ধারে। তুরস্কের উপকূলে তাঁবু পেতে এরা যখন মুক্ত বায়ু সেবন করে যাচ্ছিল একদিন, সমুদ্রের জল সহসা সরে গেছিল উপকূল থেকে—মাইল কয়েক ভেতরে চলে গেছিল জলের রেখা—

আর তখনই দেখা গেছিল ভাঙা জাহাজটাকে। জল যখন অনেক সরে গেছে, জিপসি সর্দার ঈগল চোখ মেলে তটরেখার হু হু করে নেমে যাওয়া দেখতে দেখতে বিষম উদ্বেগে যখন কাঠ হয়ে রয়েছে, তখনই তার চোখে পড়েছিল বহুদূরে মাটির তলায় কবরস্থ অবস্থায় ঈষৎ মাথা উঁচিয়ে থাকা একটা অদ্ভুত ধ্বংসাবশেষ।

বিড়বিড় করে বলেছিল জিপসি সর্দার, জাহাজ! জাহাজ!

কিন্তু জিপসি কৌতূহল এর বেশি আর এগোয়নি। লুণ্ঠন প্রবৃত্তি যার রক্তে নেচে চলেছে বহু বংশ ধরে, সে আর তিলমাত্র সময় নষ্ট করেনি সমুদ্রের ধারে।

দলবল নিয়ে, ডেরা উঠিয়ে, চম্পট দিয়েছিল ডাঙার ভেতর দিকে...সমুদ্র থেকে দূরে...দূরে...বহুদূরে...

সমুদ্রের খেয়ালের খবর যে সে রাখত। উত্তাল সমুদ্র আচম্বিতে সৈকত ছেড়ে গভীরে চম্পট দিয়ে ফের যে প্রবল জলোচ্ছ্বাস আকারে ধেয়ে আসে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসাবর্ত রচনা করতে, সে তা জানত।

তাই পালিয়েছিল।

জলোচ্ছ্বাস এসেছিল তার পরেই। মহাপ্লাবন। তুরস্কের প্রাচীন মানুষরা আজও সমুদ্রের সেই প্রলয়রূপের কাহিনি শোনায় দুরন্ত নাতি-নাতনিদের ভুলিয়ে রাখতে।

এইভাবেই সমুদ্রগর্ভের অদ্ভুত ধ্বংসাবশেষ একদিন উপকথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্যাডরে এই উপকথা শুনেছিল জিপসিদের দলে ভিড়ে গিয়ে। তারপর সেই আজব গল্প সবিস্তারে শুনিয়েছিল এক অ্যাডভেঞ্চারিস্ট আমেরিকান পর্যটককে। তিনি খবর দিয়েছিলেন সমুদ্র-সন্ধানীদের। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন সক্রেটিসের আমলের এক অসাধারণ জাহাজডুবির ধ্বংসাবশেষ।

গবেষকরা নেমেছিলেন সমুদ্রতলে। ডুবুরিদের মৎস্য চক্ষু দেখেছিল গ্রীক স্বর্ণযুগের নিদর্শন। পুরাবিজ্ঞানীরা স্তম্ভিত হয়েছিল সমুদ্রপ্রহরীর কোষাগারে গচ্ছিত রাখা হাজার হাজার বছর আগেকার সম্পদ দেখে।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিজেই যেন ঘোরের মধ্যে চলে গেছিল গ্রীক জাহাজের বিপুল বৈভবের গল্প বলার সময়ে। জাহাজডুবি তখন ঘটত যে সব কারণে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সাইরেন, সমুদ্র-ডাইনিদের সম্মোহন জাগানো সঙ্গীত। সুদূর সেই অতীতে সাইরেনদের নাম শুনলেই আঁতকে উঠত ডানপিটে সমুদ্র-নাবিকরা, তাদের গান শুনলে সম্বিৎ হারাত। মহাকবি হোমার তাঁর মহাকাব্যে অলীক এই কাহিনি তুলে ধরেছেন। কাঠের জাহাজের প্রত্যেকেই নিজেদের বেঁধে রেখে দিত মাস্তুলে যাতে শূন্যে ভেসে আসা সাইরেন ডাকিনীর হিপনোটিক গান শুনে তাদের ইচ্ছেমতো বিকট কাণ্ড না ঘটিয়ে বসে।

এই পর্যন্ত বলে গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসেছিল ইন্দ্রনাথ।

আমি নিতান্তই বেরসিক। তাই দুম করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, চব্বিশশ' বছর আগে তো রেডিও ছিল না। জাহাজডুবি ঘটলে কাউকে খবর পাঠানো যেত না। আহা রে! কেউ ছুটে আসত না।

যেন ঘোরের মাথায় বলে গেছিল ইন্দ্রনাথ, অথচ তখন গ্রীকদের সোনার যুগ চলছে! গর্বে ফেটে পড়ছে এথেন্স। রাজনীতি আর দর্শনে সক্রেটিস, নাটকে সোফোফোলস্ আর ইউরিপাইডস দুনিয়া কাঁপাচ্ছে। অথচ যে নৌসম্পদের জন্যে গ্রীকদের স্বর্ণযুগে উত্তরণ, ইতিহাসের জোয়ারে তা প্রায় ভেসে গেছিল। বললেই চলে।...

নৌসম্পদের জন্যে স্বর্ণযুগে উত্তরণ মানে? কৌতূহলী হয়েছিল আমার

সাহিত্যিক সত্তা, স্রেফ জাহাজি কারবারের জন্যে কি একটা দেশ ঝলমলে হয়ে উঠতে পারে? সোনার কারবার নাকি? সোনা এনে ফেলত অন্য দেশ থেকে?

বিরক্ত হল ইন্দ্রনাথ, মৃগ, তুমি গ্রীক হিসট্রিতে কাঁচাগোল্লা খেয়েছিলে নিশ্চয়। স্বর্ণযুগ বলতে কি শুধু সোনার ভাণ্ডার বোঝায়? নো ম্যান, নো! জ্ঞানের সম্পদই আসল সম্পদ। গ্রীক সভ্যতার গৌরব সেইখানেই।

অ, আমি বলেছিলাম এবং নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলাম।

ইন্দ্রনাথ যখন মুডে এসে যায়, তখন সে অন্য বস্তু। সেইদিনও ছিল টেরিফিক মেজাজে। আমাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, তবে হ্যাঁ, ওই পাথরের চোখটা একটা স্বর্ণভাণ্ডারের ঠিকানা দেখিয়ে দিয়েছিল বটে।

চোখ গোল গোল হয়ে গেছিল আমার। কিন্তু পাছে ফের ধমক খাই, তাই চুপ করে রইলাম।

হিরে-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অনুকম্পা বর্ষণ করে গেল ইন্দ্রনাথ। তারপর বললে, আজও সেই সোনার ভাণ্ডারের ঠিকানা পায়নি সোনা-নির্ভর দেশগুলো। ব্যাডারে, শুধু ব্যাডরে জানতো, কোথায় আছে লম্বা লম্বা মোটা মোটা সোনার পাত। পাথরের চোখ পাহারা দিয়ে যাচ্ছে স্বর্ণ-ভাণ্ডারকে, কিন্তু নেই...ব্যাডরে আর নেই।

মা-মানে? কোথায় গেছে? মিনমিন করে শুধিয়েছিলাম আমি।

স্বর্গে নিশ্চয় নয়—চিত্রগুপ্ত তাঁর জাবদা খাতায় পাপ-পুণ্যের হিসেব দেখে নিশ্চয় নরকে পাঠিয়েছেন ব্যাডরে বদমাশকে।

আমি উন্মুখ হয়ে রইলাম। গল্পের ভাঁড়ারের দরজা ফাঁক করেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এখন নীরব থাকাই শ্রেয়।

বন্ধুবর সেদিন যে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শুনিয়েছিল, সংক্ষেপে তা এই

গ্রীক গর্বে ফেটে পড়েছিল এথেন্স। জ্ঞানী পুরুষরা তো ছিলেন সেইখানেই। কিন্তু শক্তির জোগান দিয়ে গেছিল সমুদ্রগামী জাহাজেরা। বাণিজ্য করেছে চুটিয়ে। বিদেশ থেকে শস্য এনেছে, এথেন্স থেকে জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। গ্রীস থেকে তুরস্ক, তুরস্ক থেকে গ্রীস। কৃষ্ণসমুদ্র আর ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে এশিয়া আর আফ্রিকা। এই সব দেশে পণ্য পাচার করে, সেই সব জায়গা থেকে সোনাদানা হিরেজহরত এনে ফেলেছে গ্রীসদেশে। জাহাজি শক্তি না থাকলে গ্রীস বাহুবল আর মস্তিষ্ক বলে বলীয়ান হতে পারতো না।

জাহাজডুবিও হয়েছে। সেকালের কাঠের জাহাজ সমুদ্র খেপে গেলে রক্ষে পেত না। একালের ডুবুরিরা এরকম বহু জাহাজের সন্ধান পাচ্ছে সমুদ্রে আধপোঁতা অবস্থায়।

এমন একটা জাহাজের ভাঙাচোরা অংশ নিয়ে যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মহারা ইন্সটিটিউট অফ নটিক্যাল আরকেয়লজির বৈজ্ঞানিকরা, ব্যাডরে তখন সেই জাহাজের গলুইয়ের দুটো পাথরের চোখের একটা মাত্র পেয়ে অন্যটার সন্ধানে ডুব দিয়েছে লুকিয়ে চুরিয়ে।

এই পর্যন্ত শুনে আমি আর চুপ করে থাকতে পারিনি।

পাথরের চোখ? কাঠের জাহাজে পাথরের চোখ? জাহাজ কি চক্ষুষ্মান?

ইন্দ্রনাথ রাগ করেনি। বলেছিল, মৃগ, একালেও অনেক জাহাজের গলুইয়ে দেখবে দু'পাশে দুটো চোখ আঁকা রয়েছে। এই প্রথাটা ছিল সেকালে। কাঠের জাহাজের গলুইয়ের দু'পাশে কারুকাজ করা পাথরের চোখ বসিয়ে নেওয়া হত। অন্ধ বিশ্বাস ছিল, এই চোখ গহন সমুদ্রে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি মেলে জাহাজকে নির্বিঘ্নে নিয়ে যাবে অজানা বিপদের মধ্যে দিয়ে। সে যুগের দুঃসাহসীদের এছাড়া আর কী সম্বল থাকবে বলো।

আমি বলেছিলাম, কিন্তু সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে, ইন্দ্র। ব্যাডরে একজন জিপসি, প্রথমে বললে। তারপর বললে, ব্যাডরে একজন ডুবুরি। একটু খোলসা করবে?

করছি বন্ধু, করছি। ব্যাডরে দুঃসাহসী, কারণ তার পূর্বপুরুষরা জিপসি। সে লোভী, তঞ্চক এবং পাপ-পুণ্যের ধার ধারে না। সে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, তাই ডাঙা ছেড়ে জলে নেমেছিল। ডুবুরির পেশা নিয়েছিল। কেন? জিপসি পূর্বপুরুষদের কাছে যে শুনেছিল, সমুদ্রের ঠিক কোথায় ডুবে আছে কাঠের জাহাজ। এই পেশায় বিশ মিনিট পর্যন্ত জলের তলায় থাকতে হয়। তার বেশি থাকলে ডুবুরি রোগ হয়। ব্যাডরের সেই রোগ হয়েছিল। মরতে বসেছিল। মরবার আগে আমাকে বলে গেছিল পাথরের চোখ কোথায় পাহারা দিচ্ছে সোনার ভাঁড়ারকে।

কোথায়? আমার প্রশ্ন।

সেটা বলা যাবে না। অনর্থ বাঁধাতে চাই না। আমেরিকান গবেষকদের দৌলতে সে জলে নেমে যখন দেখেছিল, মাটির মধ্যে থেকে একটা পাথরের চোখ উঁচিয়ে রয়েছে, আর একটা নেই, তখন ওর সন্দেহ হয়েছিল—

কিসের সন্দেহ?

তখনকার কাঠের নৌকোর নোঙরকে ভারী করার জন্যে মোটা কাঠের মাঝে পাত ঢুকিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু ব্যাডরে জলের তলায় যে নোঙরটা দেখেছিল, তার কাঠের ফাঁকে রয়েছে সোনার পাত।

সোনার পাত দিয়ে নোঙর!

হ্যাঁ, বন্ধু। ব্যাডরের খটকা লেগেছিল আরও একটা কারণে। রাশি রাশি অ্যামফোরা...

অ্যামফোরা! সেটা কী?

মাটির জার। বিশাল কলসি। সাদাসিধে—কোনও কারুকাজ থাকত না আমাদের দেশের মতো। তার মধ্যে চালান যেত গ্রীসদেশের সুপেয় পানীয়—যার আস্বাদে মাতোয়ারা হয়ে থাকত তুরস্কের বিলাসী মানুষ। অ্যামফোরা ভরে পাঠিয়ে দিত সোনা-হিরে-জহরত।

আমি তো হাঁ।

ইন্দ্রনাথ বলে গেল, ব্যাডরে অতিশয় ধড়িবাজ। আগেই বলেছি, সে ডুবুরি পেশায় নেমেছিল এই ধান্দা নিয়েই। সোনার বাট ঠাসা কাঠের নোঙর দেখে, সেই নোঙর জলের মধ্যে দিয়ে টেনে, নিয়ে যাওয়ার সময়ে দেখেছিল তার আগে আর কেউ জলে নেমেছিল। বোধহয় জিপসি দলের অন্য কোনো ডানপিটে। পাথরের চোখটা টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে রেখেছে জলের নিচের একটা গর্তে। আগাছায় মুখ ঢেকে গেছে কিন্তু ব্যাডরের সন্ধানী চোখ তা টের পেয়েছে।

তারপর?

ধড়িবাজ ব্যাডরে এরপর লুকিয়ে জলে নেমেছে। পাথরের চোখ দিয়ে ঢাকা সুড়ঙ্গে ঢুকে দেখেছে সারি সারি অ্যামফোরা সাজানো সেখানে। সাদাসিধে কলসি কিন্তু প্রতিটার ভেতরে হিরে-মানিক...

তারপর? তারপর?

তারপরেই এল সুনামি।

জলোচ্ছ্বাস?

হ্যাঁ। বৈজ্ঞানিকদেব ল্যাবোরেটরি ছিল পাহাড়ের গায়ে, থাকে থাকে তৈরি বাঁশ আর কাঠ দিয়ে। কমপিউটার ল্যাবোরেটরি, মেস, খাবার জায়গা, বাথরুম—সমস্ত ধুয়ে ভেসে গেল চোখের নিমেষে।

ব্যাডরে? বেঁচে গেল?

সেইটাই রহস্য বন্ধু, সেইটাই রহস্য।

খুলে বলো, ইন্দ্র, খুলে বলো।

ব্যাডরে যখন মরতে বসেছে এই কলকাতার এক প্রাসাদপুরীতে, আমাকে সে ডেকে পাঠিয়ে গুপ্তধনের হদিসটা যখন বলছে, আমি তখন তাকে বলেছিলাম, তুমি তাহলে খুনি? গুপ্তধনের হদিস গোপনে রাখার জন্যে অতজন বিজ্ঞানীদের শেষ করে দিলে? ও ম্লান হেসে বলেছিল, সেই পাপেই তো ডুবুরি রোগে মরতে চলেছি। ঠিকানা দিয়ে গেলাম, যদি পারেন, উদ্ধার করুন। এই বলেই, হেঁচকি তুলে অক্কা পেল বদমাশ।

আমি আমতা আমতা করে বলেছিলাম, কি-কিন্তু, একটা ব্যাপার যে মাথায় ঢুকছে না।

কোন ব্যাপারটা, মৃগ?

ব্যাডরে খুন করতে যাবে কেন? তাকে খুনি বলতে গেলে কেন? সুনামি তো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বৈজ্ঞানিকদের। খুনি তো সুনামি স্বয়ং।

ব্যাডরে বেঁচে গেল কেন?

পালিয়েছিল বলে।

কেন পালিয়েছিল?

সুনামি আসছে বলে।

কি করে বুঝল, সুনামি আসছে?

আমি হাঁ করে রইলাম।

ইন্দ্র বললে, কানখাড়া করে সব শুনলে অথচ খেয়াল করোনি। ব্যাডরে জাত-জিপসি। সমুদ্রের জল হঠাৎ নেমে গিয়ে ফের ধেয়ে আসে সুনামি হয়ে, জিপসিরা পুরুষানুক্রমে তা জানে। গভীর রাতে ব্যাডরে দেখেছিল, সমুদ্র সরে যাচ্ছে হু-হু করে। কাউকে সজাগ করেনি। নিজে পালিয়ে বেঁচেছিল। গুপ্তধন যেন বৈজ্ঞানিকদের হাতে না যায়, এই মতলবে।

ফের হাঁ হলাম।

বেদনা বিচার চায়

ইন্দ্রনাথ বললে, 'মৃগ, ভয়ে ভয়ে ছিলাম কলকাতায়, মেঘালয়ে এসে বাঁচলাম।'

'কীসের ভয়?' বলেছিলাম আমি, 'তোমার মতো দোর্দণ্ড-প্রতাপ গোয়েন্দা তো কাউকে ভয় পায় না।'

কবিতা বললে, 'আমাকে ভয় পায়। আমার মুখকে।'

বিরসবদনে একটিপ কড়া নস্যি নাসিকাগহ্বরে নিক্ষেপ করে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'তা বটে, তা বটে, বৌদি বড় কড়া-কড়া কথা বলে বটে, তবে আমার মূল ভয় ছিল ভারত মহাসাগরের ওই বিকট উল্লাস-নৃত্যকে।'

আমি বলেছিলাম, 'কোথায় ভারত মহাসাগর, আর কোথায় কলকাতা!'

'মৃগ, তুমি একটা গজমূর্খ। কলকাতা তো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র সাত ফুট ওপরে। ভারত মহাসাগরের ওই চল্লিশ ফুট হাইটের একখানা ঢেউ যদি তেড়ে আসত গঙ্গা-টঙ্গার ওপর দিয়ে, তাহলে কী হত বলো তো?'

মুখ টিপে হাসল কবিতা, 'সুতরাং পাঁচ হাজার ফুট ওপরে তুমি নিশ্চিন্ত। ঠাকুরপো, সত্যিই তুমি একটা ভীতুর ডিম।'

ফোড়ন কেটেছিলাম আমি, 'আইবুড়ো যে।'

কটমট করে তাকিয়েছিল ইন্দ্রনাথ, 'বেশ আছি! প্রোষিত-ভর্তৃকাদের চেয়ে ভালো আছি।'

'প্রোষিতভর্তৃকা!' জুল জুল করে চেয়ে রইল কবিতা, 'তারা আবার কারা?'

'বেদনা যাদের অন্যতমা,' বলে, নস্যগ্রহণের জম্পেশ টানে একখানা কায়দা দেখাল বটে ইন্দ্রনাথ—প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বেদনা কে?

বেদনা একটা মেয়ে। তার নামটাই এই রকম। বেদানা নয়, বেদনা। নৃতত্ত্বের বিচারে তার ধমনীতে ককেশীয় আর মঙ্গোলীয় রক্ত আছে। সেই সঙ্গে মিশেছে বিদঘুটে বেঙ্গলি রক্ত। তাই তার নাম বেদনা।

একটু খোলসা হওয়া যাক।

অসমের উপজাতিরা প্রধানত মঙ্গোলীয় প্রবংশের লোক। উপত্যকা অঞ্চলের অসমীয়ারা ককেশীয় জাতির মধ্যে পড়ে। কোনও এক কালে এক মঙ্গোলীয় পুরুষ বিয়ে করেছিল এক ককেশীয় নারীকে—তাদের হল একটি মেয়ে। সেই মেয়েটিকে বিয়ে করল এক বাঙালি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। কামাখ্যায় অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে...মোহিনী মায়ায় আটকে গিয়ে।

তাদেরই মেয়ে এই বেদনা। বাঙালি পিতার শখ করে রাখা নাম।

অ্যাডভেঞ্চারিস্ট বাবা আর মোহিনী মায়ের সমস্ত গুণাবলী শ্রীঅঙ্গে বহন করে বেদনা হয়েছে বড় ডেঞ্জারাস মেয়ে। পাহাড়ি এলাকায় ছোট্ট থেকে বড় হয়েছে। ভয়-ডর কাকে বলে জানে না। সে নাচতে জানে, গাইতে জানে, ক্যারাটে জানে। ছোট্ট এই শহরে তাই তার নাম ব্ল্যাক প্যান্থার।

হ্যাঁ, বেদনা বিলক্ষণ ব্ল্যাক। এবং, ব্ল্যাক বিউটি। কালো তার চোখ, কালো তার শ্রীঅঙ্গ। শুধু ব্ল্যাক বিউটিই সে নয়—ব্ল্যাক বিদ্যুৎও বটে। পাহাড়ি উন্মাদনায় মিশেছে বাঙালি শিল্প। সে তো একটা প্যান্থার হবেই। ব্ল্যাক প্যান্থার। কালো বাঘিনী।

পাহাড় যেখানে সানুদেশ হয়ে উপত্যকায় মিশেছে, সেইখানে এক রমণীয় শহরে, ছোট্ট কিন্তু আধুনিকতায় ঝলমলে শহরে, বেঙ্গলি বাপ আর উপজাতি মা'কে নিয়ে জমিয়ে, চুটিয়ে বহুবল্লভা না হয়েও বহু পুরুষকে নাচিয়ে বড় হয়েছে ব্ল্যাক বাঘিনী বেদনা। সে আরণ্যক পরিবেশে বিহু নাচ নাচতে পারে। তখন তার সুরেলা আতীক্ষ্ণ কণ্ঠের বনগীত শুনলে রক্তে নাচন জাগে। সাপেদের দেবী মনসা পুজোয় তার ভর নৃত্য দেখলে মনে হবে সত্যিই যেন নাগিনী হয়ে গেছে সে নিজে। আবার, বিয়ের আসরে এমন বউ-নাচ বহুয়া নৃত্য নাচবে যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে।

ফট করে এহেন কন্যা বেদনার নামটা বলেই নস্যি টানতে টানতে ইন্দ্রনাথ এমন একখানা সাসপেন্স তৈরি করে ফেলল যে দুম করে আমার মনে পড়ে গেল, ব্ল্যাক প্যান্থার বেদনা আরও একখানা নাচ নেচে নাচায় সবাইকে।

সে নাচটার নাম প্রোষিতভর্তৃকার বারমাস্যা নৃত্য।

বেদনা-ব্যাপারে আসার আগে, আমরা কেন মেঘালয়ে এসেছিলাম, সেই বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকা নিবেদন করে নেওয়া যাক।

অসম যে ভারতের অন্যতম অরণ্যবহুল রাজ্য, তা কারও অজানা নয়। রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণের যুগে অসম যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ আর কামরূপ নামে পরিচিত ছিল, সে তথ্যও কারও অজানা নয়। কালিদাসের কাব্যে কামরূপের বর্ণনা বহুপঠিত। কামরূপের বৈদারগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ যেখানে মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে, সেইখানেই কালক্রমে ছোটখাট কিন্তু অত্যাধুনিক একটা শহর গড়ে উঠেছে। শহরটার নাম দেওয়া হয়েছে কামগড়।

মেয়ে পাচারের একটা বড় ঘাঁটি হয়ে উঠেছে এই কামগড়, এই সংবাদ বিশিষ্ট মহলে যাওয়ার পর ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে ভার দেওয়া হয়েছিল, ব্যাপারটায় নাক গলিয়ে দেখার জন্যে।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র, যার কাজই হল যত্তো সব উটকো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো, ছুটে এসেছিল শিলং শহরে আমাদের নিয়ে। কিন্তু...

প্রোষিতভর্তৃকা বিষয়ের অবতারণা করতে গেল কেন? বিষয়টার সঙ্গে বেদনা নাম্নী ব্ল্যাক প্যান্থারকে জুড়ে দিল কেন?

ইন্দ্রনাথ রুদ্র চিরকালই কখনও কুঁড়ে, কখনও চলমান বজ্র। কলেজ লাইফ থেকে দেখে আসছি। গোয়েন্দাগিরিতে নামযশ কববার পরেও এই অলসতা কাটেনি। কিছু বললে টিপ্পনি কাটে—'আরে বাবা, আমরা হলাম গিয়ে ফ্রেঞ্চ পিপল অফ ইণ্ডিয়া। আড্ডা না মারলে সৃষ্টি হয়?'

কিন্তু সংসারের চাকা চালাতে গেলে টু-পাইস ইনকামের দরকার। কবিতা বড়লোকের মেয়ে হতে পারে, কিন্তু সব মেয়েদের মতো ওর বাস্তব জ্ঞানটা অতিশয় প্রখর। একে তো আমার মতো এই পয়মাল স্বামী : মানুষ যখন আর কোনও জীবিকা খুঁজে পায় না, তখন হয়ে যায় ইনসিওরেন্সের দালাল, অথবা লেখক।

আমি হয়েছি শেষোক্ত চিড়িয়া। আর আমার এই বন্ধুটি, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ রুদ্র, হয়েছে শখের গোয়েন্দা।

সুতরাং কবিতা ওকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে বেশ কিছু পেশাদার গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে জুড়ে রেখেছে। অটোমেটিক্যালি বেশ কিছু ক্লায়েন্ট ওর কাছে আসে—অতীতের মতো। সেসব কাহিনি আমি চুটিয়ে লিখেছি কবিতার তাড়নায়।

ইদানিং ক্লায়েন্ট-প্লাবন আসছে নামী-অনামী এই গোয়েন্দা এজেন্সি থেকে। এরা কেস নেয়। ফিল্ডওয়ার্ড আর ব্রেনওয়ার্কের জন্যে ইন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হয়। অর্থাৎ, ইনভেসটিগেশন-এর ভার ইন্দ্রনাথ রুদ্রের—ম্যাট্রিমোনিয়াল কেস বাদে। বিয়ে দেওয়ার আগে আর বিয়ে ভাঙার আগে আজকাল খোঁজখবর নেওয়ার যে হিড়িক উঠেছে, ইন্দ্রনাথ রুদ্র সে সবের মধ্যে নেই।

ও চায় ঝানু দাবা খেলোয়াড়ের মতো দুরূহ কেস। এমনি একটা কেস তাম্রেশ্বরী রহস্য।

অসম রাজগণ একসময়ে হিমালয় পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এখানে-সেখানে বড় বড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ সেই ইতিহাস বহন করছে। এইভাবেই মধ্যযুগের তাম্রেশ্বরী মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ ইতিহাসবিদদের টনক নড়িয়েছে।

কিন্তু সেটা স্রেফ ইতিহাস।

নব যুগে একটা নতুন তাম্রেশ্বরী মন্দির নাকি নির্মিত হয়েছে মেঘালয়ের খাসি জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকায়—গারো পাহাড়ি অঞ্চলে।

তাম্রেশ্বরী মন্দিরে প্রতি পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয় মদনোৎসব—বাৎস্যায়ন বর্ণিত পন্থার অনুসরণে। তফাৎ থাকে শুধু একটি ক্ষেত্রে।

এই মদনোৎসবে মেয়ে কেনাবেচা হয়। কলকাতা থেকেও বহু কন্যা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এখানে আসে। তারপর...

থাক সেই সর্বজনবিদিত কাহিনি। আমাদের কাহিনি ইন্দ্রনাথকে নিয়ে। তাম্রেশ্বরী মন্দির রহস্য নিয়ে চাঞ্চল্যকর উপন্যাস পরে লেখা যাবে'খন।

এই রহস্য ভেদ করতে গিয়েই ব্ল্যাক প্যান্থার কন্যার সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম। জেনেছিলাম, সে এক প্রোষিতভর্তৃকা কন্যা।

নারী নিয়ে পুরুষের পুতুল খেলা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই পৃথিবীতে। ছটা রসের মধ্যে মধুর রসটাই সেরা। আর এই রস শুরু হয় যৌনবন্ধন থেকে।

বেদনা মেয়েটি ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় হোক, জড়িয়ে গেছিল এই বন্ধনে। সে পাহাড়ি মেয়ে—দুরন্ত, দুঃসাহসী। বাণিজ্যের প্রয়োজনে একদা এসেছিল শিলং

শহরে। একটি ছেলে-বন্ধু তাকে মা করে দেয়। ছেলেটির সঙ্গে আর সে কোনও সম্পর্ক রাখেনি—বাচ্চাকেও নষ্ট করেনি—যা হচ্ছে আকছার শহর-টহরে। বাবা আর মায়ের কাছে থেকেছে, অবৈধ সন্তানের মা হয়ে এতটুকু লজ্জা না পেয়ে দিব্যি কাজকর্ম নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে গেছে।

আর এই শহরেই ধর্ষিতা হয়েছে...

এক ডাক্তারের চেম্বারে।

ধর্ষক ডাক্তার স্বয়ং।

'প্রোষিতভর্তৃকা সেই নারীকে বলা হয়, যার স্বামী গেছে বিদেশে,' নস্যগ্রহণ সমাপ্ত করে (যা একটা শিল্পবিশেষ ইন্দ্রনাথের কাছে) বলেছিল বন্ধুবর—'বৌদি, এই ক্ষেত্রে বেদনা বিয়ে না করেই বাচ্চা পেয়েছে—ছোট্ট সেই শহরে তার নামে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। কিন্তু ব্ল্যাক প্যান্থার সে সবে বিচলিত না হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে গেছে। তবে কুমারী মা'কে ধর্ষণ করার মতো কদর্য কাণ্ড যে করেছে, তাকে সে ছাড়বে না।'

'কী করবে?' কবিতার প্রশ্নে বিশাল কৌতূহল।

'প্রমাণ করে ছাড়বে যে তাকে রেপ করা হয়েছে।'

'যা হয়ে গেছে, তা কি আর প্রমাণ করা যায়?'

'যায় বৌদি, যায়।'

'অসম্ভব।'

'খুবই সম্ভব।'

'কী ভাবে?'

'শরমে মরে যাচ্ছি বলতে, তবুও বাধ্য করছ বলতে। ডাক্তারের শক্তি নিষিক্ত বেদনার প্যাণ্টির জোরে।'

অন্যদিকে চেয়ে রইল কবিতা।

সে বঙ্গের বিদুষী। কিন্তু বচনে ব্যবহারে কক্ষনো সীমা অতিক্রম করে যায় না। একটা অদৃশ্য গণ্ডি টেনে চুপটি করে বসে থাকে তার মধ্যে। সেখানে সে মহীয়সী।

স্ত্রী-প্রশস্তি মনে করে আমার বউ-বন্দনায় যাঁরা মুখ টিপে হাসছেন, তাঁরা হাসতে পারেন। আমি কিন্তু শুধু অবাক হই। শুধু মনের মাধুর্য দিয়ে বাউণ্ডুলেদের বেঁধে রাখা যায়? অতি-প্রগলভ উৎকট বডি-ল্যাংগুয়েজের জিমন্যাস্টিক না দেখিয়ে?

সেই দিন, ইন্দ্রনাথের শরমে মরে যাওয়ার এক লাইনের বক্তব্য শুনে, কবিতা চেয়ে রইল অন্যদিকে। কোনও কথা নয়।

আমি তখন বলেছিলাম, 'ইন্দ্র, আমি একটা আভাস পাচ্ছি।'

ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'যথা?'

'বৈজ্ঞানিকী তদন্তের।'

'তাই বটে।'

'শুনতে আগ্রহ হচ্ছে।'

'তবে শোন, বেদনার জবানিতে।'

হ্যাঁ, আমি কুমারী মা। তাতে বয়ে গেল। ছোট্ট এই শহরটায় টি-টি পড়ে গেছে। তাতেও আমার কাঁচকলা। বয়ফ্রেণ্ডটাকে আচ্ছাসে পিটিয়েছিলাম পরে। তার কাছে আর যাই না। কিন্তু কেউ যদি আমার অতীত নিয়ে টিটকিরি দেয়, তাকে ছেড়ে দিই না।

আমার বাবার পূর্বপুরুষরা বোধহয় আবিসিনিয়ায় জন্মেছিল। কী কালো, কী কালো। আমি বাবার গায়ের রঙ পেয়েছি, আর মায়ের মঙ্গোলীয় চোখ পেয়েছি।

ফলে, আমি নাকি একটা সজীব চুম্বক। শুনলে খুব হাসি পায়। তারপর টের পাইয়ে দিই—যদি চুম্বকের ধর্মে কেউ গায়ে এসে পড়তে চায়—তাকে।

তখন সে বোঝে এই কালো মেয়েটা লক্ষ লক্ষ বছর আগে বোধহয় কালো বাঘিনী হয়ে জন্মেছিল।

প্রথম বয়ফ্রেণ্ডটাকে আমি আচ্ছাসে পিটিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম। হাজার হোক আমার সন্তানের জনক তো বটে। কিন্তু মুখে মুখে খবরটা এত ছড়িয়ে গেছে যে কিছু স্টুপিড মনে করে, তুড়ি মারলেই বুঝি আমাকে কাছে টেনে নেওয়া যায়।

তখন বুঝিয়ে ছাড়ি, মার্শাল আর্ট কাকে বলে। শিখেছি যে বাবার কাছে। হাইট আমার মোটে পাঁচ ফুট। কিন্তু পিচ্ছিল বিদ্যুৎ।

তবে একদিন, শুধু একদিন, এই বৈদ্যুতিক শক্তিটা প্রয়োগ করতে পারিনি পাপিষ্ঠ ডাক্তারটার ওপরে। বেহুঁশ হয়ে গেছিলাম যে। এমন একটা ইঞ্জেকশন ফুঁড়ে দিয়েছিল আমার মারকাটারি মেজাজটাকে বাগে রাখার অছিলায়...

আমি নরাধম ডাক্তারটার কাছে গেছিলাম আমার এই উগ্রতা আর দপ্ করে জ্বলে ওঠার চিকিৎসার জন্যে।

আমার এক পুরোনো বয়ফ্রেণ্ড আমাকে টিটকিরি দিয়েছিল, 'বাহাদুর' বলেছিল আমার সন্তানের জনককে। আমি তাকে পিটিয়ে তক্তা করে দিতে যাচ্ছিলাম। আমার অণু পরমাণুতে খুনে রাগ যেন লক্ষ কোটি ফণা তুলেছিল। সে টপ্ করে উঠে বসেছিল নিজের গাড়িতে। বড়লোকের বখাটে ছোকরা। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি লাথি মেরে দরজা তুবড়ে দিয়েছিলাম। তার বেশি আর কিছু করতে পারিনি। ধুলো উড়িয়ে চম্পট দিয়েছিল গাড়ি—মালিককে নিয়ে।

আমি বুঝেছিলাম, আমি একটা বারুদের বস্তা হয়ে রয়েছি। আমার চিকিৎসা দরকার। মারকুটে মেয়েদের কেউ ভালো চোখে দেখে না। বিশেষ করে আমার মতো মেয়ে। যে নাকি পেটে বাচ্চা এনেছে বাইশ বছর বয়েসেই—নিজেকে সামলাতে না পেরে।

তাই গেছিলাম ডাক্তারটার কাছে। ছোট্ট এই শহরে লোকটার খুব নাম ডাক। খুব অমায়িক। বয়স খুব একটা বেশি নয়। ঘরে একটা ডিভোর্সি বউ আছে। সে

তার আগের বিয়ের দুটো বাচ্চা সমেত এই ডাক্তারটাকে বিয়ে করেছে। এমন সৎকর্ম যে করতে পারে, সে তো সৎ পুরুষ। সজ্জন। পরোপকারী। সবাই তাই জানে। আমিও তাই জানতাম। তাই আমার বারুদ-রাগের চিকিৎসা করার জন্যে তার কাছে গেছিলাম।

সে তখন একলা ছিল। চেম্বারে আর কোনো পেশেণ্ট ছিল না। খুব লম্বা মানুষ। ছ'ফুট তো বটেই। টকটকে ফর্সা। চোখ দুটো কটা। ককেশীয় রক্ত নিশ্চয় আছে ধমনীতে।

আমাকে সে চিনত। হাড়ে হাড়ে চিনিয়েছিলাম পরে।

আমাকে দেখেই কটা চোখ নাচিয়ে বলেছিল মিঠে হেসে, 'কী হে ব্ল্যাক প্যান্থার, টগবগ করে ফুটছ কেন? কেউ পিন ফুটিয়েছে?'

পেশাদার তো, রোগী দেখেই রোগ ধরে ফেলে।

আমি স-ব বলেছিলাম।

সে আমাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল। একটা অ্যাম্পুল থেকে ওষুধ টেনে নিয়ে সিরিঞ্জের ছুঁচ ঢুকিয়ে দিয়েছিল আমার গায়ে। তারপর আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। সে এক আশ্চর্য ঘোর। সব মনে আছে। কিন্তু শরীর অসাড়। ব্ল্যাক প্যান্থার নেতিয়ে পড়েছিল।

ভেতরের চেম্বারের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে যা করেছিল, তা বলতে পারব না। সব টের পেয়েছিলাম। কিন্তু নড়তে পারিনি।

দু'ঘণ্টা পরে নিঝুম অবস্থায় চলে এসেছিলাম।

তখন খেয়াল হয়েছিল। আমার প্যান্টি ভিজে গেছে।

পুলিশ অফিসার সব শুনলেন।

বললেন: 'কিন্তু বেদনা, কেসটা কঠিন।'

আমি বলেছিলাম, 'কেন কঠিন?'

তিনি বলেছিলেন, 'তোমার দুর্নাম আছে। ডাক্তারের নেই। বরং আছে সুনাম।'

আমি বলেছিলাম, 'ডি-এন-এ টেস্ট করান। এই প্যান্টির ডি-এন-এর সঙ্গে ওঁর ডি-এন-এ মিলে গেলেই সুনাম ঘুচে যাবে।'

অফিসার আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি তা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু দীর্ঘ চার বছরেও তা করে উঠতে পারেননি।

বড় ঘোড়েল সেই ডাক্তার। সসম্মানে মাথা উঁচু করে থেকেছে শহরে। দশের উপকার যে করে, শতেক সম্মান সে পায়। সে তা পেয়েছে। পুলিশি তদন্ত তার চুলের ডগা ছুঁতে পারেনি।

প্রথমে লুকিয়ে ডাক্তারের চুল নেওয়া হয়েছিল।

স্টিয়ারিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে জিরেন নেওয়ার অভ্যেস ছিল শয়তানটার। পুলিশের টিকটিকি এই স্টিয়ারিং থেকে চুল জোগাড় করেছিল। কিন্তু সে তো মরা চুল। গোড়া ছিল না। ডি-এন-এ টেস্ট ফেল করেছে।

তারপর, লুকোচুরি ছেড়ে খোলাখুলি এগিয়ে গেছিল পুলিশি তদন্ত। ডাক্তারটার মুখের লালা নেওয়া হয়েছিল। থুথু দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে সেই ঠোঁট টেস্ট পেপারে চেপে ধরেছিল।

থুথুতে অন্য কেমিক্যালের দূষণ ছিল। টেস্ট ফেল করেছে।

সেই দূষণ এসেছিল শুকনো ঠোঁট নরম রাখার মলম থেকে—যে মলমের স্টিক পাওয়া গেছিল ডাক্তারের গাড়ির ড্যাশবোর্ড খুপরি থেকে।

পুলিশ টেম্পারের পারা যখন চড়ে, রোখ চেপে যায়। আমাকে দিয়ে সিভিল কেস ফাইল করিয়ে, ওয়ারেন্ট বের করে, ডাক্তারের ব্লাড নিতে গেছিল। ডাক্তার ফুলহাতা সোয়েটার পরেছিলেন। হাতা গুটিয়ে হাসিমুখে বাহুমূলের যেখানে আঙুল রেখেছিলেন, সেখান থেকে রক্ত টানা হয়েছিল।

সে রক্তে অন্য ডি-এন-এ পাওয়া গেছিল। প্যান্টির শক্তির ডি-এন-এ নয়।

পুলিশ, অবাক। অথচ আমাকে বিশ্বাস করে। মাস কয়েক পরে, ওয়ারেন্টের জোরে, আবার রক্ত টেনেছিল ডাক্তারের সেই বাহুমূল-এর সেই জায়গা থেকে।

এবার আর রক্ত ওঠেনি সিরিঞ্জে!

আমি তখন মরিয়া। পুলিশ হতভম্ব। এমন সময়ে খবর এল, ডাক্তার এই শহরের বাড়ি বেচে দিয়ে চলে যাবে ঠিক করেছে। দালাল লাগিয়েছে।

পালিয়ে যাবে? নিরপরাধ সেজে? পুলিশি অত্যাচারে? আমার টেঁকা দায় হবে যে! একে তো আমি মার্কামারা তেরিয়া মেয়ে...

ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে ধরলাম। উনি আমার প্রতিটি কথা কান খাড়া করে শুনলেন। পুলিশকে দিয়ে আর একবার ডাক্তারের রক্ত নেওয়ালেন। এবার আঙুল থেকে।

ডি-এন-এ টেস্ট মিলে গেল।

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেল—নিছক রটনা আর নয়—ডাক্তার আমাকে বেহুঁশ করে দিয়ে সত্যিই ধর্ষণ করেছিল।

বেহুঁশ করেছিল ডেঞ্জারাস একটা ড্রাগ আমার রক্তে ঢুকিয়ে দিয়ে। পুলিশ আমাকে সেই ড্রাগের নাম বলেছিল।

•

বেদনা-কাহিনি শোনবার পর আমি বলেছিলাম ইন্দ্রনাথকে, 'হে বন্ধু, তুমি এ তল্লাটে এসেছ নারী-পাচারিদের ঘাঁটি তছনছ করতে। বেদনার কালো শরীরের আলো কি তোমাকে মুগ্ধ করেছিল? তুমি তাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে কেন?'

টুকুস করে কবিতা বললে, এতক্ষণ পরে, 'এবং নিশ্চয় বিনা পারিশ্রমিকে?'

মন্তব্য তো নয়, যেন বোলতার হুল। সিঁটিয়ে গেল বন্ধুবর।

বললে, 'কী মুশকিল! কী মুশকিল! ব্যাচেলর থাকলে এত কৈফিয়ৎ দিতে হয় জানা থাকলে কোনকালে একটা বিয়ে করে নিতাম।'

'তারপর ওই ডাক্তার বদমাশটার মতো নোংরামি করে বেড়াতে—বিয়ের লাইসেন্স পকেটে রেখে,' কবিতার কণ্ঠস্বর তখন অতীক্ষ্ণ—এতক্ষণ কথার কল

বন্ধ ছিল যে—এখন পুরো খুলে দিল, 'আমার কর্তার কথার জবাবটা দাও। ওই ইয়েটার উপকার করতে গেলে কেন?'

'বৌদি,' একটু থামল ইন্দ্র, তারপর বললে, 'আমাদের এই তিনজনের মধ্যে তা বলা যায়। বেদনা প্রফেশন্যাল টিকটিকি।'

'হোয়াট?'

'সে পাহাড়ি মেয়ে। পাহাড়ের অলিগলির খবর রাখে। নানারকম পাহাড়ি বিজনেসের গন্ধ পায়। এই অঞ্চলের মেয়ে বিক্রির সমস্ত খবর তাকে দিয়ে জোগাড় করিয়েছি। আমি ব্রেন, সে ব্রন—'

'তোমার মাসল। বিউটি মাসল। তোমার মতো ক্যারেকটারলেস ব্যাচেলর—'

বাধা দিলাম আমি, 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছ। সাধু! সাধু! তাই তার একটা উপকার করে দিয়েছ। পুলিশ ধোঁকা খেয়েছে, কিন্তু তুমি খাওনি। কী ভাবে, বন্ধু কী ভাবে?'

মুচকি হেসে ইন্দ্র বললে কবিতার দিকে চেয়ে, 'এতক্ষণ তো বেশ একহাত নিলে আমাকে। এবার আমার পালা। ডাক্তারের পেছনে আমি লেগেছিলাম শুধু বেদনা-কারণে নয়...'

'আর কী কারণে?' কবিতা এখন ঝাঁঝাল।

'নানা মন্দিরে দেবদাসীর দরকার—পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে, নানা আধুনিক হারেমে বিউটি দরকার—স্ট্যাটাস বাড়ানোর জন্যে, নানা বনিতালয়ে বারবনিতা দরকার—পয়সা করার জন্যে...এই সবের মূলে ছিল এই ডাক্তার। পালের গোদা সে।'

'আচ্ছা'! কবিতার চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'ট্যাটা মেয়েদের নেতিয়ে রাখত ডেঞ্জারাস ওই ড্রাগটা ফুঁড়ে দিয়ে, এবং...' ঢোঁক গিলল ইন্দ্র---'একটু চেখে নিয়ে।'

মুখ লাল হয়ে গেছে কবিতার, 'বেদনাকে টাইট দিতে গেছিল সেই জন্যে —চান্স পেয়ে?'

'হ্যাঁ, বৌদি, হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমার হাঁদা কর্তা যে প্রশ্নটা করল এখুনি, তার জবাবটা তো দিলে না।'

'কোন প্রশ্নটা?'

'পুলিশ ধোঁকা খেয়েছে, তুমি খেলে না কেন?'

মুখখানাকে বিষম অবাক করে তুলে ইন্দ্র বললে, 'কী আশ্চর্য! সাঁটে বললাম, ধরতে পারলে না?'

'আঙুল থেকে রক্ত নেওয়ালে কেন?' কবিতা এখন সেয়ানা।

পাল্টা প্রশ্ন করে গেল ইন্দ্র, 'বাহুমূল থেকে শেষবার রক্ত বেরুল না কেন?'

থতিয়ে গেল কবিতা, 'কেন ঠাকুরপো?'

'পেনরোজ ড্রেন্স নামে একরকম সার্জিক্যাল পদ্ধতিতে এক সেন্টিমিটার

ডায়ামিটারের রবার টিউব ব্যবহার করা হয়। বদমাশ ডাক্তারটা তারই এক পেশেন্টের শরীর থেকে ব্লাড নিয়ে এইরকম একটা টিউবে ঢুকিয়ে, পুঁচকে সসেজের মতো বানিয়ে, নিজেই নিজের বাহুমূলে ছুরি চালিয়ে, সসেজটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে সেলাই করে রেখেছিল। সেলাইয়ের দাগ ঢেকে রেখেছিল সোয়েটারের হাতা গুটিয়ে রেখে। ডাক্তার তো, হাসিমুখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কোনখান থেকে রক্ত নিতে হবে—ঠিক যেখানে ঢোকানো ছিল সসেজভর্তি অন্যের রক্ত।'

চক্ষু ছানাবড়া প্রতিম করে কবিতা যেন খাবি খেয়ে গেল, 'রক্তভরা সসেজ!'

'একই রক্ত দিয়ে আরও কয়েকটা সসেজ বানিয়ে রেখেছিল।'

'প্রথমবারে তাই আঙুল থেকে রক্ত টানতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু একবার বাহুমূল থেকেও তো রক্ত বেরুল না। কেন?'

'রক্ত আর ছিল না সসেজে—তাই।...কী হল, বৌদি? দম আটকে গেল নাকি?'

নিঃশ্বাস ছেড়ে কবিতা বললে, 'বেদনা বিচার চেয়েছিল, তুমি তা পাইয়ে দিয়েছ। ঠাকুরপো, তোমার কল্যাণ হোক।'

আমি কিন্তু দম নিয়ে বলেছিলাম, 'ডেঞ্জারাস ড্রাগ যে দেওয়া হয়েছিল, তার প্রমাণ?'

'ঘুঘু লেখক,' চোখ নাচিয়ে জবাবটা দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ, 'তোমার চাইতেও ঘুঘু অথবা সেই ডাক্তারটার চাইতেও ঘুঘু ছিল তার বউ। এত কেলেঙ্কারি রটছে কেন, তার তদন্তে নেমেছিল নিজেই। বাড়িতেই খুঁজে পেয়েছিল সেই ডেঞ্জাসার ড্রাগটার অ্যাম্পুল—অনেক।'

'ড্রাগটার নাম?'

'সরি লেখক, সেটা নিয়ে ঢাক পিটোনো কি সমীচীন?'

দাবড়ানি খেয়েছিলাম আমারই বউয়ের মুখে, 'চোপ!'

একটি গোয়েন্দা কাহিনী

'যুক্তির জাহাজ' আমার গোয়েন্দা বন্ধু ইন্দ্রনাথ রুদ্রের এক অনন্য সাধারণ কীর্তি। এই ঘটনার অন্তে কবিতা মানে আমার বউ, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু বলেছিল—'ঠাকুরপো, তুমি একটা জিনিয়াস। আজ থেকে তোমার নাম হল যুক্তির জাহাজ।'

ঘটনার সূত্রপাত পুরীর সমুদ্র সৈকতে।

চিরকুমার ইন্দ্রনাথকে একরকম চ্যাংদোলা করেই আমি আর কবিতা নিয়ে ফেলেছিলাম পুরী হোটেলে। খাই-দাই আর দামাল সাগরের ঢেউ গুনি বালিতে বসে।

বাঙালী জাতটার দোষ হল তিন মাথা এক হলেই তর্ক বাঁধে। বিশেষ করে আমাদের এই তিন জুটির তো কথাই নেই। সেদিন সকালবেলা হু-হু হাওয়ায় সমুদ্রতীরে বসে আমরা গুলতানি করছি। কবিতা বলল—'ঠাকুরপো, তুমি হলে রবার্ট উলফের মত ডিটেকটিভ; দৈব সহায় না হলে জারিজুরি ফাঁস হয়ে যেত।'

রেগে গিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল—'সেটা তোমরা গায়ের জ্বালায় বলো। আর দায়ী মৃগাঙ্কর মত থার্ডক্লাস লেখাগুলো, গোয়েন্দাগিরির 'গ' বোঝে না, গোয়েন্দা গল্প লিখতে বসে। ফলে আমাদের মুখে চুনকালি পড়ে। দ্যাখোগে যাও বিলেতে। কন্যান ডয়াল, চেস্টারটনের দৌলতে সেখানকার ডিটেকটিভদের দেখে কেউ নাক সিঁটকোয় না।'

চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার—'দ্যাখ ইন্দ্রনাথ, তোর বড্ড অহংকার হয়েছে। ইণ্ডিয়ান ডিটেকটিভের মানেই হ'ল এক একটা ম্যাজিশিয়ান। যুক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করার মতো এলেম তোদের নেই।'

'ফলেন পরিচয়তে' ইন্দ্রনাথ ততোধিক রেগে বলল।

অগ্নিকাণ্ডের হোতা কবিতা অত্যন্ত নিরীহমুখে বলল—'ওগো শুনছো, তুমি ঠাকুরপোকে যাচাই করলেই পারো। এখুনি একটা প্রবলেম দাও। দেখি ও কতদূর দৌড়ায়।'

ইন্দ্রনাথ ফ্যাঁস করে উঠল—'দৌড়াবো আবার কোথায়? দৌড়ায় মৃগাঙ্কর মত লেখকের আজগুবি ডিটেকটিভরা। আসল ডিটেকটিভরা মনে করলে এইখানে এই বালিতে বসে যে কোন কথার খেই ধরে অনেক কথাই বলতে পারে।'

'বটে'! রেগে তিনটে হয়ে আমি বললাম—'বড্ড যে তড়পানি দেখছি! বেশ বলো, এই কথাটা শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে।'

'কি কথা?'

'এগারো মাইল হাঁটা চাট্টিখানি কথা নয়—বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে।'

কৌতুক-তরঙ্গিত দুই চোখ নাচিয়ে বলল কবিতা—'দেখি এবার ইণ্ডিয়ান ডিটেকটিভের ব্রেন। ঠাকুরপো, হেঁয়ালিটার মানে করে দাও না।'

ইন্দ্রনাথ একটা সিগারেট ধরাতে চারটে দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট করলো। তারপর লম্বা লম্বা চুলগুলো খামচে ধরে স্বপ্নালু চোখে চেয়ে রইল ঢেউয়ের উপর দিয়ে দিগবলয়ের দিকে।

অনেকক্ষণ পরে বলল—'লজিক এমনই একটা জিনিস, যা বুদ্ধিজীবির হাতে পড়লে দিনকে রাত, রাতকে দিন বানাতে পারে। আমি তোমার হেঁয়ালীর মানে করব লজিক দিয়ে, যুক্তি দিয়ে।'

'এখন শোন, আমার প্রথম সিদ্ধান্ত হ'ল এই, এগারো মাইল হাঁটা চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে' এ কথা যে বলছে সে নিজে কিন্তু শরিফ মেজাজে নেই।'

আমি বললাম—'মানলাম। অবশ্য এটাকে সিদ্ধান্ত ক্লেম করে বাহাদুরি নেওয়ার কোনো মানে হয় না। কথাটা শুনলেই বক্তার মেজাজ ধরা যায়।'

ইন্দ্রনাথের স্বপ্নছাওয়া চোখে ইষৎ বিরক্তি ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু চোখ না ফিরিয়েই নীলিমায় নীল সাগর আকাশ দেখতে দেখতে আবার বলে—'পরবর্তী সিদ্ধান্তঃ—অমাবস্যার রাতটা আগে হিসাবের মধ্যে ছিল না। অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত। তা নাহ'লে বক্তা বলত, 'অমাবস্যার রাতে এগারো মাইল হাঁটা চাট্টিখানি কথা নয়।' 'বিশেষ করে' শব্দ দুটি যোগ করার মানেই হ'ল, রাতটা যে অমাবস্যার—এটা আগে খেয়াল ছিল না।

'তা তো বটেই,' বললাম আমি।

'পরের সিদ্ধান্ত—বক্তা অ্যাথলিট নয়। খেলাধূলোর অভ্যাস নেই—আদারে পাঁদারে টোটো কোম্পানির ম্যানেজারি করার অভ্যাসও নেই।'

"উহুঁ, উহুঁ, এ সিদ্ধান্ত হাত গুণে পেলে কিনা, তা বোঝাতে হবে," বললাম আমি।

''বিশেষ করে' শব্দ দুটিই আবার গোল পাকাচ্ছে। বক্তা যদি বলত, অমাবস্যার রাতে এগারো মাইল হাঁটা চাট্টিখানি কথা নয়—তাহলে পথকষ্ট অমাবস্যার দরুন বলা যেত। কিন্তু অমাবস্যার রাতে এখানে আগে বলা হচ্ছে না—পথকষ্ট যে কারণে বেশি, সেইটাই বলা হ'ল আগে ; অর্থাৎ 'এগারো মাইল হাঁটা চাট্টিখানি কথা নয়'। তার মানে দূরত্বটাই বক্তাকে কাহিল করেছে। কিন্তু এগারো মাইল কি খুব বেশি পথ? পথ চলা যাদের অভ্যেস অথবা খেলাধূলায় যারা পোক্ত—তাদের কাছে এগারো মাইল রাস্তা নস্যি নিতে নিতে অথবা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কেটে যায়। তাই কিনা?" চুপ করে তাকিয়ে রইলাম। ইন্দ্রনাথের দুই চোখে তখনো দিগন্ত ভাসছে। পবন বরুণদেবকে সাক্ষী করেই যেন বলল আপনমনে—'হে দিগ্‌গজজয়ী, আমাকে কয়েকটা অনুমান করার অনুমতি দেওয়া হোক।'

—'অনুমান? কেন বন্ধু'?

—'বাক্যের সৃষ্টি কখন? একটা পরিস্থিতি বা অবস্থার পটভূমিকায়। এক্ষেত্রে সেই পটভূমিকা আমার কাছে অদৃশ্য। আমি তাই অনুমান করতে চাই।'

'প্রার্থনা মঞ্জুর।'

'প্রথম অনুমান এই—বক্তা যা বলছে, তা বাস্তবিকই ঘটেছে বলেই বলছে। অর্থাৎ বক্তাকে সত্যিই অমাবস্যার রাতে এগারো মাইল হাঁটতে হয়েছে এবং হাঁটাটা অকারণে নয় বা নিছক বাজি জেতার জন্যেও নয়। অনুমান মঞ্জুর?'

'মঞ্জুর।'

'হাঁটাটা কোন অঞ্চলে হয়েছে সেটাও অনুমান করতে চাই।'

পুরীর তীরে? না এই অঞ্চলেই কোথাও ধরে নিতে পারি?

'অবশ্যই।'

'দু'টো অনুমানই যখন মঞ্জুর হলো, তখন আমার শেষ সিদ্ধান্তটাও মনে করিয়ে দিই—বক্তা অ্যাথলিট নয়, হাঁটিয়ে নয়।'

'অতঃপর?'

'বক্তাকে হাঁটতে হয়েছে হয় খুব গভীর রাতে না হয় ভোর রাতে। ধরো রাত বারোটা থেকে সকাল ছ'টা বা সাতটার মধ্যে।'

'কেন?'

'এগারো মাইল পথটার কথা খেয়াল রেখ। এ অঞ্চল জনবসতি বিরল নয়। যে কোন রাস্তা ধরে হাঁটলেই এগারো মাইলের মধ্যে বেশ কয়েকবার লোকালয় পড়বেই। গাড়ী ঘোড়ারও অভাব নেই। বাস, ট্রেন, ট্যাক্সি—সবই রয়েছে। হাঁটবার কোন দরকার হত না যদি হাঁটাটা দিনের বেলায় হ'ত। কিন্তু এমন সময়ে হাঁটা হয়েছে যখন রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলে না।'

'এমনও হতে পারে বক্তা নিজেকে জাহির করে, গাড়ি ঘোড়ায় চাপতে চায়নি। চুপিসারে যেতে চেয়েছে—তাই হেঁটেছে।'

অনুকম্পার হাসি হাসলো ইন্দ্রনাথ—'মূর্খ! সে উদ্দেশ্য থাকলেই বরং বাস বা ট্রেন নিরাপদ। সেখানে কেউ কাউকে মনে রাখে না। রাতের অন্ধকারে একলা পথ চললে চৌকিদার দেখতে পাবে, বা পথ চলতি কোনো প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারও দেখে ফেলতে পারে।'

'যাকগে, তারপর?'

'বক্তা শহর থেকে শহরতলী যায়নি। শহরতলী থেকেই শহরে আসছিল।'

'তাতো বটেই। শহরে থাকলে তো ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে পারতো।'

'খানিকটা ঠিক। আরেকটা পয়েন্ট আছে। এগারো মাইল রাস্তাটাব কথা আবার মনে করো। হিসেবটা বড্ড সঠিক মনে হচ্ছে না?'

'তাতে কী?'

'আহাম্মক! 'দশ মাইল হেঁটেই মেরে দিলাম' বা 'একশ মাইল ঝড়ের মত ড্রাইভ করলাম'—এসব কথার মানে কী? না, মোটামুটি হিসেব। দশ মাইল বলতে আট মাইল থেকে বারো মাইলও হতে পারে। একশ মাইল বলতে নব্বই থেকে একশ দশও হতে পারে। গড়পড়তা হিসেবটাই বলা হয় কথায় কথায়। কিন্তু যদি বলে এগারো মাইল—সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে হিসেবটা গড়পড়তা নয়—সঠিক।

''তারপর ধরো, শহুরেবাবুকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, অমুক গ্রাম ক' মাইল মশায়? সে বলবে, তিন কি চার মাইল। কিন্তু যে কোন গাঁয়ের লোককে জিজ্ঞেস করো অমুক শহরটা ক'-মাইল হে? সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে, পৌনে চার মাইল। বার বার হেঁটেই তার মুখস্থ।'

'দুর্বল সিদ্ধান্ত' বললাম আমি।

'কিন্তু তুমি আগেই অনুমান করে নিয়েছ, শহরে থাকলে সে ট্যাক্সি নিত। দুয়ে দুয়ে যোগ করলে এছাড়া আর সিদ্ধান্ত নেই।'

'বেশ মানলাম। তারপর?'

'তারপরেই তো মোদ্দা কথায় আসছি হে লেখক। আমার এবারের সিদ্ধান্ত হল ঃ একটা বক্তা নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাতে চেয়েছিল, কারণটা মামুলী নয়।'

'মামুলী কারণ মানে?'

'মানে গাড়ী ব্রেকডাউন হলে অথবা বাড়ীতে ডাকাত পড়লে বলা হয় মামুলী কারণ।'

'গাড়ী ব্রেকডাউন হওয়াটা মোটেই মামুলী কারণ নয়—এই ক্ষেত্রে তো নয়। মাইল-মিটার থাকায় শহর থেকে বেরনোর সময় সঠিক মাইলের হিসেবটাও তার জানা স্বাভাবিক।'

ইন্দ্রনাথ সামনে চেয়ে রইল দামাল সাগরের ওপর দিয়ে দূর-দিগন্তে। বলল—'না'। মাঝরাতে গাড়ী ব্রেকডাউন হলে তোমার মতো উন্মাদ ছাড়া কেউ এগারো মাইল হন্টন দিয়ে অমাবস্যার রাতে অ্যাডভেঞ্চার করে না। গাড়ীর পিছনের সিটে কুকুর-কুণ্ডলী দিয়ে রাত কাটায়। এগারো মাইল হাঁটতে আন্দাজ কতক্ষণ লাগে?'

'ঘণ্টা পাঁচ ছয় তো বটেই,' বললাম আমি।

'রাইট। তার কম হতেই পারে না। বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে। আগেই মেনে নিয়েছি। নিশাচরবাবুকে হাঁটতে হয়েছে হয় মাঝরাতে নয় ভোররাতে। ধরা যাক, গাড়ী বিগড়ালো রাত একটায়। তাহলে শহরে পৌঁছতে ছটা থেকে সাতটা। তার মানে বেশ সকাল। রাস্তায় গাড়ী চলতে শুরু করেছে। বাসও যাত্রা করবো করবো করছে। এ অঞ্চলের পয়লা বাস ঐ সময়েই ছাড়ে। শুধু সাহায্য দরকার হলে কাছাকাছি কোন টেলিফোন ধরলেই ল্যাটা চুকে যেত। হাঁটার কোনো দরকার ছিল না। না হে, বক্তার পাকাপোক্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল শহরেই। সময়টাও ঘড়ি বাঁধা, মানে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে।'

খেঁকিয়ে উঠলাম আমি—'তাই যদি হত তো আগে শহরে গিয়ে সকাল পর্যন্ত বসে থাকলেই হত? লাস্ট বাস ধরে শহরে আসা যেত মাঝরাতে। তারপর ছটা পর্যন্ত কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। অমাবস্যার রাতে এগারো মাইল ঠ্যাঙাতে যাবে কেন? বিশেষ করে বক্তা যখন অ্যাথলিট নয়।'

মোক্ষম যুক্তি। ইন্দ্রনাথ নিজেও যেন ঈষৎ থতমত খেল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলো না।

যাই হোক ভাববার জন্যেই যেন একটা সিগারেট ধরাল ইন্দ্রনাথ। তারপর বালির দিকে তাকিয়ে বলল—'হয়তো লাস্ট বাস ধরতে পারেনি, অথবা টেলিফোন কল বা ঐরকম কোন সংকেতের অপেক্ষায় ছিল বক্তা।'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি মাঝরাত থেকে ভোররাতের মধ্যে থাকে—।'

'আরে না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ভোররাতেই। এগারো মাইল হাঁটতে সময় লাগে পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টা। লাস্ট বাস সাধারণতঃ রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে ছাড়ে অঞ্চলের সব শহর থেকেই। লাস্ট বাস মিস করলে হাঁটতে হয়েছে। শহরে পৌঁচেছে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে। পক্ষান্তরে, ভোরের দিকে ফার্স্ট বাস ধরলেও শহরে পৌঁছতে সাতটা বাজবেই। কাজেই, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ছটা থেকে সাতটার মধ্যে।

'বুঝলাম। তুমি বলতে চাও, ছটার আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে রাতের লাস্ট বাস ধরতো। সাতটার মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে ভোরের ফার্স্ট বাস ধরতো। কেমন?' বললাম আমি।

'ঘটে বুদ্ধি আছে দেখছি।'

বালিতে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে বলল ইন্দ্রনাথ, 'আরও একটা ব্যাপার আছে। টেলিফোন কলটা নিশ্চয় রাত একটার আগেই এসেছিল।'

'তাতো বটেই। ছটা থেকে সাতটার মধ্যে মোলাকাতের সময় থাকলে রাত একটার মধ্যে না বেরোলেই নয়।'

আবার দিগন্তের উদ্দেশ্যে দৃষ্টিকে ভাসিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। টানা টানা দুই চোখে সেই স্বপ্নছাওয়া চাহনি। চিন্তায় তন্ময়, এ বুঝি আর এক জগতের মানুষ। হাওয়ায় উড়ছে লম্বা লম্বা চুল।

অনেকক্ষণ পরে চোখ ফেরাল ইন্দ্রনাথ। শুষ্ক কণ্ঠে শুধু বলল—'মৃগাঙ্ক, হোটেলে গিয়ে এখুনি ফোন করো কটক স্টেশনে। আজ সকালে সেখানে পুরী এক্সপ্রেস দাঁড়ালে কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা জানতে চাই।'

'কি বলছো ইন্দ্রনাথ?'

'বন্ধু।' ইন্দ্রনাথের কণ্ঠে পরিহাসের বাষ্পও নেই এবার—'পুরী এক্সপ্রেস কটক স্টেশনে দাঁড়ায় ছটা বিশ থেকে ছটা চল্লিশ পর্যন্ত।' কটক থেকে এগারো মাইল দূরে সূর্যনগর মাইকা টাউনশিপও আমরা দেখেছি। এই সূর্যনগরেই কেউ বসেছিল রাত একটা পর্যন্ত টেলিফোনের পাশে। টেলিফোনে খবর গেছে পুরী থেকে যে পুরী এক্সপ্রেসের অমুক নাম্বার কামরায় অমুক বার্থে কেউ আসছে। পুরীর লোকটি এ খবর পেয়েছে কোলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককলে—পুরী এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ার পর খবরটি কেউ তাকে জানিয়েছে। সূর্যনগরের লোকটি সেই খবর পেয়ে পায়ে হেঁটে কটক পৌঁচেছে সকালে।'

'সূর্যনগরীর ওপর তোমার বিষদৃষ্টি পড়ার কারণ?'

'কারণ, কটক থেকে গুনে গুনে এগারো মাইল গেলে সূর্যনগর ছাড়া আর কোনো টাউন নেই।'

'কিন্তু আমি আর কবিতা তোমার বুদ্ধির দৌড় যাচাই করছি যুক্তি-ছক দিয়ে। স্রেফ বানানো কথা দিয়ে মেপে দেখছি তোমার যুক্তির ইঁদারা কত গভীর। খেলা ছাড়া কিছুই নয়। তুমি এত সিরিয়াস হচ্ছ কেন? কটকে কেন ফোন করবো?'

'মৃগাঙ্ক, যদি বলি—না, এটা খেলা নয়?' ইন্দ্রনাথ গম্ভীর।

'বলছি খেলা...এগারো মাইল হাঁটা চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে।—এ কথাটা খেলার ছলেই আমি বলেছি।'

'না, বন্ধু না, এখানেই হল অন্যমনস্ক লেখকের সঙ্গে সদা হুশিয়ার ডিটেকটিভের তফাৎ। কথাটা তোমার নয়। শোনা কথা।'

'ইন্দ্রনাথ—'

'চটবার কিছু নেই। আমরা ত্রিমূর্তি যখন কথা শুরু করি, ঠিক তখনি দু'জন লোক আমাদের পাশ দিয়ে গিয়েছিল। বাঙালী। একজনের পরনে ধুতি, পাঞ্জাবী। মুখে ব্রন। কোঁচার খুঁট দিয়ে তাই সবসময় মুখ ঢেকে কথা বলে। আর একজন হাড্ডিসার। কালো টেরিলিন ট্রাউজার্স আর হলদে কালো ডোরাকাটা হ্যান্ডলুম শার্ট। দ্বিতীয় লোকটা পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেছিল—'এগারো মাইল হাঁটা চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে।' কথাটা আমাদের তিন জনেরই কানে ঢুকেছে। কিন্তু তোমাদের দু'জনের মগজ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। কারণ, তুমি আনমনা লেখক আর তোমার অর্ধাঙ্গিনী অল্পবুদ্ধি নারী। কিন্তু ব্যাডারের মত ব্রেন যার, সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র পোকামাকড়ের কথা যেমন শোনে, তোমাদের কচকচানিও তেমনি মনে রাখে। আশপাশের কথাও মগজে ধরে রাখে। সত্যিকারের গোয়েন্দা হতে গেলে এই গুণ থাকা দরকার। সেইটাই এতক্ষণে খানিক প্রমাণ হল। বাকিটা প্রমাণ হবে কটকে ফোন করলে।'

বিপুল টিটকিরি নিঃশব্দে হজম করে বললাম—'কেন রে?'

'হাড্ডিসার লোকটা সূর্যনগরী থেকে পায়ে হেঁটে কটক পৌঁছে বিশেষ একটা কাজ সেরে ঐ পুরী এক্সপ্রেসেই একটু আগে পুরী পৌঁচেছে। প্রশ্নমালা শিকেয় তুলে ফোনটা করবি?'

ইন্দ্রনাথ এবার রুষ্ট।

ফোন করেছিলাম। মুখ চুন করে এসে ইন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলাম সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। আজ সকালেই বিখ্যাত জহুরী ব্রজরঙ্গলাল খাম্বাটি খুন হয়েছেন কটকে। ভদ্রলোক একাই আসছিলেন পুরী এক্সপ্রেসে ফার্স্ট ক্লাস কূপে। হত্যাকারী তাঁর ব্রিফ কেস নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ইন্দ্রনাথ শুধু বলল—'লেখকরা যে কতখানি ক্যালাস' তার আর একটা প্রমাণ হল এই ঘটনা। কাল সকালেই কাগজে বেরিয়েছিল নবাব ইয়াকুব পুরী এসেছে। কলকাতা থেকে জহুরী ব্রজরঙ্গলাল খাম্বাটিও আসছেন বিজনেসের ব্যাপারে। নবাব আর জহুরী বিজনেস নিয়ে মিট করে, তা আঁচ করতে পেরেছিলাম বলেই এই অনুমান। সিদ্ধান্ত ও সত্যদর্শন।'

যাক, পুরীর একটি হোটেলে সেই দিনই হত্যাকারীকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছিল স্থানীয় পুলিশ ইন্দ্রনাথের কথামত।

খরগোশ খাঁচা রহস্য

জয়ন্ত চৌধুরী কখনোই মুখখানা উদ্বেগহীন রাখতে পারে না। পুলিশে কাজ করে করে সদা উদ্বেগে ভোগে। ঘুমন্ত অবস্থাতেও।

তবে হ্যাঁ, ঝঞ্ঝাট ঝামেলার একটা জীবন্ত ব্যারোমিটার বলা চলে জয়ন্তকে। উৎপাত কখন কোনদিকে আসছে, ও টের পায়।

এটা ওর পুলিশি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

আমি বলতাম—'আহারে, সব পুলিশ অফিসার তোর মতো যদি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ডেভালাপ করে নিতে পারতো, দেশটা দুষ্কৃতি মুক্ত হতো।'

জয়ন্ত বলতো—'আমি তালকানা নই। তাই টের পাই।'

ইন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বলতো—'তা ঠিক, তা ঠিক। তালের চোখ থাকে না, কিন্তু নারকেলের তিনটে চোখ থাকে। তাই নারকেল গাছ থেকে খসে মাথায় পড়ে, তাল কখনো পড়ে না। জয়ন্ত, তুই একটা নারকেল। অন্তত তোর মাথাটা খুব শক্ত।'

কবিতা, আমার গৃহিণী, মধুর হেসে বলতো—'ভেতরে কিন্তু শাঁস আর জল আছে।'

এইভাবেই আগডুম বাগডুম বিষয়ের জমাটি আড্ডা চলে প্রতি রোববার বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ রুদ্রের বেলেঘাটার বাড়িতে। আজকের কম্পু-কলকাতা সস্তায় ব্রেন-চর্চা করতে ভুলে গেছে। রকবাজি যে কলকাতা-কালচার। বম্বে-মাদ্রাজ-দিল্লিতে দেখিনি।

তবে হাঁ, শুকনো আড্ডা আমাদের পোষায় না। কথা বললে খিদে পায়। আমরা যখন রকবাজ ছিলাম, পাড়ার মাসীমা'রা খাবার পাঠিয়ে দিতেন।

আমাদের এই আড্ডায় খাবার সাপ্লাই করে কবিতা—আমার সুগৃহিণী। সেদিনের আড্ডায় এনেছে একগাদা পমফ্রেট ফ্রাই। ছোট ছোট সাইজ। খেতে খাসা।

মুখরোচক এই আড্ডার সংবাদ বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই প্রতি রবিবারেই একজন না একজন গেস্ট আসবেনই। খেতে নয়, প্রব্লেমের সমাধান করতে। গুবলেট কেসের সবখোল চাবি যে এই আড্ডা।

সেই রোববারে এসেছিল বেঙ্গল হুডিনি হিরন্ময় হুই। ম্যাজিশিয়ান। একটু লেট্ করেই এসেছিল। আমাদের পমফ্রেট-চর্বন তখন আরম্ভ হয়ে গেছে।

হুই আমার গেস্ট। সুতরাং পরিচয় করিয়ে দিতে হলো আমাকেই। বললাম—'যেহেতু ইন্দ্রনাথ রুদ্র আর জয়ন্ত চৌধুরী আইবুড়ো মন্দিরের পার্মানেন্ট মেম্বার, জন্মান্তরিত ভীষ্ম, সেইহেতু এই আসরে লেডি মাত্র একজন। সুতরাং লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন সম্বোধন করতে পারলাম না।'

তুম্বোমুখে চেয়ে রইলো কবিতা।

আমি চালিয়ে গেলাম—'দ্য অনলি লেডি অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আজকের এই পমফ্রেট সেমিনারে হাজির হয়েছেন প্রখ্যাত জাদুকর হিরন্ময় হুই। জনগণ তাঁর

একটা টাইটেল অলরেডি দিয়ে ফেলেছেন। তিনি বেঙ্গল হুডিনি। আমরা, বাঙালিরা, আর কিছু না পারি, গুণীর সমাদর করতে পারি। এই একটা ব্যাপারে আমরা ফরাসী অথবা আরবী। ইন্দ্রনাথ, জয়ন্ত, এই অধম লেখক, এমনকি ম্যাডাম কবিতাও একটা করে ডক্টরেট জাতীয় খেতাব অর্জন করে ফেলেছে। হিপ্ হিপ্ হুররে বেঙ্গল পাবলিক।'

'পাবলিক মেমারি ইজ ভেরি শর্ট,' মৃদু মন্তব্য চালিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

আমি মুখর হয়েই রইলাম—'এই যে ভদ্রলোক আজকে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, যিনি প্রকৃতই দীর্ঘকায় পুরুষ, গোঁফ চর্চায় সময় দিতে পারেন প্রতিদিন—ফলে যাঁকে বাংলার বাঘ বলে মনে হচ্ছে। যাঁর পুরু কালো ভুরু আর বাঁশের মত সিধে মেরুদণ্ড, মেরুদণ্ডহীন বঙ্গতনয়দের বিষাদ নিমগ্ন রেখেছে, তিনি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ডিগ্রীটা নিয়েছেন, সেটা আইনের। অথচ আইনের পেঁচালো ব্যবসায়ে সুবিধে করে উঠতে পারেননি। উনি কখনও হাসেন না বলেই বোধহয় অমন ব্যবসায়ে মার খেলেন। শেষ চেষ্টাটা করতে গিয়ে ফাইন দিতে হয়েছিল আদালতকে—ফর, কনটেম্পট অফ কোর্ট। আদালত অবমাননা।'

শব্দহীন কাষ্ঠহেসে বললে বেঙ্গল হুডিনি—'আমার হাসি বাঘের গর্জনের মতো শোনায় বলে হাসি না। হাসি পেলেও হাসি না। একবার হাসি শিখতে লাফিং ক্লাবে জয়েন করেছিলাম। নিমেষে লেবুতলা মাঠ ফাঁকা হয়ে গেল। যে মহিলারা আমার হাসি শুনে পালিয়েছিলেন, তাঁরা আমার ম্যাজিক দেখতেও আর আসেন না। হাসলে আমার প্রফেশন মার খায়। সুতরাং আমি হাসবো না। জীবনে না।'

কবিতা বললে—'আমি কিন্তু আমার স্বামীর নাম দিয়েছি ডক্টর হা-হা।'

চুটকি জবাবটা মুখে এসে গেল তৎক্ষণাৎ (যা সচরাচর আসে না)। বললাম—'আর আমি তোমার নাম দিয়েছি ডক্টর হু-হু।'

'নারদ! নারদ!' ইন্দ্রনাথের মৃদু মন্তব্য।

বেঙ্গল হুডিনি বললে—'রাগ করছেন কেন? আপনারা দু'জনেই স্বর্গে গন্ধর্ব ছিলেন। ছিলেন সূর্যদেবের সেরা গায়ক আর গায়িকা। গানে একজন করতেন হা, আর একজন করতেন হু।'

'এবং,' বললে কবিতা—'দুটোই ছিল নিন্দাসূচক।'

'কিন্তু গান-কালচার তো বটে,' বেঙ্গল হুডিনির টিপ্পনী।

'GUN কালচার,' কবিতার সপেটা জবাব—'এখন যা বাংলায় চলছে।'

জয়ন্ত চৌধুরী অনর্থক শব্দ করে কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বললে—'দ্য অনলি লেডি অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আমরা বৃথা বাক্যব্যয় করছি। মুচমুচে পমফ্রেট ফ্রাই খাওয়া থেকে বিরত হচ্ছি। কোড এক্সপার্ট ইন্দ্রনাথ রুদ্র এখন যদি তার কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথাবার্তা শুরু করে দেয়, তাহলে খাওয়াটা মাটি হয়ে যাবে। তার চাইতে বরং ম্যাজিক দেখা যাক।'

কবিতা প্রায় লাফিয়ে ওঠার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখিয়ে বললে—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যাজিক হোক।'

বেঙ্গল হুডিনি বললে—'ম্যাডাম আমাকে প্যাঁচে ফেললেন।'

কবিতা বললে—'কি প্যাঁচে?'

'আমি যে এক্সপোজিয়ার ম্যাজিশিয়ান—অর্ডিনারি জাদুকর নই।'

'এক্সপোজিয়ার! সেটা কি বস্তু?'

'জাল জোচ্চুরি ঠগবাজি নকলিবাজি এক্সপোজ করে দিই—হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিই।'

'বটে! বটে! জাত ম্যাজিশিয়ানদের জাতে মারেন?'

'হেঁ, হেঁ, হেঁ...।'

'হল্ট। হাসবেন না। প্লীজ। ভৌতিক, অপ্রাকৃত শক্তির খেলা যারা দেখায়, তাদের ভাঁড়ামো ভাঙেন। বেশ করেন। আপনার জয় হোক।'

'হেঁ, হেঁ, হেঁ...।'

'প্লীজ, প্লীজ, হাসবেন না। আসল ম্যাজিক দেখাচ্ছেন বলে যারা পয়সা লোটে, আপনি তাদের দাবী নস্যাৎ করেন স্টেজ ম্যাজিক দেখিয়ে?'

'এগজ্যাক্টলি, ম্যাডাম, এগজাক্টলি। ধরুন কোনও মিস্টিক, আই মিন, অতীন্দ্রিয়বাদী যদি দাবি করেন, অজ্ঞাতশক্তির সাহায্য নিয়ে তিনি চামচে বেঁকিয়ে দিতে পারেন, আমি তখন সেই একই ম্যাজিক দেখিয়ে দিই স্রেফ প্রাকৃতিক শক্তি খাটিয়ে। ম্যাডাম, একটা চামচে দেবেন?'

অকস্মাৎ চামচে চাওয়ায় কবিতার মতো সপ্রতিভ মেয়েও একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললে—'চামচে! এখানে চামচে কেউ নয়। প্রত্যেকেই স্ববলে বলীয়ান।'

'আহা! সে চামচে-র কথা বলছি না। যদিও এই দেশটা এখন চামচে-দেশ হয়ে গেছে। ওই চামচেদের মুখোশ খোলার একটা ম্যাজিক শো করা যাবে'খন। থ্যাংকিউ ফর দ্য আইডিয়া। কিন্তু আমি এখন চাইছি একটা চামচে। স্রেফ চামচ। চা-চামচ হলেই চলবে।'

'ও,' বলে, উঠে গিয়ে ইন্দ্রনাথের কিচেনটা থেকে একটা চা-চামচ নিয়ে ফিরে এল কবিতা—'এই নিন।'

বেঙ্গল হুডিনি চা-চামচ হাতে নিয়ে বললে—'উরি গেলার-এর নাম নিশ্চয় শুনেছেন। উনি চা-চামচ বেঁকিয়ে দিতেন অজানা শক্তিদের আবাহন করে। গেলার মিস্ট্রি আজও এক জবর মিস্ট্রি। আমি সেই মিস্ট্রি ম্যাজিক দেখাই এইভাবে' বলেই, চা-চামচের দু'প্রান্ত ধরলো দু'হাতে। 'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি' বলতে বলতে হেঁট হয়ে বুলিয়ে নিয়ে এল পায়ের গোছ থেকে কান পর্যন্ত। দেখা গেল, চামচ বেঁকে গেছে নব্বই ডিগ্রী কোণে।

ইন্দ্রনাথ গলা খাঁকাড়ি দিয়ে বললে—'অমন কম্ম সব্বাই করতে পারে।'

বেঙ্গল হুডিনি বললে—'আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। নট সো ইজি, অ্যাজ ইউ থিঙ্ক, ইথিরিয়াল ফোর্সে বিশ্বাস করেন?'

'ইথারের শক্তি?' ইন্দ্রনাথ এখন অর্ধনিমীলিত নয়ন।

'আজ্ঞে।'

জয়ন্ত বললে—'দেখুন মশায়, আমি খর নয়ন পুলিশ আদমি. আপনি যে পকেটে একটা চামচে বেঁকিয়ে রেখে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা জানলাম যখন বৌদির হাত থেকে চামচ নেওয়ার আগেই বেঁকা চামচকে হাত সাফাই করলেন পকেট থেকে। তারপর হাতের জাদু দিয়ে সিধে চামচ-কে সরিয়ে দিয়ে সে জায়গায় নিয়ে এলেন বেঁকা চামচ। অ্যাম আই রাইট?'

'হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট। দ্যাট ইজ ম্যাজিক।'

'পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।'

না আওয়াজ করে অদ্ভুতভাবে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বেঙ্গল হুডিনি বললে—'তাহলে স্বীকার করছেন, দেশের তাবড় তাবড় ঠগবাজদের আসল কীর্তি আপনাদের অজানা নয়, কিন্তু কিছু করছেন না?'

বুদ্ধিমান জয়ন্ত সহসা যেন বধির হয়ে গেল।

বেঙ্গল হুডিনি গোঁফে তা দিল বেশ যত্ন করে। গোঁফের প্রান্ত দুটো আর একটু পাকিয়ে উঁচু করে দিয়ে বললে—'আকাশিক শক্তি আসছে এই অ্যাণ্টেনা দুটোর ডগা দিয়ে। এটা আমার স্টেজ বুকনি। এখানেও ছাড়লাম। আমার পরবর্তী খেলা, ভ্যানিসিং অফ সিকি।'

একদৃষ্টে গোঁফের সরু প্রান্ত দুটোয় চেয়ে থেকে, যেন সূক্ষ্ম আকাশিক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে করতে, কবিতা বললে—'সিকি মানে? চার আনা?'

'ইয়েস, ম্যাডাম। নয়া পয়সার যুগ যখন চলে গেছে, একখানা সিকি হলেও চলবে। যদিও এটাও চলে যেতে বসেছে, এর জায়গায় থাকবে শুধু টাকা—মুদ্রাস্ফীতির জন্যে।'

'জীবনে টাকা তো পেলাম না—শুধু সিকি জুটেছে—লেখকের কপাল, বলে, আমি পকেট থেকে একটা সিকি বের করে দিলাম।'

কবিতার দিকে গোঁফের অ্যাণ্টেনা ঘুরিয়ে বেঙ্গল হুডিনি বললে—'একটা মরিচ-কৌটো দেবেন? না, না, মরিচ ঝাঁপি যেতে বলছি না, রান্নাঘরে গিয়ে নিয়ে আসবেন? আর একটা পেপার ন্যাপকিন।' ·

নীরবে হুকুম তামিল করে গেল কবিতা। মজা বেশ জমেছে। ওর তরল চোখে এখন তরঙ্গ দেখা দিয়েছে।

সিকি-টা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে ছোট টেবিলে রাখলো বেঙ্গল হুডিনি। বললে—'হেড ওপরে, টেল নিচে। দেখে নিয়েছেন?'

আমি বললাম—'আমার হেড ওপরেই থাকে।'

কবিতা বললে—'টেল থাকে ধুতির আড়ালে।'

কটমট করে তাকালাম আমি।

বেঙ্গল হুডিনি তখন মরিচের কৌটো দিয়ে চাপা দিচ্ছে সিকি-কে।

বলছে—'এখনও হেড ওপরে রয়েছে। কারেক্ট?'

কবিতা বললে—'তা বটে।'

বেঙ্গল হুডিনি মরিচ-কৌটোর ওপর ন্যাপকিন চাপা দিয়ে বললে—'এখনও হেড ওপরে। তাইতো?'

কবিতা বললে—'অলওয়েজ।'

বেঙ্গল হুডিনি মরিচ কৌটো সমেত ন্যাপকিন তুলে ধরে বললে—'দেখে নিন, এখনও হেড ওপরে।'

কবিতা বললে—'দেখছি।'

ন্যাপকিন মোড়া মরিচ কৌটো সিকি-র ওপর রেখে দিয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে খপ করে ন্যাপকিন তুলে নিল বেঙ্গল হুডিনি।

মরিচ কৌটো ভ্যানিশড!

সিকি রয়েছে। হেড ওপরে।

বেঙ্গল হুডিনি বললে—'এর মধ্যে নেই কোনও মির‍্যাকল।'

ইন্দ্রনাথ স্মিতমুখে বললে—'ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু চোখেও দেখলাম না—এত ফাইন হাত সাফাই করলেন।'

'কি করলাম?'

'সিকি-র হেড-এর দিকে আমাদের মন ঘুরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়বার যখন ন্যাপকিন চাপা দিলেন, তখন মরিচ কৌটো তার তলায় ছিল না—ছিল আপনার পকেটে—চালান করেছেন আমাদের চোখের সামনে।'

'কারেক্ট,' পকেট থেকে মরিচকৌটো বের করে কবিতার হাতে দিয়ে বললে বেঙ্গল হুডিনি—'আমার মতো ভ্যানিশ করার ম্যাজিশিয়ানকেও ভড়কে দিয়েছে একটা বাচ্চা ছেলে।'

'কি করেছে?' কবিতা উদগ্রীব।

'একটা আস্ত মেয়েছেলেকে ভ্যানিশ করে দিয়েছে।'

গালে হাত দিয়ে ফেললো কবিতা—'সেকী! এক্কেবারে আস্ত?'

'আর বলেন কেন। একটু ভারি ভারি চেহারা। মুখশ্রী ভালোই। লাবণ্য আছে। চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে কথা বলে। গায়ে পড়েই বলে। আলাপটা সেই জন্যেই জমেছিল।'

'গায়ে পড়ে কথা বলেছিল বলে?'

'আজ্ঞে। আমি অত গায়ে পড়া নই। তার ওপর এই তো চেহারা—মেয়েরা একবার দেখেই দূর দিয়ে হাঁটে। কিন্তু সেদিন দূরে পালাবার উপায় ছিল না। একটা মাত্র বেঞ্চি। দুটো মাত্র বসবার জায়গা। একপাশে আমি, আর একপাশে তিনি।'

'বেঞ্চিটা কোথায় ছিল?'

'বাস স্ট্যাণ্ডে। রাত দশটার বাস ছেড়ে গেছিল—পরের বাস রাত দেড়টায়।'

'একা একা অত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'ম্যাজিক দেখাতে। আমি কিন্তু শহুরে ম্যাজিশিয়ান নই। শহর থেকে দূরে ম্যাজিক দেখাই, পয়সা কামাই।'

'ঢাকঢোল পিটিয়ে শহরে ম্যাজিক দেখানোর খরচ অনেক বলে?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'কিন্তু শুনেছি, ম্যাজিশিয়ানদের লটবহর অনেক থাকে। ওজন প্রায় একটন?'

'যথার্থ শুনেছেন, আমার জিনিসপত্তরের ওজন একটন না হলেও কম নয়। ট্রেনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আগেই, সাঙ্গপাঙ্গ সমেত। যেখান থেকে পাঠিয়েছি, সেখানেই বিকেল পর্যন্ত ম্যাজিক দেখিয়েছি। নেক্সট শো হবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরের আর একটা জায়গায়। লটবহরের সঙ্গে গেলে টায়ার্ড হয়ে যাবো বলে যাইনি। ভেবেছিলাম, মালপত্তর পৌঁছে যাক, আমি বাসে করে দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবো, তারপর টেনে ঘুমোবো। ওদের আগে পাঠিয়েছিলাম সেইজন্যেই—ঘুমের জায়গা ঠিক করে রাখার জন্যে। হোটেল অথবা সরাইখানা। কিন্তু রাত দশটার বাসখানা সাঁ করে নাকের ডগা দিয়ে চলে গেল। আমি বসে পড়লাম বেঞ্চিতে। আলো অন্ধকারে দেখলাম হেলতে দুলতে নধর কান্তি সেই মেয়েছেলেটা এসে বসে পড়লো আমার পাশে।'

'তারপর?' কবিতা বাঁ গাল থেকে হাত নামিয়ে ডান গালে হাত দিয়েছে।

'বক বক করে গেল নিজে থেকেই। আগড়ুম বাগড়ুম কত কি কথা। আমার মতো একটা লক্কর লোকের সঙ্গে যে মেয়ে ননস্টপ কথা বলে যেতে পারে, তার সঙ্গে একটু কথা না বলে পারা যায় না। হ্যাঁ-হুঁ ছাড়াও।'

'যৌন-কর্মী-টর্মী নয়তো?'

'আজ্ঞে না। ওদের গন্ধ আমার নাকে ঠিকই আসে। এ মেয়েটি...মহিলাটি...বিলক্ষণ কালচার্ড...কথায়...চাহনিতে...বডি ল্যাংগুয়েজে।'

তরল চোখে কবিতা বললে—'ও ল্যাংগুয়েজটা তাহলে বোঝেন?'

'কী মুশকিল! আমি যে ম্যাজিশিয়ান। মানুষের শরীরের ষাট মহাপদ্ম কোষের ভাষা বুঝতে পারি।'

'মাই গড! তারপর কি হলো? মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করা হলো, তাইতো?'

'আজ্ঞে না। ওই পাঠশালায় আমি পড়িনি। যারা ফ্যান, ইয়ে ভক্ত, আগ বাড়িয়ে তাদের নাম জিজ্ঞেস করতে নেই। খেলো হয়ে যেতে হয়।'

'আপনার ফ্যান বুঝলেন কি করে?'

'কথা শুনে। মরুকগে। গপ্পো করতে করতে কখন যে সময় কেটে গেছে, বুঝতেই পারিনি। রাত দেড়টায় বাস আসতেই হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম দু'জনে। ভাগ্য ভালো, একটা ডাবল সিট খালি পেলাম। আমি বসলাম জানলার পাশে, সে বসলো আমার পাশে।'

'ফাইন,' গল্পে জমে গেছে কবিতা—'তারপর?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'সেকী! গায়ে গা ঘেঁষে একটা আস্ত মেয়েছেলে বসে, আর আপনি কিনা ঘুমিয়ে পড়লেন!'

করুণ কণ্ঠে বললে বেঙ্গল হুডিনি—'অনেক জন্ম আগে আমি বোধহয় কুম্ভকর্ণ ছিলাম। জানি, ঘুমোলে আমার নাক ডাকে, তবুও ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'পুণ্যবান পুরুষ। একসময়ে ঘুম নিশ্চয় ভেঙেছিল—'

'নিশ্চয়। গন্তব্যস্থান আসতেই বাসের কনডাকটার ডেকে দিয়েছিল। দেখেছিলাম, পাশের সেই মেয়েছেলেটা নেই। সিট ফাঁকা।'

'মন হু-হু করেনি?'

'অবাক হয়েছিলাম। এত গায়ে পড়া মেয়েটা গায়ে গা দিয়ে এতক্ষণ বসে থাকার পর বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল—কিস্‌সু বলে গেল না। কিন্তু লিখে দিয়ে গেছিল।'

'প্রেমপত্র?'

'নো, ম্যাডাম, নো। সে গুড়ে বালি। আমার কপালে প্রেম নেই।'

'তবে কি লিখেছিল?'

'চলিলাম খাঁচায়।
হে বন্ধু, বিদায়!'

'বাংলায়?'

'আজ্ঞে।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু মানে?'

'নিজের নাম।'

'লেখেনি।'

'আশ্চর্য মেয়েছেলে তো! লেখাটা কোথায় পেলেন?'

'আমার জামায় সেফটিপিন দিয়ে গেঁথে গেছিল। দাঁড়ির তলায় একটা ফুটকি দিয়েছিল। অর্থাৎ, বিস্ময় চিহ্ন!'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে এবার হেসে ফেললো কবিতা।

'রসবতী মেয়েছেলে! যে পুরুষ মোষের মতো ঘুমোয় মেয়েছেলের গায়ে গা দিয়ে, তাকে—'

'মুখের মতো জুতো মেরে গেল—'

'যাকগে, যাকগে, বাস থেকে নামলো কোথায়?'

'সেইটাই তো মিস্ট্রি।'

'যথা?'

'আমার পাশেই, প্যাসেজের ওদিকের ডাবল সিটে, বসেছিল একটা বাচ্চা ছেলে। মায়ের সঙ্গে। বিচ্ছু ছেলে। ঘুমোয়নি। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে পাশের মেয়েছেলেটাকে খুঁজছি বুঝে, চিল্লিয়ে কি যেন বললো আমাকে। ভাষা বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম দুটো শব্দ : শশা পিঁজরা।'

'শশা পিঁজরা! বাঙালি নয়?'

'না মারাঠি। ওর মা ইংরেজি জানে। আমাকে বললে, আমার ছেলে বলছে, আপনার গার্ল ফ্রেণ্ড খরগোশের খাঁচায় নেমে গেছে।'

'শশা পিঁজরা মানে খরগোশের খাঁচা?'

'ভড়কি খেয়েছি তো সেই জন্যেই। দু'ঘণ্টার পথে খরগোশের খাঁচা তো রাস্তার ধারে নেই। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম। সে একগাল হেসে বললে, আজ্ঞে না, রাস্তার দু'পাশে শশা বিক্রী হয় না, খরগোশের খাঁচাও নেই।'

'তারপর থেকেই আপনার মন খারাপ?'

'হবে না? পরে কত খুঁজেছি, পুরো রাস্তাটার দু'পাশে খুঁজতে খুঁজতে গেছি? খরগোশের খাঁচা অথবা শশার ক্ষেত দেখিনি।'

'টিকিট কেটেছিল কোথাকার?'

'আমি তো কাটিনি। কোথায় যাচ্ছি শুনে নিজের আর আমার টিকিটের টাকা দিয়ে দিয়েছিল কনডাকটরকে।'

কবিতা বললে--'আপনি ভাগ্যবান। কলিকালে এমন মেয়েছেলে পাওয়া যায় না।'

'খুব ফাজিল মেয়েছেলে, ম্যাডাম। আমি হলাম গিয়ে একটা ম্যাজিশিয়ান, ভ্যানিশিং ট্রিক দেখিয়ে গেল আমাকেই।'

ঠিক এই সময়ে খুব আওয়াজ করে 'ড্রাই হুইস্কি' গ্রহণ করলো ইন্দ্রনাথ। অর্থাৎ, নস্যি নিলো।

বললে—'আপনি সেই ভদ্রমহিলাকে ফের ধরতে চান?'

'অবজেকশন! আই ওয়াণ্ট টু সলভ দ্য মিস্ট্রি! মেয়েছেলে-টেয়েছেলে আমার সহ্য হয় না।' বলেই, জিভ কেটে কবিতাকে বললে বেঙ্গল হুডিনি—'ম্যাডাম, কিছু মনে করলেন না তো?'

কবিতা তখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। চোখ নাচছে। কথা বলবে কী?

ইন্দ্রনাথ বললে—'আমি যদি ঠিকানাটা বলে দিই, দেখা করবেন?'

ভীষণ চমকে উঠে বেঙ্গল হুডিনি বললে—'আপনি চেনেন না কি?'

'জীবনে দেখিনি। কিন্তু ঠিকানাটা বলে দিতে পারি। দেখা করবেন?'

'বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন নাকি?'

'এই ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলো মোটামুটি জানি।'

'তার মানে? তার মানে?'

'পরে শুনবেন মানে। আগে বলুন, ঠিকানা যদি বলে দিই, দেখা করবেন?'

আড়চোখে কবিতার দিকে চেয়ে নিয়ে বেঙ্গল হুডিনি বললে—'আপনাদের যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে করবো।'

'শুধু আমাদের ইচ্ছেতেই নয়, মিস্টার ম্যাজিশিয়ান, আপনার ইচ্ছাতেও।'

'আমার ইচ্ছেতেও! কেন, আমার অমন ইচ্ছে হবে কেন?'

'সেই মহিলা পেশাদার ম্যাজিশিয়ানের ওপরে যান বলে। গুরু ম্যাজিশিয়ান-নি'র সঙ্গে দোস্তি পাতানোর ইচ্ছে হয়েছে বলে।'

'তা বটে! তা বটে!' আড়চোখে কবিতার দিকে আর একবার চেয়ে নিল বেঙ্গল হুডিনি—'বেশ, বেশ, দেখা না হয় করা যাবে। বলুন, কি ঠিকানা?'

মুখ থেকে আঁচল নামিয়ে কবিতা বললে—'ঠাকুরপো আধখানা শর্ত বলেছে,

বাকি আধখানা আমি বলে দিচ্ছি। বিয়ে করবেন মেয়েটাকে? আপনার আইডিয়াল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হবে।'

চোয়াল ঝুলে পড়লো বেঙ্গল হুডিনির—'আ-আমি বিয়ে করবো! এই অগামড়াকে কেউ বিয়ে করে?'

বরাভয় দেওয়ার ভঙ্গিমায় হাত তুলে কবিতা বললে—'ঘটকালি আমি করে দেব।—বলুন, রাজী?'

বেঙ্গল হুডিনির মুখের রঙ পাল্টে গেল। বিবাহ এমনই জিনিস। দিল্লিকা লাড্ডু!

কবিতা তর্জনী তুলে বললে ইন্দ্রনাথকে—'ঠাকুরপো, এবার ঝেড়ে কাশো। শশার খাঁচা মানে কী?'

নায়াগ্রা

অদৃষ্ট চিত্রকর আমার অদৃষ্টে কি কি লিপিচিত্র এঁকে দিয়ে গেছেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো ভবিষ্যৎবক্তা নই। কিন্তু বর্তমান নিয়ে খুব মেতে থাকি। অতীতের কথা আমাকে নিরন্তর শিক্ষা দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, বহু জন্মের ওপারের সুদূর অতীত এখনও ছায়াপাত করে চলেছে আমার ক্রিয়াকর্ম যৌবনধর্ম আচার-আচরণের মধ্যে। আমাকে কেউ বলে মোহিনী বহ্নিরূপিণী, কেউ বলে সুন্দরী অগ্নিশিখা, কেউ বলে কল্পনার কুহকিনী। আমি নাকি রূপকথার সুন্দর মিথ্যাকে বাকচাতুরির মুখোশপরা মিথ্যা দিয়ে যে কোনও পুরুষের মন জয় করতে পারি। রোমাঞ্চজনক ভাষা শিহরণ জাগিয়ে যেতে পারি। কেউ বলে, ওহে মলিনা, তোমার নারীপ্রকৃতি অতি দুরন্ত, অতি অবাধ্য—কিন্তু জীবন চঞ্চল।

কিন্তু এই মলিনা তো চিরকাল এমন মলিনা ছিল না। আমারও বালিকা বয়স গেছে, কৈশোরের চৌকাঠ আমাকেও পেরোতে হয়েছে, তারপর যৌবনের চিরবসন্তের সমীরণে উদ্বেলিত হয়েছি। আজ আমি দেহধারিণী বজ্রশিখা, আমার ঝমঝম শব্দের কথা দিয়ে পুং-শিরার রক্তের মধ্যে ঝিমঝিম নূপুরনিক্কণ শুনিয়ে যেতে পারি।

মলিনার বাল্যকাল কেটেছে নিতান্ত অবহেলায় এবং নিদারুণ প্রবঞ্চনায়। আমাকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় করে যেতে বিন্দুমাত্র বিবেকের তাড়না অনুভব করেনি আমার রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের। তখন আমার বয়স মোটে তেরো। আত্মীয়র চাইতে অনাত্মীয় যে অনেক হৃদয়বান, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম সেই সময়ে। সন্তানহীন এক দম্পতি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, যার কেউ নেই, তাকে মানুষ করবেন। আমি সাড়া দিয়েছিলাম। ঠাঁই পেয়েছিলাম। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নার্সিংবিদ্যা শিক্ষা করেছিলাম। একটি নার্সিংহোমে কাজও পেয়ে গেছিলাম।

তখন আমি বিশ বছরে পা দিয়েছি। কুঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি। বহুজনের কাছে মূর্তিময়ী বিস্ময়িণী হয়ে উঠেছি। কেননা, দেহধারিণী বজ্রশিখা হয়েও আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, বিবাহ আমার কাছে একটা বিভীষিকা।

বুঝে যারা গেছে, তারা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নাইট ডিউটি দেওয়ার সময়ে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। সেবাদাসী আমি ঠিকই, দেবালয়ে নয়, চিকিৎসালয়ে। তাই নিজেকে অর্পণ করতে পারিনি কোনোদিনই!

ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, সংক্ষেপে, আই-সি-ইউ, একটা আশ্চর্য জায়গা। যেন একটা ভিন্ন জগৎ। সেখানে দিনরাতের তফাৎ বোঝা যায় না, সময় সেখানে যেন স্থির হয়ে থাকে। সেখানে আমরা, এই সেবাদাসীরা ঘাড় ধরে অক্সিজেন দিই, ইনসুলিন দিই, ই-ই-জি নিই—মুমূর্ষুকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিই। শুধু শরীর নয়, মনগুলোকেও চাঙা করে রাখি কত রকমের গল্প করে—যেন আমরা সেবাদাসীরা তাদেরই বাড়ির মানুষ। কখনও কন্যাসম, কখনও জননীসম।

কিন্তু কখনোই বধূসম হওয়ার অভিনয় করি না। সেটা পাপ। সেবাধর্মে তা অন্যায়।

এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। আমার বর্ণময় জীবন নতুন এক বর্ণের সন্ধান পেল। সেই কাহিনীই এবার বলা যাক।

অ্যামবুলেন্স নিয়ে এল এক সত্তর বছরের বৃদ্ধকে। মৃত্যুপথের পথিক বললেও চলে। হার্ট প্রায় গেছে। মগজও ধসে পড়তে পারে যে কোনও সময়ে।

নিরন্তর কথা-চিকিৎসা আর ওষুধ-চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে আমরা সুস্থ করল্যাম। আমরা দুজন ছিলাম ডিউটিতে। রমলা আর আমি। রমলা নিখুঁত সুন্দরী না হলেও ললিত লোভন লীলা দেখিয়ে যেতে পারতো অনায়াসে। আমরা দুজন দু'পাশে থেকে অশক্ত বৃদ্ধদের শরীরেও শক্তির সঞ্চার ঘটিয়ে তাঁদের সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।

সত্তর বছরের সেই বৃদ্ধ তরতাজা হয়ে বাড়ি ফেরার আগে আমাকে আর রমলাকে দুটি কার্ড দিয়ে গেলেন।

এই ক'দিনে দিন-রাতবিহীন আই-সি-ইউ'তে কত কথা কত গল্পের মধ্যে দিয়ে জেনেছি, তিনি বিয়ের টোপর পরেননি, কিন্তু বিত্ত আছে প্রচুর। আর আছে প্রবঞ্চনা-প্রিয় বহু প্রিয়জন।

এই শেষের তথ্যটাই আমার বুকের অন্তস্থলে গরম শিকের খোঁচা দিয়ে গেছিল। মুখোশধারী প্রিয়জনদের ষড়যন্ত্রে আমিও তো একদা পথে দাঁড়িয়েছিলাম।

ডিউটি যখন থাকতো না, আমি আর রমলা যেতাম তাঁর সল্টলেকের ভারি সুন্দর একতলা বাড়িতে। বড় হুঁশিয়ার পুরুষ তিনি। প্রয়োজনের বাড়তি কোনও ঘর রাখেননি ছোট্ট বাড়িটায়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ করে দিয়ে যেত এক আধবুড়ো। তার নাম মদন। থাকতো ওই বাড়িরই পেছনের আউট হাউসে। গ্যারেজের পাশের ঘরে। মূল বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আর কারও বাড়িতে ঢোকা সম্ভব ছিল না। দুটো বাঘের মতো কুকুর বাড়িঘেরা বাগানে টহল দিত সারারাত। সল্টলেক ডাকাতির জন্যে কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বৃদ্ধ ছিলেন নিশ্চিন্ত। খুব অসুস্থ হলে কলিং বেল টিপে মদনকে ডাকতেন। অথবা, মোবাইলে ডাক্তার ডাকতেন। ল্যাচ-এ চাবি থাকতো বন্ধু ডাক্তারের কাছে। মদনের কাছেও নয়। বৃদ্ধ যখন বিকেলে বেড়াতে বেরোতেন, দরজায় বাড়তি তালা ঝুলিয়ে যেতেন। চাবি রাখতেন নিজের কাছে।

বাড়িটাকে দুর্ভেদ্য দুর্গ করে রাখার আর একটা কারণ ছিল। ক্রমে ক্রমে তা বলব।

আগেই বলেছি, রমলা আর আমি দুজনে যেতাম। একসঙ্গে। রমলা থাকতো মানিকতলায় আর আমি বেলেঘাটায়। রমলার বাবা-মা'ও অবসর নিয়ে জীবনের শেষদিনগুলো কাটাচ্ছিলেন সি-আই-টি ফ্ল্যাটে। আমার পালক বাবা-মা'ও ছিল একই পথের পথিক। সি-আই-টি ফ্ল্যাটেই জীবন কাটিয়ে আনছিল। এ-সব ফ্ল্যাটে ভাড়া অতি সামান্য। মাত্র পঁচিশ টাকা, কি তার একটু বেশি। একেবারে ওনারশিপ ফ্ল্যাটের মতো ব্যাপার। সুতরাং, সারাজীবন ধরে খেটেখুটে রোজগার করা টাকা

পোস্ট অফিসের ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে রেখে প্রতি মাসে সেই টাকার সুদে বেশ চলে যাচ্ছিল।

এর ওপর ছিল আমাদের নিজস্ব রোজগার। দুজনের গুরুজনরাই কিন্তু আমাদের রোজগারের টাকায় হাত দিতেন না। আমাদেরকেও হাত দিতে দিতেন না। পোস্টাফিসে টাকা জমাতে শিখিয়েছিলেন। বিয়ের সময়ে যাতে টাকা পাওয়া যায়।

সুতরাং আমরা ভালই ছিলাম। আমি আর রমলা। যে-বৃদ্ধর কথা বলতে বলতে অন্য কথায় চলে গেছিলাম, এবার তাঁর কথা বলি। তিনি আমাদের স্নেহ করতেন। বিকেলের দিকে রমলাকে নিয়ে আমি চলে যেতাম তাঁর বাড়িতে। চা-জলখাবার খেতাম। ঘণ্টা কয়েক গল্প-টল্প করতাম। বাঘের মতো কুকুর দুটো আমাদের খুব ন্যাওটা হয়ে গেছিল। আমাদের গা শুঁকতো। পায়ের কাছে এসে বসে থাকতো। বাড়ির চব্বিশ ঘণ্টার চাকর-কাম-দারোয়ান মদন আমরা গেলে খুব খুশি হতো। বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ মনিব কিছুক্ষণের জন্যে হলেও হাল্কা হাসি-ঠাট্টা নিয়ে থাকতেন দেখে খুব খুশি হতো।

মাঝে মাঝে আসরে আসতেন বৃদ্ধের সেই বন্ধু ডাক্তার। তিনি হার্ট বিশেষজ্ঞ। কিন্তু রোজ আসতেন না। সময় পেতেন না। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, এই বৃদ্ধকে মরণাপন্ন অবস্থায় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ইনিই পাঠিয়েছিলেন।। বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। আমাদের সেবাযত্নের প্রশংসা করতেন পঞ্চমুখে।

যে-বৃদ্ধের সঙ্গে নির্মল হাসি-ঠাট্টার শিহরণ বিনিময় করতে রোজ যেতাম, তাঁর নামটা এখনও বলিনি। একদম সেকেলে নাম, রামহরি ভট্টাচার্য। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। সত্তরে পা দিয়েছেন বলে মনে হতো না। যেন, ঘাট ছুঁই-ছুঁই। বেশ লম্বা। মুখে হাসি লেগেই থাকতো। এবং বিলক্ষণ রগুড়ে।

দুই নাতনির বয়সী যুবতীর কাছে রঙ্গরসের কথাও বলতেন বইকি। আমরাও রসের যোগান দিয়ে যেতাম। এইভাবে, একদিনে নয়, অনেক দিনে, আমরা তিনজনে মনের দিক দিয়ে এক হয়ে গেছিলাম।

তারপর...

তারপর একদিন উনি দেহের দিক দিয়ে এক হতে চাইলেন।

ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে।

আমরা ওঁকে দাদু বলে ডাকতে শুরু করেছিলাম। উনিও আমাদের নাতনি বলে ডাকতেন। সরস কথাবার্তা ফলে সহজতর হয়ে উঠেছিল। ওঁর বই পড়ার প্রচণ্ড শখ ছিল। বাংলা নয়। ইংরেজি। শোবার ঘরের দেওয়ালের তাকে রাশি রাশি বই থাকতো। দিনে পড়তেন। রাতে পড়তেন। আর এন্তার গল্প শোনাতেন আমাদের। শুনতে খুব ভাল লাগত আমাদের। বাংলা গল্পগুলো নর-নারীর সম্পর্ক খুলে বলে না। শালীনতা রাখে। কিন্তু ইংরেজি গল্প-উপন্যাসে সে-সব বাঁধন নেই। বড় খোলামেলা। ফলে, ভালই লাগতো আমাদের। শিখতামও অনেক কিছু।

একদিন উনি বডি-এনার্জির একটা উপন্যাস শোনালেন। যেহেতু আমরা দুজনেই নার্স, তাই মানুষের শরীরে যে এক ধরনের লাইফ-ফিল্ড আছে, এই সিক্রেট নলেজে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মানুষে মানুষে এই জীবনীশক্তি বিনিময় চলে।

দীর্ঘ আয়ুলাভের তত্ত্ব যাঁরা জানতেন সেকালে, তাঁরা এই খবর রাখতেন। ছোট ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্যে থাকলে বুড়োবুড়িদের আয়ু বেড়ে যায়। শিক্ষকরা দীর্ঘজীবী হতেন এবং এখনও হন এই কারণে।

এই গেল লাইফ-ফিল্ড নিয়ে গল্পগুজবের অবতারণা। তারপর উনি চলে এলেন নিগূঢ়তম প্রসঙ্গে। বৃদ্ধরা তরুণী ভার্যা রাখতেন কেন? দীর্ঘায়ু হবার জন্যে। একাধিক উপপত্নী রাখা হতো কেন? দীর্ঘায়ু হবার জন্যে।

যে বইখানা পড়তে পড়তে আজব এই আলোচনার শুরু, সেই বইয়ের কথা বললেন সবশেষে। এক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দীর্ঘায়ু তত্ত্ব বিজ্ঞানের গবেষণা করতে গিয়ে ল্যাবোরেটরিতে শুধু তরুণী অ্যাসিস্ট্যান্ট রেখেছিলেন। নিছক সান্নিধ্যসুখের জন্যে, নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে। উদ্দেশ্য যখন সাধু, তখন ছ'জন তরুণীর কেউই তাতে আপত্তি করেনি।

ফলে, প্রতিদিন নিয়ম করে ছয় তরুণী তাদের জীবনীশক্তি, লাইফ-ফিল্ড এনার্জি, দান করে গেছিল বৃদ্ধকে।

গবেষণার রেজাল্ট? পিলে চমকানো। এবং সেটা কী, তার বিস্তারিত বর্ণনার দরকার নেই।

মোট কথা গবেষণা হয়েছিল সাকসেসফুল।

সেইদিন সন্ধে পর্যন্ত এই গল্প শুনে রীতিমতো অবাক আমি আর রমলা বাড়ি ফিরলাম। ফেরার পথে যেসব যুক্তি-পরামর্শ করেছিলাম, সে সব লিখেও দরকার নেই।

পরের দিন আমরা দুজনে গিয়ে রামহরি ভট্টাচার্যকে বললাম—"আচ্ছা, ওই যে বুড়ো বৈজ্ঞানিকের গপ্পোটা আপনি শোনালেন, তার মধ্যে একটা প্রসঙ্গ কিন্তু আপনি বাদ দিয়ে গেছেন।"

উনি বললেন—"সেটা কী?"

আমরা বললাম—"লাইফ-ফিল্ড একটা অমূল্য শক্তি। এই শক্তি যারা দিয়েছে, সেই ছয় তরুণী তা দান করেছে, না বিক্রি করেছে?"

হো-হো করে হেসে রামহরি ভট্টাচার্য বললেন—"কি সর্বনেশে প্রশ্ন রে বাবা! বিক্রিই তো করেছে। মোটা বখশিস পেয়েছে।"

আমরা বললাম হেসে হেসে, চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বললাম—"এই নাতনি দুটোকে কি দেবেন?"

শুনে, খুব হেসেছিলেন রামহরি ভট্টাচার্য। তারপর খুব সহজভাবে বলেছিলেন—"কিন্তু শক্তি দেব বললেই তো হয় না, সে শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা তো চাই।"

আমরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করে নিয়ে বলেছিলাম—"ভুলে যাবেন না আমরা নার্স। ও বিদ্যে জানা আছে।"

"আমারও জানা আছে," বৃদ্ধ প্রকৃতই বিজ্ঞ—"সঙ্গে আনা হয়েছে নাকি?"

"স্যাম্পেল তো দিয়ে যায়। আছে কাছেই। কিন্তু কি দামে?"

"স্যাম্পেলটার?"

"ধুস। শক্তিটার।"

"আপনি বলুন।"

বৃদ্ধ তখন আলমারি খুলে একগোছা ইন্দিরা বিকাশ পত্র বের করলেন। বললেন—"মোট ছ'লাখ আছে। রমলা, তুমি নাও তিন। মলিনা, তুমি নাও তিন। দাম ঠিক আছে?"

"আছে।"

আমরা জানতাম, বন্ধু ডাক্তার আড্ডা মারতে এলে রাত আটটার আগে আসেন না। ল্যাচ লক করা থাকে না ভেতর থেকে। রামহরি ভট্টাচার্যকে বিছানা থেকে না টেনে এনে নিজেই চাবি দিয়ে লক খুলে ভেতরে ঢুকতেন।

আমি আর রমলা সাতটার সময় চলে গেলাম। ইন্দিরা বিকাশ পত্রগুলো ভাগ্যভাগি করে নিয়ে।

এমনই কপাল, সেদিনই রাত আটটায় বন্ধু ডাক্তার এসে দেখেছিলেন, রামহরি ভট্টাচার্য মরে কাঠ হয়ে রয়েছেন বিছানায়। উনি কি বুঝেছিলেন, ঈশ্বর জানেন। তবে, ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন—হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল, মৃত্যু সেই কারণেই।

সেই রাতেই শবদাহ হয়ে গেছিল ইলেকট্রিক চুল্লিতে।

সে খবরটা পেলাম পরের দিন নার্সিং হোমে অন ডিউটি থাকার সময়ে। রিসেপশনিস্টের স্লিপে লেখা দেখে জানলাম, কবিতা রায় নামে এক ভদ্রমহিলা আমাদের দুজনের সঙ্গেই দেখা করতে চান।

গেলাম দেখা করতে। কিন্তু সেই ঘরে ঢুকে দেখলাম, ভদ্রমহিলা একা আসেননি, সঙ্গে দুজন ভদ্রলোককে এনেছেন। এই দুজনের একজন খুব সুপুরুষ। ব্যায়ামবীরের মতো পেটাই শরীর। গোঁফ সরু করে ছাঁটা, বাজপাখির মতো নাকের তলায় যেন ডানা মেলে রয়েছে বাজপাখি নিজেই। গায়ে গরদের পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতি। সারা ঘর মাতিয়ে রেখেছেন ল্যাভেণ্ডারের সুগন্ধে।

আমাদের দুজনের অবাক চাহনির দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করলেন ইনিই—"দরজাটা ভেজিয়ে দিন। ঠিক আছে। আমার নাম স্লিপে লিখলে যদি না আসেন, তাই এঁর নাম লিখেছি,"—ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে—"ইনি কবিতা রায়, আর ইনি ওঁর স্বামী মৃগাঙ্ক রায়।"

এই পর্যন্ত শুনেই কাঠ হয়ে গেছিলাম দুজনেই। কেননা, দুটো নামই আমাদের জানা। দুজনেই যে গোয়েন্দা গল্প পড়ি। ইনি যদি সেই লেখক মৃগাঙ্ক রায় হন, আর এই ভদ্রমহিলা যদি ওঁর স্ত্রী কবিতা রায় হন, তাহলে এই সুদর্শন পুরুষের পরিচয় তো গল্প-উপন্যাসেই পেয়েছি।

সুদর্শন ভদ্রলোক আমাদের চোখ দেখেই মনের কথা পড়ে নিলেন। একটুও না হেসে বললেন—"মৃগাঙ্ক আপনাদের নিয়ে একটা গল্প লিখবে ভাবছে—"

আমি ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—"সেই গল্পের নাম হোক নায়াগ্রা।"

মুখ লাল হয়ে গেল কবিতা রায়ের।

স্যালমন সাহেবের সিন্দুক লুঠ

স্যালমন সাহেব কিন্তু মোটেই সাহেব নন। খাঁটি বাঙালি। উদ্বাস্তু হওয়ার পর মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গোটা পৃথিবীটাকে একাধিকবার চরকি পাক মেরেছেন জাহাজে চেপে। পাক্কা ছ-ফুট লম্বা। টকটকে ফরসা। মাথার চুল একটু পাতলা হয়ে এলেও তিনি যে এই ষাট ঊর্ধ্ব বয়সেও প্রচণ্ড প্রাণশক্তির আধার, তা ফেটেফুটে বেরিয়ে আসতে চায় ঈষৎধূসর চোখের চাহনি, শক্ত নাকের পাটা আর কঠিন ঠোঁটের ভঙ্গিমায়। বিশাল জাহাজে আধিপত্য করেছেন, মহাসাগরদের মাথায় নেচে নেচে বেড়িয়েছেন, অবসর নিয়েও তিনি জীবনীশক্তির অপচয় বরদাস্ত করতে পারেন না।

তাই, গ্রেট আটলান্টিক স্যালমন মাছেরা নিহত হয়ে চলেছে কেন, এই হত্যা-রহস্যের তদন্তে মেতে গেছেন। কলকাতায় থাকলেই আসতেন আমাদের রবিবাসরীয় আড্ডায়। আটলাণ্টিক স্যালমন কাহিনি যে নিছক মার্ডার মিস্ট্রি নয়; হিত-কাহিনিও বটে, তা তাঁর অ্যাডভেঞ্চারময় জীবন কাহিনি শুনিয়ে আমার মতো এই ঘরকুনো লেখক বাঙালির মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতেন। আটলাণ্টিক স্যালমনদের মার্ভেলাস জীবন প্রবাহ শুনিয়ে আমাদের নিঃশ্বাস রোধ করে রাখতেন। বলতেন, মাছ তো নয়, যেন ম্যাজিক বুলেট, ডিম পাড়ে সাত হাজার, নোনা জলে গিয়ে টিকে যায় মোটে তিনটে থেকে পাঁচটা। আটলাণ্টিকের দু-দিক থেকে ওরা ছুটে যায় গ্রীনল্যাণ্ডের জলে, সেখানে এক বা একাধিক শীত কাটিয়ে, হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে, শুধু গন্ধ শুঁকে ফিরে যায় যে-যার জন্মস্থানে—ওদের পথ দেখায় পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ড, চাঁদ, সূর্য আর তারাদের অবস্থান। যেখানে থাকে, সেখানে গায়ের রংও পালটে নিতে পারে। কখনও কালো, কখনও ঝকঝকে। বৃহত্তম আটলাণ্টিক স্যালমনের ওজন পঁচিশ কিলোগ্রাম তো বটেই।

এত গল্প ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্রের বৈঠকখানায় বসে বলতেন আর হো হো করে হাসতেন—'আমিও ডিটেকটিভ, সায়েন্টিফিক ডিটেকটিভ। আপনারা ডাঙার মিস্ট্রি সলভ করেন, আমি সলভ করতে চাই সমুদ্রের মিস্ট্রি। তারপর লিখব এমন একটা ডিটেকটিভ স্টোরি যা মাথা ঘুরিয়ে দেবে দুনিয়ার মাছখেকোদের।'

কিন্তু তার আগেই নিজের মাথায় চোট পড়ল ভদ্রলোকের। পর-পর তিনবার। নিজের ঘরে।

সেইসঙ্গে লুঠ হয়ে গেল সিন্দুক ভর্তি টাকা।

সেই কাহিনিই শুরু হোক এবার।

শুধু আমরাই ওঁকে স্যালমান সাহেব বলে ডাকতাম। কিন্তু উচ্চবিত্ত মহলের ওঁর বন্ধুরা ওঁকে বলতেন সান্যাল সাহেব। পূর্ববঙ্গের জমিদারি রক্ত ধমনিতে ছিল

বলেই অমন চেহারাখানা আর দুর্জয় সাহস পেয়েছিলেন। আর. এই অতি অভিজাত রক্তের সংকেত উপেক্ষা করতে পারেননি বলেই দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত অঞ্চলের ফ্ল্যাট কালচার সহ্য করতে পারেননি। বহুতল ভবনের বিশাল অ্যাপার্টমেণ্ট ছেলেকে দিয়ে নিজে কিনেছিলেন বেলেঘাটার নিরালা অঞ্চলে বাগান ঘেরা একটা দোতলা বাড়ি—এককালে যা মুখরিত হয়ে থাকত নৃত্যময়ী ললনাদের নূপুরনিক্কণে।

স্যালমন সাহেব কিন্তু ওই পাঠশালায় পড়েননি। বিয়ে একটা করেছিলেন বটে, সহধর্মিণী স্বর্গে চলে গেলে মর্তের কোনো অপ্সরীদের আর পাত্তা দেননি। তাঁকে দেখলে, তাঁর কথা শুনলে, সত্যিই মনে হত যেন স্বয়ং শিবঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছি।

বিশাল বাড়িটার মস্ত নাচঘরে বানিয়েছিলেন স্যালমন মিউজিয়াম। মোটা কাচের মস্ত অ্যাকুয়ারিয়ামে ভাসিয়ে রাখতেন বিশালদেহী স্যালমনদের—জীবন্ত নয়, আসল নয়—কাচ আর পাথুর দিয়ে গড়া। আলোক-শিল্পীকে দিয়ে এমন আলোর ম্যাজিক সৃষ্টি করে যেতেন যে মনে হত, নকল নয়, আসল স্যালমন ঘুরে বেড়াচ্ছে চোখের সামনে। রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চলমান রাখতেন স্যালমনদের। কোথাও দেখা যেত, সিলমাছ তাদের ঠুকরে খেতে যাচ্ছে, কোথাও জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঝকঝকে স্যালমন জলেই গোঁৎ খাচ্ছে।

এরকম আশ্চর্য মিউজিয়াম কলকাতা শহরে কেন—এই ভারতের কোনো শহরে নেই।

আমাদের এই গল্প কিন্তু মিউজিয়াম নিয়ে নয়, মিউজিয়ামের মাথা যিনি, তাঁর মাথা নিয়ে। পর পর তিনবার সিসে ভর্তি ঝাঁটার হ্যাণ্ডেল দিয়ে মাথায় মারার ফলে তাঁর নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেছিল। প্রাণে বেঁচে গেছিলেন বটে, কিন্তু সিন্দুক থেকে উধাও হয়েছিল কড়কড়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

বেলেঘাটায় সুভাষ সরোবরের ধারে ইন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে তাঁর একদা নাচমহল বাড়ি বেশি দূরে নয় বলেই রবিবার হলেই সকালবেলা হাওয়া খেতে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে আসতেন, আর সমুদ্রের গল্পের হাওয়া দিয়ে আমাদের মগজের কোষগুলো থেকে কলকাতার হাওয়া তাড়িয়ে দিয়ে ফের হাওয়া হয়ে যেতেন।

এই রকম এক রবিবারে গল্পের টানে আমি আর কবিতা ইন্দ্রনাথের সাদামাটা বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম, তন্ময় হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে বন্ধুবর। আর হাতের কাছে রেখেছে টেলিফোন যন্ত্র।

আমরা বাড়ি কাঁপিয়ে বাড়িতে ঢুকেছি, অথচ ইন্দ্রনাথ একটুও না কেঁপে কাগজ পড়ে যাচ্ছে দেখে অবাক হয়েছিলাম। কবিতা যখন ওর শানানো জিভখানা চালাবে কিনা ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে ইন্দ্রনাথ চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে উত্তেজনা ঠাসা গলায় বললে, 'কী আশ্চর্য! অজাতশত্রুর মাথায় ডাণ্ডা! পঞ্চাশ লাখ উধাও!'

বলেই, কাগজখানা গছিয়ে দিল আমার আর কবিতার হাতে। নিজে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

ফলে, আমাদের হর-পার্বতীর চার চোখ রইল বটে কাগজের দিকে, কিন্তু চার কান রইল টেলিফোনে ইন্দ্রনাথ যা বলছে, সেই দিকে। আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম ইন্দ্রনাথের এক তরফা কথা। পরে শুনেছিলাম ও তরফের কথা। যেহেতু, গল্পকে খোঁড়া করে রাখলে গল্পকারকে পুন্নাম নরকে যেতে হয়, সেই ভয়ে দু-তরফের কথাই নিচে তুলে ধরছি।

ইন্দ্রনাথ : হ্যালো জয়ন্ত?

জয়ন্ত : কাগজে পড়লি?

ইন্দ্রনাথ : পড়লাম। স্যালমন সাহেবকে, ইয়ে, মিস্টার ধনঞ্জয় সান্যালকে, তাঁরই টেবিলের পেছনের মেঝেতে পাওয়া গেছে। খুলি ফ্র্যাকচার-এর ফলে প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছে। সিসে দিয়ে ভারি করা একটা ঝাঁটার হ্যাণ্ডেল দিয়ে তাঁর মাথার পেছনে তিনবার চোট মারা হয়েছে। তাঁর সিন্দুক লুঠ হয়ে গেছে। তাঁর মুমূর্ষু বডি প্রথমে দেখেছে সেক্রেটারি টাইপিস্ট ভ্রমর সরকার, আর লাইব্রেরিয়ান গজানন গম্ভীর। বিশেষ সংবাদদাতা সবিনয়ে জানিয়েছেন, তাঁদের 'জিজ্ঞাসাবাদ' করা হচ্ছে।

জয়ন্ত : ঠিক আছে, ঠিক আছে, টেলিফোনে সব কথা হয় না। আমি তোর কাছে যাব বলে পা বাড়িয়েছি, এমন সময়ে পেছনে ডাকলি। টেলিফোন রেখে দে। আমি আসছি।'

ফলে, বেলা ঠিক দশটার সময়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্র-র দীনহীন বাসভবনে মূর্তিমান তুফান ঝড়ের মতো আবির্ভাব ঘটেছিল প্রখ্যাত পুলিশ অফিসার জয়ন্ত চৌধুরির—যে কিনা আমাদের ঘনিষ্ঠতম-তম-তম বন্ধু।

সুভাষ সরোবরের ওপরে তখন গ্রীষ্মের গরম হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে। জানলা থেকেই ঝিকিমিকি নক্ষত্রশোভা দেখা যাচ্ছে—দিবালোকের নক্ষত্র।

আবির্ভূত হয়েই জয়ন্ত বলেছিল, 'স্যালমন সাহেবের জ্ঞান রয়েছে। এইমাত্র কথা বলে এলাম।'

ইন্দ্রনাথ পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে কবিতাকে বললে, 'বউদি। উইথ ইয়োর পারমিশন একটু ড্রাই হুইস্কি নিচ্ছি।'

চোখ কপালে তুলে কবিতা বললে, 'নস্যি আবার শুকনো হুইস্কি হল কবে থেকে?'

'আজ থেকে। তোমার সামনে। হুইস্কি জাতে ওঠা নেশা, নস্যি নয়। জয়ন্ত, সেক্রেটারি আর লাইব্রেরিয়ান যে স্টেটমেণ্ট দিয়েছে, স্যালমন সাহেব তা খারিজ করেছেন তো?'

'না। কনফার্ম করেছেন।'

'প্রতিটি খুঁটিনাটি?'

'প্রতিটি খুঁটিনাটি।'

ইন্দ্রনাথ এতক্ষণে ড্রাই হুইস্কিকে গ্রহণ করল। প্রায় তূর্যনিনাদসহ।

বললে, 'ঠিক যা ভেবেছিলাম, তাই হল।'

সক্ষোভে জয়ন্ত বললে, 'আমি কিন্তু ঠিক তা ভাবিনি। এখনও ভাবতে পারছি না। এসেছি সেই কারণেই। মাথায় ডাণ্ডা হাঁকিয়ে ঠাণ্ডা করে দিয়ে মালকড়ি নিয়ে চম্পট দেয় চোর। সবাই তা জানে। এতদ্‌সত্ত্বেও, আমি মনে করি, ডাহা মিথ্যে বুকনি ছাড়ছে ভ্রমর সরকার আর গজানন গম্ভীর। কি বিচ্ছিরি নাম। গজানন গম্ভীর।—একী!'

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে সাদা শাড়ি আর ব্লাউজ পরা এক ফরসা তরুণী। তার শোভন কটি ছিপছিপে শরীরে উৎসাহী উচ্চারণ নেই, কিন্তু নির্মল শিহরণ আছে। স্বল্পবাসের সুচারু সাহস না দেখিয়েও সে প্রচণ্ড সুন্দরী। সে আরক্তকপোলা, স্বল্পকুন্তলা এবং মুক্তানয়না।

দূরাগত স্বরের অনুকরণে যেন, অন্তর্বচন বেরিয়ে এল জয়ন্ত চৌধুরির গলা দিয়ে, 'ভ্রমর সরকার।'

ইন্দ্রনাথও যে চমকে গেছে, তা তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। স্যালমন সাহেবের সেক্রেটারি নিশ্চয় শুষ্ক বিশ্বোষ্ঠী হবে, এইরকম একটা আশা বোধহয় করেছিল। কিন্তু এই কন্যা যে বিশ্বসুন্দরীর কাছাকাছি যায়।

পর্যায়ক্রমে ইন্দ্রনাথ আর জয়ন্তর দিকে দীপ্তনয়না তাকিয়ে যাচ্ছে দেখে ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

নাগকন্যা ছন্দে চারু তনুবর বেঁকিয়ে ধরে ভ্রমর সরকার বললে, 'কিন্তু কী আশ্চর্য! যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই যেন মিস্টার জয়ন্ত চৌধুরি আমাকে ফলো করছেন, অথবা আমি ওঁকে ফলো করছি।'

জয়ন্ত এমনভাবে ঘাড় নেড়ে গেল যার মানে সায় দেওয়া হয়, আবার, সায় না দেওয়াও হয়।

মুখে বললে, 'মিস সরকার, ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়িয়ে গেল দেখা যাচ্ছে। যাইহোক, এখানে কি মনে করে? নতুন কিছু বলার আছে নাকি?'

'আছে তো বটেই। কিন্তু সেটা শুধু ইন্দ্রনাথ রুদ্র-কে বলতে চাই।'

'একা পেতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'শেষ ভরসা বলে। শুনেছি, কেউ এখানে তাড়া খায় না, কুকুরেও নয়।'

'ননসেন্স।' বললে ইন্দ্রনাথ। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল ঝকঝকে কথাগুলো তার মন ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু মনের ভাব মুখে যাতে প্রকাশ না পায়, তাই 'ড্রাই হুইস্কি' পর পর দু-বার গ্রহণ করল এমন সশব্দে যে কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত ফানুস লাইটও বুঝি দুলে উঠল শব্দের তরঙ্গে।

কটমট করে চেয়ে রইল কবিতা। কিন্তু প্রচণ্ড সুন্দরীর উপস্থিতিতেই বোধহয় 'ন্যাস্টি' শব্দটা মুখ দিয়ে বের করল না।

জয়ন্ত আর কী করে। সুদর্শন ইন্দ্র যখন সুদর্শনার চাটুবাক্য-টোপ গিলেই ফেলেছে এবং অবশ্যই বঁড়শি গাঁথা হয়ে গেছে, তখন হাল ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করেছিল।

অথচ শুধু যে নারীর ললিত শোভনলীলা দিয়েই ইন্দ্রনাথের মতো ঝানু গোয়েন্দাকে গাঁথা হয়েছে, তা তো নয়। সুন্দরীর কথায় অন্তরের ভাষা অতি সুস্পষ্ট এবং সে ভাষা নিখাদ—নিজের সততায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলে এমন অনাবিল কাঠিন্য কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করতে পারে না, ইন্দ্রনাথের আমন্ত্রণের জন্যে দাঁড়িয়ে না থেকে টুপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে এবং সুঠাম পিঠ খাড়া করে সটান চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথের চোখের দিকে। কিন্তু নিশ্চল নয় তার দু-হাত কোলে রাখা শ্বেতশুভ্র (শাড়ি আর ব্লাউজের সঙ্গে মানানসই সাদা রঙের)। হ্যাণ্ডব্যাগ পটাপট শব্দে ক্রমান্বয়ে খুলে এবং বন্ধ করে গেল। সুচারু দশ নখের রক্তিম লীলা-নৃত্যর দিকে না চেয়ে ইন্দ্রনাথ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল তার দুই বঙ্কিম ভুরুযুগলের সন্ধিস্থলের লোহিত বিন্দুটার দিকে।

লাল টিপ অনেক মেয়েই পরে, কিন্তু গোটা আননটাকে এমন অপরূপা করে তুলতে পারে না। যেন শ্বেত প্রস্তরে ছোট্ট একটি রক্তবিন্দু।

একটু ঝুঁকে বললে শরীরী বিদ্যুৎ, 'খুবই সিম্পল ব্যাপার। গজানন গম্ভীর আর আমি—এই দু-জনেই কেবল ছিলাম বাড়িতে—সান্যাল সাহেবের সঙ্গে। সিন্দুকে ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—ক্যাশ।'

ভ্রূকুটি জাগ্রত হল ইন্দ্রনাথের ললাটে এবং দুই ভুরুতে—'এত টাকা?'

'মিস্টার সান্যাল বাইরে যাচ্ছিলেন। বম্বের ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতেন এক বছর—হয়তো তারও বেশি। ওখানকার তারাপোরেভালা অ্যাকুয়ারিয়ামের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো একটা স্যালমন মিউজিয়াম গড়ে দেওয়ার অফার এসেছিল জুহু বিচে—ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকসন বাড়ানোর জন্যে। ডিসিশন নিলেন আচমকা। বরাবর তাই করেন। উঠল বাই তো কটক যাই গোছের মতিগতি।' বলতে বলতে ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা সহযোগে বাতাসে একটা তুড়ি মেরে সান্যাল-প্রকৃতির উপমা দেখিয়ে দিয়ে বলে গেল সাবলীল ভঙ্গিমায়, 'আমরা কিস্সু জানতাম না। গজানন জানতো না, আমিও জানতাম না। জানলাম সকাল নাগাদ। ব্যাংকে ওঁর খাতির ছিল। ম্যানেজার ব্যাংকের লোক দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সিন্দুকে টাকা রেখে মিস্টার সান্যাল তখন বললেন, কেন এত টাকা আনালেন। ঘুরিয়ে বলে দিলেন, বরখাস্ত হলাম দু-জনেই।'

এ-হেন নামমাত্র ভূমিকা দিয়েই মূল গল্পে চলে এসেছিল বিদ্যুৎনয়না—সেই সময়ে তার কটাক্ষে লক্ষ করেছিলাম পঞ্চম শর—ইন্দ্রনাথের দিকে।

সুন্দর মানুষ হওয়ার অনেক বিপদ—ইন্দ্রনাথের দোষ কী!

দেহধারিণী বজ্রশিখা ভ্রমর সরকার কিন্তু অকপটে স্বীকার করেছিল, সেই রাতে ফেল করেছিল তার নার্ভ। তিনটে কারণে। এক, এক মিনিটের নোটিশে গেল

চাকরিটা ; দুই বাড়ি ঘিরে বজ্র বিদ্যুৎ কালবৈশাখী সগর্জনে দাপটে দেখিয়ে যাচ্ছিল বড়ো বড়ো গাছগুলোর ওপর ; তিন সান্যাল সাহেবের প্রখর ব্যক্তিত্ব।

চাকরির দরখাস্ত পাঠানোর সময় ভ্রমর সরকার ধরেই নিয়েছিল, যে-মানুষ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেক্রেটারি-টাইপিস্ট চান, সেই মানুষ অবশ্যই হবেন অতি-প্রাচীন, রোগাটে, দুই চোখে থাকবে ডবল-লেন্সের হাই পাওয়ার চশমা।

কিন্তু চমকে গেছিল ইন্টারভিউ দিতে এসে। এমন দশাসই পুরুষ বঙ্গদেশে প্রকৃতই বিরল। এবং, যেন একটা জীবন্ত ব্যাটারি। একেবারে কাজ পাগল। লোকে পাগল হয় টাকার জন্যে—ইনি, পাগল হয়েছেন সমুদ্রের স্যালমন মাছের জন্যে। অকাতরে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত নন একেবারেই। পরে অবশ্য জেনেছিল, এই অর্থের বেশিটাই আসে ভারতের বাইরের বিভিন্ন স্যালমন গবেষণা কেন্দ্র থেকে। কিন্তু, সেই বরাদ্দ অর্থের মুখ যেচে থাকতেন না কোনওদিন। মানুষ অনেক নেশার পেছনে টাকা ওড়ায়। এঁর নেশা ছিল একটাই স্যালমন যেন নির্বংশ না হয়।

উৎকট এহেন নেশা সত্ত্বেও মানুষটা ছিলেন অতিশয় বড়ো মাপের। দরাজপ্রাণ প্রকৃতই। বেতনভুকদের অসুবিধে-টসুবিধে বুঝতেন। মাইনে-টাইনের ব্যাপারে দিলদরিয়া ছিলেন। অর্থাৎ, মন তাঁর সমুদ্রতুল্য। সমুদ্রে যাঁর জীবন কেটেছে, তিনি তো মুক্তপ্রাণ হবেনই। মিচকেপোড়া খিটখিটে মোটেই নন, সদাপ্রফুল্ল এবং অতিশয় উদার। তৎসহ, বিলক্ষণ রসিক। সাত সাগরের অ্যাডভেঞ্চার শুনিয়ে যেতেন, কন্যাসম স্নেহ করতেন পরমাসুন্দরী সেক্রেটারি-টাইপিস্টকে। এবং, এই একটা দিক দিয়ে, চাকরির জায়গাটা ছিল খুবই নিরাপদ। কাজ নিংড়ে নিতেন, তার বেশি কিছু না।

কিন্তু সেদিন সকালে একদম ঘুরে গেলেন সান্যাল সাহেব। কতটা ঘুরেছেন, তা হাড়ে হাড়ে মালুম হয়েছিল তাঁর ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে। গজানন গম্ভীর আর ভ্রমর সরকার—দু-জনকে একই সঙ্গে তলব করেছিলেন। আকাশে তখন কালো মেঘের ঘনঘটা। বিদ্যুৎগর্ভ সেই মেঘের কিছুটা যেন ওঁর ঘরেও ঢুকে পড়েছিল।

দু-জনেই তখন যে যার কাজ নিয়ে তন্ময় হয়েছিল দোতলার টানা লম্বা লাইব্রেরি ঘরে। সান্যাল সাহেবের স্টাডিরুমে যেতে গেলে এই ঘরের ভেতর দিয়েই যেতে হয়। স্টাডিরুমটা নেহাত ছোটো নয়। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিপুল। দুটো বড়ো জানালা আছে বাগানের দিকে। এই দুটো জানালায় এককালে গরাদ ছিল সেগুন কাঠের ফ্রেমে। কিন্তু বহু পুরোনো সব বাড়িতেই দেখা যায়, বৃষ্টির জল গরাদের তলার দিকে মর্চে ধরিয়ে, ফুলিয়ে দিয়ে, কাঠের ফ্রেম ফাটিয়ে দেয়। তখন সেই নড়বড়ে গরাদ ধরে হ্যাচঁকা টান মারলেই কাঠের ফ্রেম থেকে খুলে আসে। সান্যাল সাহেব গরাদদের করুণ অবস্থা দেখে সব ক-টাকেই উৎপাটন করে দিয়েছিলেন। সে জায়গায় গ্রিলও বসাননি। প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষ। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে উদ্দাম মহীরুহদের ব্যজন সেবন করতেন।

বিরাট এই ঘরের ডানদিকে আর বাঁদিকেও দুটো পেল্লায় জানালা আছে। কিন্তু

দেওয়াল জুড়ে অথৈ আটলাণ্টিকের মুরাল পেণ্টিং থাকায় সে জানালা আর দেখা যায় না।

ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রায় গড়ের মাঠের মতো পেল্লায় টেবিলের পাশে মিলিটারি পোজে দাঁড়িয়েছিলেন সান্যাল সাহেব। ক্যানভাস ব্যাগ থেকে ব্যাংকনোটের প্যাকেট বের করছিলেন। একটা প্যাকেট ঠিকরে গিয়ে পড়েছিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে।

শিশুর মতো সরল হেসে বলেছিলেন সেক্রেটারি আর লাইব্রেরিয়ানকে—'চললাম মুম্বাই। এক বছরের আগে ফিরছি না।'

শুনে আঁতকে উঠেছিল দুই শ্রোতা। উনি তা দেখে যেন খুশি হয়েছিলেন।

'কিন্তু স্যার—' কিছু একটা বলতে গেছিল গজানন গম্ভীর।

সান্যাল সাহেব থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—'জীবনে সুযোগ ক-বার আসে? তিনবার। এর আগে ক-টা এসেছিল খেয়াল নেই, কিন্তু এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করব না।'

বলে, টেবিলে টোকা মেরে দেখিয়েছিলেন সদ্য খাম ছিঁড়ে বের করা একটা চিঠি।

'তাছাড়া,' শিশুর মতোই আহ্লাদে ফেটে পড়া গলায় বলে গেছিলেন—'বম্বের সমুদ্রের হাওয়া খুব দরকার হয়ে পড়েছে। লাংস বুভুক্ষু হয়ে রয়েছে। উফ! কতদিন সমুদ্রের হাওয়া খাইনি। তাছাড়া—'

বলে, সংক্ষেপে বলেছিলেন, কেন যাচ্ছেন। বাংলার ব্রেন নতুন একটা অলংকার পরিয়ে আসবে বম্বে কে। প্রতিষ্ঠিত হবে স্যালমন অ্যাকুয়ারিয়াম।

তারপরেই সংক্ষিপ্ত করে এনেছিলেন বক্তব্য—'কিন্তু তোমাদের দু-জনকেই বিদায় নিতে হবে। ভেবেছিলাম সঙ্গে নিয়ে যাব। এইমাত্র টেলিফোনে সে কথাও হয়ে গেল। ওরা রাজি নয়। ওখানকার লোকেই ওখানে কাজ করবে, আমার ব্রেনখানা শুধু চাই। ফাইন। আমি কিন্তু তোমাদের শুধু হাতে বিদেয় করব না। একমাসের বাড়তি মাইনে দেব। ড্যাম ইট। দু-মাসের দেব। খুশি?'

খুশি যে তিনি নিজেই হয়েছে, তা চোখেমুখেই ফুটে বেরোচ্ছিল। ছাঁটাই প্রসঙ্গ নিয়ে আর একটি কথাও না বলে ব্যাঙ্কনোটের প্যাকেটগুলো ওপর-ওপর জড়ো করেছিলেন। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যেটা ঠিকরে গেছিল, সেটাকেও তুলে এনেছিলেন। একে তো টকটকে ফরসা, তার ওপর হাই ব্লাড প্রেশার, হুড়মুড় করতে গিয়ে মুখখানাকে টকটকে লাল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিপুল এনার্জিতে যেন ফেটে পড়ছিলেন।

এ-বাড়ি যিনি বানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর প্রয়োজনেই দেওয়ালে গেঁথে নিয়েছিলেন একটা লোহার সিন্দুক। সান্যাল সাহেব ফোকরে চাবি ঢুকিয়ে, ঘুরিয়ে, সিন্দুক খুলে, টাকার বাণ্ডিলগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে, পাল্লা বন্ধ করে, চাবি দিয়েছিলেন।

ভ্রমর সরকার তখনই দেখে নিয়েছিল, সবই একশো টাকার নোট।

গরম পড়েছিল বলেই বোধহয় কপাল ভিজে গেছিল গজানন গম্ভীরের।

জিজ্ঞেস করেছিল সবিনয়ে—'কবে যাচ্ছেন?'

'কবে যাওয়া যায়?' একটু ভেবেছিলেন সান্যাল সাহেব। বলেছিলেন তারপরেই টগবগে গলায়—'পরশু।'

'পরশু!'

'শনিবার বলে। রোববার জিরেন পাব বম্বেতে। তারপর লেগে যাব কোমর বেঁধে,' সান্যাল সাহেব বিলক্ষণ উল্লাসমুখর। যেন শিশু।

ভ্রমর সরকারের মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে একটা খারাপ চিন্তা ভেসে এসেছিল। শনিবারটা বড়ো খারাপ বার। শনির দশা না লাগে। টাকা লুঠ না হয়ে যায়।

টাকার পাহাড় দেখলে এরকম ভাবনা কার মাথাতে না আসে।

পুলিশের কাছে অবশ্য পরে, মন খুলে কথা বলার সময়ে ভ্রমর সরকার বলেছিল, সত্যি সত্যিই টাকা লুঠ হয়ে যাক, এমন ইচ্ছে তার হয়নি। কিন্তু সংসার সত্যিই একটা রঙ্গভূমি। গতকাল ছিল নিরাপদ—আর্থিক দিক দিয়ে। আজ তা নয়। তার সাতদিন আগে ফিরেছে পুরী থেকে। সমুদ্রের ধারে বিকিনি পরে শুয়ে থেকেছে। সূর্য আর সমুদ্র তার শরীর নিয়ে খেলা করেছে। কী আনন্দ। কী নিশ্চিন্তি। তখন কে ভেবেছিল, সাতদিন পরেই ফের চাকরি খুঁজতে বেরোতে হবে।

পুরীতে আরও একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। বয়ে এনেছে একটা মধুর স্মৃতি। যৌবনের শীর্ষদেশকে বলা হয় প্রৌঢ়তা। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পরিভাষা। প্রাইম অফ ইয়ুথ হল গিয়ে প্রৌঢ়তা। এই রকমই এক দৃপ্ত প্রৌঢ়ের সঙ্গে বেশ জমে গেছিল ভ্রমর। দেখতে শুনতে কথায় বার্তায় চমৎকার। সেই ভদ্রলোক সমুদ্র সৈকতে গেছিলেন স্কেচ আঁকতে। মানুষের কত রকম ব্যায়াম থাকে। বায়ু-ও বলা যায়। ঊনপঞ্চাশ বায়ুর অন্যতম কিনা বলতে পারবে না ভ্রমর। প্রতিটি স্কেচ অসহ্য রকমের খারাপ। এই লোক যদি শিল্পের জগতে দাপায়, তাহলে ভারতীয় শিল্প রসাতলে যাবে। কিন্তু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল ভ্রমর সেই দিন, যেদিন শুনল, দৃপ্ত প্রৌঢ় পেশায় ডাক্তার। প্র্যাকটিস কলকাতায়।

কাকতালীয় ঘটনাক্রমে। একদিন একটা স্কেচকে সমুদ্রবায়ু উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভ্রমরের পাশ দিয়ে। খপ করে তা ধরে ফেলেছিল ভ্রমর—স্থগিত করেছিল তার সমুদ্রযাত্রা।

আলাপ জমে ওঠে তখন থেকেই—আঁকা ছবি থেকে শুরু হয় কথার ছবি আঁকা। কথায় কথায় জানা গেছিল, ভদ্রলোকের নাম তুষার বাগচি। সান্যাল সাহেবের চিকিৎসার ভার তাঁর হাতে। শুনে বেশ মজা পেয়েছিল ভ্রমর। ভালোরে ভালো। ছুটি কাটাতে এসে মালিকের সঙ্গে এমন দহরম মহরম জমে যাবে কে জানত।

ডক্টর তুষার বাগচির গুণ অনেক। মধুর বচনে মহিলা ভজনা যেমন করতে পারেন, তেমনি প্রয়োজন বুঝে মৌন হয়ে থাকেন। ভ্রমর সরকার বাচালতা একদম পছন্দ করে না।

টুলে বসে ভ্রমর সরকারের স্কেচ এঁকে যেতেন ডক্টর বাগচি। একটার এর একটা। শেষ নেই, শেষ নেই। ভ্রমর হাড়ে হাড়ে টের পেত ডাক্তার সাহেব মনের সুখে তার নগ্ন কাঁধ, গুরু বক্ষ, নিটোল নিতম্ব, ঘন ঊরু-র স্কেচ করে যাচ্ছেন কিন্তু কখনোই সুঠাম হচ্ছে না কাঁধের উজ্জ্বল ঢাল, খোলা বাহুর স্নিগ্ধটান, পিঠের সুঠাম বলাকা অথবা ক্ষীণ কটিদেশে স্তনচূড়ার ছায়া। সবই অখাদ্য। কিন্তু তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, ঠোঁটের কোণে সিগারেট ঝুলিয়ে রেখে, বাঘের চোখের মতো কৌণিক দৃষ্টি দিয়ে ভ্রমরকে গেঁথে রেখে মন রেখে দিতেন ছবির কাগজে। আর ভ্রমর চেয়ে চেয়ে দেখত, ডাক্তার সাহেবের ব্রহ্মতালুতে চুল বিরল হয়ে এসেছে—যে ক-খানা আছে, তারা পাকতে শুরু করেছে।

মনকে ছবির দিকে রেখে দিলেও অনর্গল মুখ চালিয়ে যেতেন ডাক্তার বাগচি। এই পৃথিবী, এই আকাশ, এই সমুদ্র নিয়ে কত কথাই না বলে যেতেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজের অখাদ্য স্কেচের সমালোচনা নিজেই করে যেতেন। মুহুর্মুহু ক্ষমাভিক্ষা করতেন ভ্রমর সরকারের কাছে যে, এমন একজন শহুরে সুকন্যাকে সামনে পেয়েও ছবির বুকে কিছুতেই ফোটাতে পারছেন না তার অনর্গল লাবণ্যপ্রবাহকে। ভাষা যে একটা প্রচণ্ড সজীব পদার্থ, ভ্রমর তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যেত বায়ুগ্রস্তের আত্মসমালোচনা শুনতে শুনতে।

কিন্তু প্রতিটি স্কেচ দেখে প্রাণপণে উচ্ছ্বসিত হওয়ার চেষ্টা করে গেছে ভ্রমর। এমনকী, স্কেচগুলো, যত অপদার্থই হোক না কেন, যাচঞা করে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। যে কোনও নারী পুরুষের চোখে নিজের চেহারা দেখতে চায়। বদ্ধ কুপিত কামনার কারণে।

এইভাবে অতিবাহিত হয়েছিল এক পক্ষকাল। অর্থাৎ, টানা পনেরোটা দিন। কম নয়। ডাক্তার না থাকলে একঘেয়ে লাগত।

তারপর ছাড়াছাড়ির সময়ে যথারীতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল দু-জনেই—ফের দেখা হবে কলকাতায়।

অকাজ ছেড়ে সুকাজের মধ্যে ফিরে যাওয়ার বাসনায় মশগুল হয়ে কলকাতায় ফেরার পরেই এই কাণ্ড।

শূন্য হল সান্যাল সাহেবের সিন্দুক।

তৎসহ, দেবপ্রতিম মানুষটার করোটি চূর্ণ করার প্রয়াস।

সকাল থেকেই মেঘ বৃষ্টি বিদ্যুতের লট্টপট্ট কেশ অট্টঅট্ট হাসি চলেছিল। যেন লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ আকাশের স্টেজে উদ্দাম নৃত্য চালিয়ে যাচ্ছিল। বিকেলের দিকে তাদের দম ফুরিয়ে গেছিল।

প্রাণটা হালকা হয়েছিল ভ্রমরের। চিরকালই, আকাশ যখন নাচে, তার বুক তখন কাঁপে। কাজে ডুবে গেছিল সে আর গজানন গম্ভীর। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়েছে, সন্ধের পর রাত নেমেছে, ডিনার পর্বও সেরে নিয়েছে সদাশয় সান্যাল সাহেবের সুব্যবস্থায়—লাইব্রেরি ঘরে বসেই। বড়ো বড়ো শেড দেওয়া ল্যাম্পের

আলোয় একাগ্রতা জাগ্রত হয় ঠিকই, কিন্তু যেন কত মায়াবী শরীরীরা আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু স্টীল র‍্যাক বই ঠাসা। মহার্ঘ বস্তু নিয়ে এলোপাতাড়িভাবে ছড়ানো। দেশবিদেশে পাওয়া উপহার সামগ্রীর ওপর কোনো দয়া নেই সান্যাল সাহেবের। পায়ের তলায় ইয়া মোটা কার্পেট। এরকম খানদানি গালচে পাতা আছে এই বাড়ির সব ঘরেই। তবে, বিলক্ষণ স্যাঁতসেঁতে। গালচে সাফ করতে হয় নিয়মিত, নইলে তা ধুলোর বাসা হয়। সান্যাল সাহেবের অত সময় কোথায়?

এহেন পরিবেশে একটানা কাজ করতে করতে ঘাড় টনটন করছিল, রগের শিরা দপদপ করছিল ভ্রমর সরকারের। কম কাজ তো নয়। দু-ডজন চিঠি ছাড়তে হয়েছে—ইয়া লম্বা লম্বা চিঠি। সান্যাল সাহেবের মুম্বাই টিপ-এর সমস্ত ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এখন ওঁর ব্যাগ-সুটকেস-ব্রিফকেস গুছিয়ে দিতে হবে। আত্মভোলা কাজপাগল মানুষটাকে দেখলে স্নে মায়া হয়।

ঠিক এই সময়ে লাইব্রেরিয়ান গজানন গম্ভীর কলম নামিয়ে রেখে, গলা খাদে নামিয়ে এনে, বলেছিল—'ভ্রমর।'

'ইয়েস?'

স্টাডি রুমের বন্ধ কপাটের ওপর চোখ বুলিয়ে নরমতর স্বরে বলেছিল গজানন—'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করতে এলে অধিকাংশ নারী যৎকিঞ্চিৎ মায়াময়ী হয়ে থাকার চেষ্টা করে। এটা তাদের টেকনিক, সুচারু কাজের কসমেটিকস।

সুতরাং অজন্তা ঠোঁটে পাতলা হাসি ছড়িয়ে ভ্রমর বলেছিল—'কী কথা?'

গজাননের গাঢ় কণ্ঠস্বর শুনেই অবশ্য বোঝা হয়ে গেছিল, কথাটা কী ধরনের। এ সব ব্যাপারে নারীদের অতীন্দ্রিয় সত্তা অতিশয় প্রবল।

তাই অবাক হয়েছিল ভ্রমর। গজাননের গলার স্বরটা যেন কেমন কেমন। সে বসে রয়েছে নিজের রাইটিং টেবিলে, ভ্রমরের টেবিল থেকে সামান্য দূরত্বে, বাঁ হাতের কাছে আলোক বর্ষণ করে যাচ্ছে একটা টেবিল ল্যাম্প। আলোর আভায় চকচক করছে বুরুশ দিয়ে চেপে আঁচড়ানো চুল, লম্বা, ক্রিম মাখানো চুল, তাই একটু চকচকও করছে বটে। বিশেষ এই ক্রিমের প্রলেপ দেয় বিশ্বের শৌখিন পুরুষরা নিজেদের বিশিষ্ট করে তোলার জন্যে। গজানন গম্ভীরও সেই দিক দিয়ে বিশিষ্ট পুরুষ তো বটেই। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ সহজ সরল পথ ছেড়ে বাঁকা পথে ছুটছে কেন?

গজাননের আর একটা দোষ অথবা শখ রিমলেস চশমা পরা। অথচ বয়স খুবই কম। মানে, ইয়ংম্যান আর কি। কিন্তু ওই প্যাঁসনের নবীকরণ রিমলেশ চশমা মুখের ভাবে যে একটু ভারিক্কিয়ানা এনে দেয়, এটা কেন বোঝে না, গজানন? একটু বুড়োটে। ধুস!

সেই মুহূর্তে আরও ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল ভ্রমর।

গজানন আঙুল মটকে চলেছে।

পরক্ষণেই তেড়েমেড়ে যে কথাগুলো ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল

তা যথেষ্ট ফেনাময়—শ্যাম্পেনের বোতলের মুখ দিয়ে যে রকম বেরোয় আর কি।

'আর্থিক দিক দিয়ে ঠিক আছো তো? অন সলিড গ্রাউন্ড?'

এ আবার কি কথা! কাজের মেয়েদের পকেটমানি নিয়ে ব্যাটাছেলেদের অত গুড়গুড় চিন্তার কি দরকার? যুগটা এখন পালটে গেছে। রজনীর নর্মসহচরী দিবসের কর্মসহচরী হয়ে গেছে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রেও প্রসার ঘটেছে। এমনকী মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, বিমা কোম্পানির এজেন্ট, ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড করানোর জন্যেও টেলিফোনে বাড়ি বাড়ি হাজির হয়ে চলেছে। এ ছাড়াও তো আছে ইন্টারনেটে মধুরালাপের আসব। এ সব কি জানে না গজানন? নাকি, ন্যাকামি করছে? দরদ দেখাচ্ছে? নিজেকে বাঁচিয়ে ডংকা বাজিয়ে টংকা রোজগারের জন্যে জ্ঞান নিশ্চয়ই নিতে হবে না গজানন গম্ভীরের কাছ থেকে!

সুতরাং, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে অপ্রীতিকর আলোচনায় ইতি টেনে দিতে চেয়েছিল ভ্রমর—'বিলক্ষণ।'

কথা-মুখর হতে চায়নি আরও একটা কারণে। রাত ন-টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। ডক্টর তুষার বাগচির আসবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আসছেন সান্যাল সাহেবের চেক-আপের জন্যে। যদিও সান্যাল সাহেব একটা চলমান ঘড়ি বিশেষ, প্রতিটি কাজ সময়-গাঁথা, অথবা বলা যায় তিনি অভ্যাসের দাস, বডি ক্লক ঠিক-ঠাক টাইমে ঠিক-ঠাক কাজ করিয়ে নেয় ওঁকে দিয়ে—তাহলেও বয়স তো হল। হার্ট, ব্রেন, প্রেশার, সুগার—এসব দিকে নজর দেওয়া দরকার। ডক্টর বাগচি আসবেন পোর্টেবল ই সি জি মেশিন নিয়ে, হার্ট দেখবেন, প্রেশার মাপবেন—তবে ছাড়া পাবেন সান্যাল সাহেব, তখনই রাত ন-টায় বরাদ্দ সর্বশেষ হুইস্কির গেলাসে চুমুক দেবেন এবং দৈনিক বরাদ্দ দশটি মাত্র সিগারেটের সর্বশেষ সিগারেটটা ধরাবেন। শুতে যাবেন রাত ঠিক এগারোটায়।

কিন্তু এত দেরি করছেন কেন ডক্টর বাগচি?

ভ্রমর যখন আত্ম-চিন্তায় মগ্ন, গজানন তখন আত্ম-কথায় মুখর। বকেই চলেছে, বকেই চলেছে। সাপ-ব্যাং-হাতি-ঘোড়া—একটু একটু করে সবই বুঝি আসছে কথার নদী স্রোতে। মাথা টিপ টিপ শুরু হয়ে গেছিল ভ্রমর সরকারের। একে তো ওভারটাইম কাজ করতে হয়েছে, মাথার মধ্যে চাপ এমনিতেই বেড়ে গেছে, তার ওপর গজাননের গজর-গজর।

চমকে উঠেছিল কিন্তু কী যেন একটা কথা শুনে। গজাননেরই কথা। কিন্তু একঘেয়েমির মধ্যেও কোথায় যেন টুং করে একটা ঘণ্টা বেজে উঠেছে। কথার টুং-টাং। ভালো করে শোনেনি ভ্রমর। শোনার দরকার হচ্ছিল না বলে। কিন্তু এই কথাটা শোনা দরকার।

তাই জিজ্ঞেস করেছিল—'কি যেন বললে?'

'বললাম,' এবার একটু থেমে থেমে, কথার চালচিত্রে রং ধরিয়ে, গজানন বললে—'আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছি।'

'তা তো হচ্ছি।' ভ্রমর গুঞ্জরিত হয়ে রইল আপন ছন্দে।

কিন্তু ছন্দ-কাটা সুরে চালিয়ে গেল গজানন—'তবে চাকরি গেল বলে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে, এইটা যে দুঃখের।'

'আমার কাছে নয়।'

'কেন বুঝছ না, ভ্রমর। আমার কাজটা যে বিশেষ ধরনের। বই কিনে তাগাড় করে কারা? যাদের মাথায় ছিট আছে। এটা একটা ম্যানিয়া। পাঁচজনকে দেখানো। সেইজন্যে একজন লাইব্রেরিয়ানও দরকার। ক-টা বাড়িতে আজকাল লাইব্রেরিয়ান রাখে? কোথাও না। সরকারের দাদন খাওয়া লাইব্রেরিতে চান্স পাওয়া মুশকিল—পেলেও মাইনে পোষাবে না। সুতরাং আমার দুর্দিন আরম্ভ হচ্ছে কাল থেকে...ইয়ে, দু-মাস পর থেকে...দু-মাসের পেমেন্ট খরচ হয়ে যাওয়ার পর থেকে। উনি কবে ফিরবেন, তার ঠিক নেই। বিশ্ব বাউণ্ডুলে মানুষ। আবার আটলান্টিকে নেচে নেচে বেড়াতে পারেন। আমি তখন কি করব? আঙুল চুষব?'

ভ্রমর বলতে যাচ্ছিল—'সেটাই বা মন্দ কী? একসময়ে সবাইকে চুষতে হয়েছে। তোমার মতো বুড়ো খোকারও চোষা উচিত।'

কিন্তু এই নিতান্ত অপ্রিয় বাক্যটি বলা অতিশয় অসঙ্গত হবে বলেই ভ্রমরের মতো পালিশ করা ঝকঝকে মেয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছিল।

গজানন নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে বলেছিল—'কিছু একটা করা উচিত।'

ভ্রমর বলেছিল—'কী করা উচিত?'

'তোমাকে বিয়ে করা,' আকাশ থেকে যেন শিলা পতন ঘটেছিল তিন-তিনটে দুর্মদ শব্দের মধ্যে।

শিলাবৃষ্টি! প্রণয়ভিক্ষা নয়, সরাসরি পাণিপ্রার্থীর শিল ছোঁড়া!

দুই নয়নে কিন্তু অভয় উদ্যান ফুটিয়ে তুলতে পারেনি ভ্রমর। শুধু চোখে চোখে চেয়েছিল অনেকক্ষণ। ভ্রমর জানে তার বরতনুর মায়াকান্তি পুরুষের মনের আকাশে মেঘ সৃষ্টি করতে পারে। ভ্রমর জানে, তার মতো সুন্দরীর ইন্দ্রিয়ঘন বিকিরণ পুরুষের চিত্তে বিকার জাগাতে পারে। ভ্রমর জানে, তার শরীরের অনর্গল লাবণ্য-প্রবাহ পুরুষের চিত্ত বিকল করে তুলতে পারে। এ কথাও ভ্রমর জানে যে, বহুবার বহু পুরুষের জীবনে মূর্তিমতী ট্র্যাজেডি হতে হয়েছে তাকে—এবারেও সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

এই অসহ্য নীরবতা সহ্য করতে পারেনি গজানন। বিশেষ করে ভ্রমরের দুই চক্ষুতে কুমেরু আর সুমেরুর বরফ দেখবার পর থেকে।

তাই ছিটকে গেছিল চেয়ার থেকে—'বুঝেছি, বুঝেছি, কিন্তু একটু দেরিতে বুঝলাম, একটু আগে বোঝা উচিত ছিল।'

বরফ চোখেই তাকিয়ে থেকে বরফ-ঠাণ্ডা গলায় ভ্রমর বলেছিল—'কী বোঝা উচিত ছিল?'

'এই ডাক্তার বাগচির কেসটা।'

'ডাক্তার বাগচির কী কেস?'

জবাব দেওয়ার অথবা নিজেকে খোলতাই করার আর চান্স পায়নি গজানন। তার আগেই পাশের ঘর থেকে শব্দ তরঙ্গ সবেগে কপাট ভেদ করে এসে দু-জনেরই কানের পর্দায় দুমদাম দমাস করে আছড়ে পড়েছিল—অতিশয় স্পষ্টভাবে আছড়ে পড়েছিল, কারণ, সেই শব্দ-লহরী, আর যাই হোক, সুখকর নয় মোটেই।

পরে, শব্দ-লহরীর বিশদ বর্ণনা দেওয়ার সময়ে দু-জনের কেউই কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি আওয়াজ-টাওয়াজগুলো চেঁচানি, না গোঙানি, নাকি অসংলগ্ন কথার সবে শুরু হওয়া। তিনটেই একই সঙ্গে শোনা গেছিল, এমনটাও হয়তো হতে পারে। তারপরেই, বেশ কয়েকবার শোনা গেছিল চাপা ধপ-ধপ-ধপ শব্দ—যেন, কাঠের ব্লকে মাংস কুচি কুচি করা হচ্ছে চপার দিয়ে। তারপরেই নৈঃশব্দ্য, দূর থেকে শুধু ভেসে আসছিল বৃষ্টি ঝরার শব্দ।

ইন্দ্রনাথের বাড়িতে এই গল্পই বলতে শুরু করেছিল ভ্রমর সরকার। কান খাড়া করে শুনে গেছিল জয়ন্ত নিজেও—এর আগে একাধিকবার শোনা সত্ত্বেও।

বলেছিল ভ্রমর—'কী যে ঘটছে, স্টাডি-র মধ্যে, দু-জনের কেউই তা বুঝতে পারিনি। দু-জনেই 'সান্যাল সাহেব', 'সান্যাল সাহেব' বলে ডেকেছিলাম... চেঁচিয়েছিলাম...কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। দরজা খুলতে চেষ্টা করেছিলাম, আমি আর গজানন দু-জনে মিলে, কিন্তু খুলতে পারিনি।'

'ভেতর থেকে ছিটকিনি তোলা ছিল কি? খিল দেওয়া ছিল?' ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিল।

'না না। জ্যাম হয়ে গেছিল। বৃষ্টির ড্যাম্পে কাঠ ফুলে উঠেছিল। গজানন অনেক ঠেলেও যখন খুলতে পারল না, তখন পেছিয়ে গিয়ে দৌড়ে এসে লাফিয়ে পড়ে কাঁধের ধাক্কা মেরে দু-হাট করেছিল পাল্লা।'

'সান্যাল সাহেব ছাড়া কেউ ছিল না ঘরে। সেটা আমি ভালো করেই দেখে নিয়েছি। ঘরের মধ্যে নিশ্চয় কাউকে দেখতে পাব, এই ভয়েই চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলাম। আলো ঝলমল করছিল ঘরে। মাঝের মস্ত টেবিলটার ঠিক মাথার ওপরকার বিরাট ঝাড়লণ্ঠনের মোমবাতির জায়গায় ইলেকট্রিক ক্যান্ডল জ্বলছিল। স্টাডি রুমের লাগোয়া ছোট্ট কলঘরটাতেও আলো জ্বলছিল। ও ঘরে ওয়াশ বেসিন আছে। টয়লেট রুম। চোখের পলকেই সব দেখা হয়ে গেছিল। কেউ ঘাপটি মেরে ছিল না সেখানেও।'

একটানা কথার ঝড় চালিয়ে গলার সুইচ অফ করে চোখের আলো জ্বালিয়ে একে একে প্রত্যেকের মুখভার নিরীক্ষণ করে গেছিল ভ্রমর সরকার।

নরম গলায় ইন্দ্রনাথ তখন বলেছিল—'আপনার চোখের মধ্যে দিয়ে দেখতে চাই ঠিক সেই সময়ের ঘরের দৃশ্য। উপহার দেবেন?'

ভ্রমরের টেনশন-আড়ষ্ট কণ্ঠস্বরও সহজ হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ—'টেবিলের ওদিকে পড়েছিলেন সান্যাল সাহেব। টেবিল থেকে একটু দূরে। টেবিল আর জানালার মাঝের জায়গায়। জ্ঞান ছিল না। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। ঠোঁটের জ্বলন্ত সিগারেট রেখেছিলেন টেবিলের কিনারায়। মেহগনি কাঠ পুড়ে যাচ্ছিল।

পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছিল। বড়ো টেবিলের পাশে তাঁর নিজের চেয়ার উলটে পড়েছিল। উলটে গেছিল আরো একটা ছোটো টেবিল। কার্পেটের একটা জায়গায় ভিজে ভিজে দেখাচ্ছিল—হাতের গেলাস গড়াচ্ছিল সেখানে। পাশেই গড়াচ্ছিল কাচের স্টপার লাগানো ডিক্যান্টার—ছিপি খুলে না যাওয়ায় হুইস্কি ছিল ডিক্যান্টারে। তার পাশেই ঠিকরে গিয়ে পড়েছিল মেট্যাল পটি দিয়ে মোড়া বাহারি সাইফন। সান্যাল সাহেব গোঙাচ্ছিলেন। আমি আর গজানন ছুটে গিয়ে ওঁকে পাশ ফিরিয়েছিলাম। হাতিয়ারটা দেখেছিলাম। ছিল পিঠের তলায়।

'একটা ঝাঁটা। ফাঁপা হাতলে সিসে দিয়ে ভরাট করা। লম্বায় ছয় থেকে সাত ইঞ্চি, কিন্তু ওজনে আধ কেজির মতো। গজাননের ফার্স্ট এইড বিদ্যে জানা ছিল। সান্যাল সাহেবের মাথার পেছন দিকটায় হাত বুলিয়ে নিয়েই আমাকে বললে—খবর দাও ডাক্তারকে—এখুনি।

'আমি দৌড়েছিলাম লাইব্রেরি ঘরের টেলিফোন থেকে ফোন করবার জন্যে। সান্যাল সাহেবের টেলিফোনের দিকে যাইনি। বিকেল থেকেই টেলিফোনের প্লাগ খুলে রেখেছিলেন—যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে। কিন্তু ফোন করবার আগেই দেখলাম, ডাক্তার বাগচি সামনের হলঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন।'

এই পর্যন্ত বলে থেমে যেতেই দুষ্টুমি নেচে উঠেছিল ইন্দ্রনাথের চোখে। বলেছিল তরল কৌতুক কণ্ঠে, 'খুশি হয়েছিলেন তাঁকে দেখে?'

স্মার্ট মেয়ে বটে ভ্রমর সরকার। মুক্তানয়নে দ্যুতি দেখা গেল ক্ষণেকের জন্যে।

পরক্ষণেই বললে ফুরফুরে গলায়—'হব না কেন? একে তো পথ চেয়ে বসেছিলাম, তার ওপর এই নারকীয় কাণ্ড। ডক্টরও আমার দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিলেন এক হাতে ই.সি.জি. মেশিন, আর এক হাতে মেডিসিন বক্স নিয়ে।'

'গাড়িতে এসেছিলেন?'

'তাইতো আসেন।'

'আওয়াজ শুনতে পাননি?'

'কী মুশকিল! এমন প্রশ্ন করেন। আজকালকার জাপানি মডেলের গাড়িগুলো তো সাউণ্ডলেস। তার ওপর বৃষ্টির সাউণ্ড। পাশের ঘরে অত সাউণ্ড। আমরাও সাউণ্ড করে গেছি—'

ইন্দ্রনাথ কিন্তু পালটা স্মার্টনেস দেখিয়ে গেল কথার তুবড়িতে—'বুঝলাম, বুঝলাম, বুঝলাম। আপনি খুশি হয়েছিলেন ডাক্তার সাহেবকে দেখে।' 'খুশি' শব্দটার ওপর অহেতুক জোর দেওয়ায় আরক্তক গণ্ডদেশ আরো একটু রক্তিম হল কিনা বোঝবার আগেই মোক্ষম প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারল ইন্দ্রনাথ—'কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কি করে? সদর দরজা কি খোলা ছিল? না, চাকরবাকররা খুলে দিয়েছিল?'

সপেটা জবাব দিয়ে গেল স্বল্পকুন্তলা—'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। চাকর-বাকর সবাইকে বিদেয় করে দিয়েছিলেন সান্যাল সাহেব ডিনারের পরেই—ফর সেফটি।

সিন্দুকভর্তি অত টাকার জন্যে নিশ্চয়ই—মুখে বলেছিলেন, বৃষ্টি পড়ছে, বাড়ি যাও।'

'চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোক রাখতেন না? দারোয়ান? ড্রাইভার?'

'একদম না। সবই তো নিজের হাতে করার শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন বিলেত আমেরিকা থেকে। আমাদের বলতেন, আমি কর্মযোগী। কোনো কাজ ছোটো নয়—বলেছেন বিবেকানন্দ।'

'তাহলে,' প্রশ্নমালার খেই তুলে নিল ইন্দ্রনাথ—'সদর দরজা নিশ্চয়ই খোলা ছিল—ডাক্তার আসবেন বলে।'

'ঠিক বলেছেন। ডাক্তার ওই জন্যেই সটান উঠে আসছিলেন সিঁড়ি বেয়ে। খুশি মুখেই উঠছিলেন, আমি কিন্তু খুশি মুখে নিশ্চয়ই তাকাতে পারিনি। তাই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ব্যাপার কি? ভীষণ ব্যাপার-ট্যাপার ঘটেছে নাকি? আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ, ঘটেছে। তাড়াতাড়ি আসুন। কোনো কমেন্ট না করে সটান উঠে এসে সান্যাল সাহেবকে দেখলেন। মানে, এগজামিন করলেন। বললেন, কনকাসন অফ ব্রেন। বেশ কয়েকবার শক্ত হাতের ব্লো মারা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, অ্যামবুলেন্সে ফোন করব কিনা। উনি বললেন, এখন নড়ানো উচিত হবে না। ঝাঁকুনি দেওয়া উচিত হবে না। বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে—বাড়িতেই। বিছানায় ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে টুকটাক অনেক জিনিস পড়ে গেছিল পকেট থেকে। তার মধ্যে ছিল না সিন্দুকের চাবি। থাকত গাড়ির চাবির রিঙে—আমি দেখেছি। তখন দেখলাম নেই। চাবির থোকা রেখেছিলেন টেবিলে। সেখানেই পাইনি। কিন্তু পরে দেখেছি লাগানো রয়েছে সিন্দুকে।

'এরপরের ব্যাপার নতুন করে বলার দরকার আছে কি? সিন্দুক ফাঁকা—শুধু টাকার বাণ্ডিলগুলোই নয়—দুটো দামি ফাইলও নিরুদ্দেশ! তার মধ্যে ইন্দিরা বিকাশ পত্র-টত্র থাকত। পরিষ্কার ডাকাতি। গরাদবিহীন জানালার বাইরে লাগানো একটা মই। নিচে ফুলগাছের কাছে নরম মাটি লণ্ডভণ্ড, পায়ের ছাপ—এইসব। চোর খুব পাকা। শুধু একটা ব্যাপার—' বলে, থামল মুক্তা নয়না ভ্রমর সরকার।

'কি সেই ব্যাপার?' প্রশ্ন ঝরিয়ে গেল হীরকনয়ন ইন্দ্রনাথ।

'দুটো জানালারই ছিটকিনি তোলা ছিল ভেতর থেকে।'

হঠাৎ কাশি পেয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। তারপর জয়ন্তর দিকে চেয়ে নিয়ে বলল ভ্রমর সরকারকে—'দুটো জানালারই ছিটকিনি তোলা ছিল ভেতর থেকে—সিয়োর?'

'অ্যাবসলিউটলি পজিটিভ,' ভ্রমরের এবারের জবাব সুগম্ভীর।

'ভুল-টুল হয়নি তো?'

'হলে তো বাঁচতাম.' এবার একটু অসহায় দেখায় ভ্রমরকে—'পুলিশ তো ঠিক এই পয়েন্টেই সন্দেহ করে বসেছে আমাদের দু-জনকে। আমি আর গজানন সাঁট করে নিশ্চয়ই মালকড়ি সরিয়েছি—সান্যাল সাহেবের মাথায় ডাণ্ডা হাঁকিয়েছি।'

ভ্রমর এখন হাঁপাচ্ছে। দম ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে নয়। মেয়েদের ওই ব্যাপারটায় অতি মানবিক শক্তি আছে। তাদের হাঁপানি রোগও বড়ো একটা হয়

বলে জানা নেই (আমার ভুল হতে পারে, পাঠিকা, ক্ষমা করবেন)—ভ্রমর হাঁপাচ্ছিল উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার আতিশয্যে।

তাই ক্ষণেক হাঁপিয়ে নিয়েই ফের চালিয়ে গেল পুরোদমে—'অমন ভেবে নেওয়াটাও খুব সোজা। বাড়িতে তখন সান্যাল সাহেব ছাড়া মানুষ বলতে ছিলাম তো আমরা দু-জন। বসেছিলাম স্টাডিরুমে ঢুকতে গেলে যে দরজা পেরতে হয়, সেই দরজার ঠিক বাইরে। বাইরের কোন লোক, যাকে আপনারা সাধুভাষায় বলেন আগন্তুক, ছিল না বাড়ির মধ্যে। স্টাডিরুমের দুটো জানালারই সার্সি-কপাট বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। সার্সির কোনো কাচও ভাঙা ছিল না—হাত গলিয়ে ছিটকিনি খোলাও সম্ভব ছিল না। খুলতে পারতাম শুধু আমরা দু-জন। কিন্তু তা করিনি। আর কিছু বলার নেই।

মুচকি মুচকি হেসে যাচ্ছিল ইন্দ্রনাথ শেষের দিকের কথাগুলো শুনতে শুনতে। ওর ব্রেনের মধ্যে নতুন একটা আইডিয়া যে হু হু করে ডালপালা মেলে ধরেছে তা ওর নয়ন-দ্যুতির চকিত চমক দেখেই বুঝতে পারছিলাম। ভ্রমরের মেলট্রেন স্পীচ বন্ধ হতেই মিটিমিটি হেসে ও বললে, 'কিন্তু ম্যাডাম, পুরো ব্যাপারটা তো সাজানোও হতে পারে। ধরে নেওয়া যাক, মইটা জানালার গায়ে আপনারাই লাগিয়ে রেখেছিলেন? তারপর গীতা হাতে শপথ করে বলে গেছেন, 'জানালা বন্ধ ছিল ভেতর থেকেই?'

নাটক যখন এই পর্যায়ে পৌঁছেছে, জয়ন্ত তখন সংলাপ বর্ষণ থেকে বিরত থাকতে পারল না।

বললে রাশভারি পুলিশি গলায়—'জাস্ট আ মোমেন্ট। মিস সরকার, আপনি এখানে পায়ের ধুলো দেওয়ার ঠিক আগেই মাই ফ্রেন্ড ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে বলেছিলাম, সান্যাল সাহেবের জ্ঞান রয়েছে। এইমাত্র কথা বলে এলাম। জানলাম—'

বলে, থামল জয়ন্ত।

'কী জানলেন?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল ভ্রমর সরকার।

'জানলাম যে আপনি যে স্টেটমেন্টটা দিয়ে গেলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। আপনাকে আর মিস্টার...মিস্টার...'

'গজানন গম্ভীর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,...কি বিশ্রী নাম...সান্যাল সাহেব আপনাদের দু-জনকে ক্লিন সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। এই ক্রাইমে কোনো রকমভাবেই আপনারা দু-জন সংশ্লিষ্ট নন।'

'নো কমপ্লিসিটি?'

'নট অ্যাট অল।'

এইবার কিন্তু বাকচতুরা ভ্রমরের রসনা রইল অসাড়। কিন্তু যেন ঈষৎ শ্বেত হয়ে এল সদা আরক্ত কপোল। ঘরজোড়া শব্দহীনতার প্রথম শব্দস্রোত বইয়ে দিল জয়ন্ত—'সান্যাল সাহেব বলেছেন, উনি লাইব্রেরি ঘরের দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। উনি শুনতে পাচ্ছিলেন, আপনাদের দু-জনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। কী কথা হচ্ছে, তা শোনেননি। দুই, জানালার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন

সান্যাল সাহেব—যেমন বসে থাকেন। দুই জানালাতেই ছিটকিনি তুলে দিয়ে এসেছিলেন উনি নিজেই। সুতরাং জানালায় ছিটকিনি তোলা ছিল। রাত ন-টা বাজবার একটু পরেই পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। পা টিপে টিপে অথবা পা টেনে টেনে চলার আওয়াজ। উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে মাথায় পড়েছিল ডাণ্ডা—পেছনে থেকে। এরপর আর কিছু মনে নেই। সুতরাং, মিস সরকার, মনে হচ্ছে আপনি বর্ণে বর্ণে সত্যি বলে গেলেন।'

ঠিক এই সময়ে ইন্দ্রনাথের ইচ্ছে হল এক টিপ 'ড্রাই হুইস্কি' গ্রহণের। বেমক্কা আওয়াজে চমকে উঠল সকলেই। তারপর ভ্রমর সরকার বললে জয়ন্তকে, 'তাহলে আমি নট গিল্টি? অ্যারেস্ট করবেন না?'

'করতে তো পারছি না,' জয়ন্ত বিলক্ষণ অকপট—'ভেরি সরি, ফর দ্যাট। কাকে যে অ্যারেস্ট করা যায়, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। জানলায় ভেতর থেকে ছিটকিনি তোলা। দরজার ওপর ছিল নজর। ঘরের মধ্যেও কেউ ঘাপটি মেরে ছিল না। অথচ, আক্রান্ত ব্যক্তির জবানবন্দি অতিশয় স্পষ্ট—কেউ একজন তাঁকে পেছন থেকে মেরেছে। মির‍্যাকল ছাড়া আর কী বলা যায় এই মিস্ট্রি-কে?'

'মহারহস্যশালা,' ঠোঁটের কোণে সুতীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

জয়ন্ত বললে—'এবং, সেই মহারহস্য শ্যালককে পাকড়াও করার জন্যে, চলো যাই, স্যালমন সাহেবের সামনে।'

'স্যালমন সাহেব?' বিষম অবাক হয়ে শুধোয় নির্মেদ মেয়ে ভ্রমর সরকার—'তিনি কে?'

'আপনাদের সান্যাল সাহেব। চলুন, আপনিও চলুন।'

স্যালমন সাহেবের ধমনীতে যে অতি-অভিজাত রক্ত প্রবাহিত, তা তাঁর শয়নকক্ষে ঢুকলেই মালুম হয়। ফার্নিচারগুলো শুধু অনুপম নয়, নিরতিশয় জমকালো। যেন সেকেণ্ড ফ্রেঞ্চ এম্পায়ার পুরোমাত্রায় অধিষ্ঠিত রয়েছে এই ঘরে। এক কথায় গ্র্যাণ্ড রুম। বিশাল বাহারি পালঙ্কের ওপর পিঠে বালিশ ঠেস দিয়ে তিনি এখন বসে আছেন। মাথা ঘিরে ব্যাণ্ডেজের হেলমেট।

পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একান্ত অনুগত পার্শ্বচর-এর মতো ডক্টর তুষার বাগচি। তাঁর এক হাতের আঙুল স্যালমন সাহেবের কবজিতে ন্যস্ত।

ভীষণ গম্ভীর মুখে তিনি ঘোষণা করলেন, 'সরি, আর সময় দেওয়া যাবে না।'

ঝটকান মেরে হাত সরিয়ে নিলেন স্যালমন সাহেব।

জয়ন্ত ধৈর্য্যের অবতারবিশেষ হয়ে চেয়ে রইল।

তারপর শুধোল—'সান্যাল সাহেব, জানতে চাই শুধু একটা ব্যাপার।' একটু থেমে—'জানালা দুটোয় ছিটকিনি তুলে দিয়েছিলেন কখন?'

সান্যাল সাহেব বললেন, 'বহুবার জবাব দিয়েছি এই একটা প্রশ্নের। ফের দিচ্ছি। দ্যাট ব্লাইটার পেছন থেকে মাথায় ঝাঁটা মারার মিনিট দশেক আগে।'

বলেই শুধরে নিলেন। 'ঝাঁটা মারা' শব্দযুগল তার মনঃপুত হয়নি। বললেন, 'ঝাঁটার হ্যাণ্ডেল।'

জয়ন্ত বললে, 'কিন্তু তাকে দেখেননি?'

'না, দেখিনি। দেখলে—'

'জানলা বন্ধ করতে গেলেন কেন?'

'জানলার বাইরে মই লাগানো রয়েছে দেখতে পেয়েছিলাম বলে। যদি চোরের আবির্ভাব ঘটে, এই ভয়ে। পঞ্চাশ লাখের গন্ধ নিশ্চয়ই ব্যাংক থেকেই ছড়িয়েছে।'

'মই কে লাগিয়েছে, সে খোঁজ নেননি?'

'দরকার মনে করিনি।'

'কিন্তু একটু নার্ভাস হয়ে গেছিলেন।'

গর্জে উঠলেন স্যালমন সাহেব, 'নার্ভাস? আমি? বডি-তে নার্ভ বলে কিছু আছে আমার?'

শেষ প্রশ্নটা নিক্ষিপ্ত হল ডক্টর বাগচি আর গজানন গম্ভীরদের তাগ করে।

সবিনয়ে বললেন ডাক্তার, 'ভীষণ মজবুত গঠন আপনার।'

রক্তলাল চোখে স্যালমন সাহেব ডাক্তারের মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করলেন। কথাটা যেন তাঁর মন জোগানোর জন্যে বলা হল? তারপর চোখ ঘুরিয়ে নিলেন গজানন গম্ভীরের দিকে। তার মুখ যেন পাথরের মুখ।

অগত্যা ফের তাকালেন জয়ন্তর দিকে। তাঁকে নার্ভাস বলায় যে ক্ষোভ এখনও প্রশমিত হয়নি, তা কণ্ঠস্বরে প্রকাশ করলেন, 'আর কিছু জানতে চান?'

'আর একটা প্রশ্নের জবাব। আর ইউ সিয়োর যে টয়লেট রুমে অথবা স্টাডিরুমে আগে থেকে কেউ ঢুকে বসেছিল না? অ্যাটাক করার আগে?'

'ডেড সার্টেন।'

শেষ সিদ্ধান্তে চলে এল জয়ন্ত—'আগে অথবা পরে, কেউই লুকিয়ে থাকেনি। আগে আর পরে জানলা ছিল বন্ধ। আমার ভূতে বিশ্বাস নেই। সুতরাং, ব্যাপারটা অসম্ভব। সান্যাল সাহেব, আদৌ কি আপনার মাথায় ঝাঁটার ডাণ্ডা হাঁকানো হয়েছিল? সিয়োর?'

'জবাবটা আমি দিতে পারি কি?' দরজার কাছ থেকে ভেসে এল ইন্দ্রনাথের সুবচন।

এখন তার হাতে রয়েছে খবরের কাগজে মোড়া একটা বস্তু। ছুটতে ছুটতে এসেছে বলে হাঁপাচ্ছে।

বললে স্যালমন সাহেবকে, 'সরি, সরি, এক্সট্রিমলি সরি ফর মাই ফ্রেণ্ড জয়ন্ত চৌধুরির শেষ কথাটার জন্যে। ব্রেন স্ট্রোক হয়ে যেত যে।'

ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। জয়ন্ত গনগনে চোখে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ বলছে—'স্যাল...ইয়ে...সান্যাল সাহেব, আপনিও ভুল বলেননি। তিন-তিনবার আপনার মাথায় ঝাঁটা মারা হয়েছিল...ইয়ে...ঝাঁটার হ্যাণ্ডেল দিয়ে মারা হয়েছিল। মেরেছিল এই ঘরেরই একজন। তবে, পুলিশ একটা সৎকাজ করেছিল। আপনার স্টাডিরুমে তালা ঝুলিয়ে প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছিল, আর একটা অপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।'

বিস্ফোরণের পর যেমন থমথমে শব্দহীনতার আবির্ভাব ঘটে, এ ঘরে এখন সেই অবস্থা।

কাগজের মোড়ক খুলে ইন্দ্রনাথ বের করল একটা বড়োসড়ো সোডা-ওয়াটার সাইফন। দমাস করে রাখল মাঝের টেবিলে। বেশ বড়ো সাইফন। চারদিকে ধাতুর পটি দিয়ে বাঁধানো।

ধমকে উঠল জয়ন্তকে, 'সাইফন নিয়ে কিছুই বলোনি আমাকে। বলা উচিত ছিল। বলেছেন কিন্তু এই ইয়ং লেডি,' দেখাল ভ্রমর সরকারকে।

মুখ লাল হয়ে গেল জয়ন্ত চৌধুরির, 'বলিনি মানে? এক ডজন বার বলেছি!'

'না, না, না,' উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায় পৌঁছে গেল ইন্দ্র কণ্ঠ—'শুধু বলেছিলে, 'একটা, সাইফন। অনেক হৃদ্যশালায় থাকে যে-রকম সাইফন, সেই সাইফন। কিন্তু এই বিশেষ সাইফনের কথা তো একদম বলোনি।'

রেগে গেল জয়ন্ত—'ঝাঁটার বাড়ি মারা হয়েছে সান্যাল সাহেবের মাথায়—সাইফন দিয়ে খুলি ফাটানোর চেষ্টা হয়নি।'

'হয়েছিল,' বললে ইন্দ্রনাথ।

নিস্তব্ধ হয়ে গেল শয়নকক্ষ। এখন একটা আলপিন পতনের শব্দও শোনা যাবে।

দম নিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ—'অর্ডিনারি সাইফন প্লেন গ্লাসে তৈরি হয়। এই রকম মেট্যাল ব্যাণ্ড-এর কাটাকুটি মোড়ক থাকে না। সাইডের সরু পাইপে ফানেল লাগানো থাকে না। সংক্ষেপে, একে বলা হয় ফোয়ারা সাইফন। গ্রীক দেশে এক সময় এই রকম সাইফন ব্যবহার করা হত। আনুমানিক ২৫০ খ্রিস্টাব্দে হিরো বা হেরন লিখে গেছেন 'নিউম্যাটিকা' কেতাবে। সাইফন আর ফোয়ারা যেন একই সঙ্গে। সান্যাল সাহেবের কিউরিও সংগ্রহের বাতিক ছিল দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর সময়ে। নিশ্চয়ই তখন এই সাইফন সেখানকার কোনো কিউরিও শপ থেকে কিনেছিলেন। ঠিক বলছি?'

সান্যাল সাহেব লাল চোখে তাকিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

'কী বলতে চাও?' গর্জন ছেড়েছে জয়ন্ত।

'বলতে চাই?' বললে ইন্দ্রনাথ—'এই সাইফনের একদিক দিয়ে প্লেন ওয়াটার অথবা সোডা ওয়াটার ঢেলে ভর্তি করে রাখা হয়। দরকারের সময়ে এই হ্যাণ্ডেলটায় চাপ দিলেই ফোয়ারার মতো জল অথবা সোডা ওয়াটার মদের গেলাসে এসে পড়ে।'

'তাতে হলটা কী?'

'কারসাজি, মাই গুড ফ্রেণ্ড, কারসাজিটা করা হয়েছিল এই সাইফন-যন্ত্রেই।'

বলতে বলতে টেবিল থেকে একটা কাচের গেলাস তুলে নিয়ে, তাতে পিচকিরির মতো একটু সোডা ওয়াটার ঢেলে নিয়ে, জিভ ঠেকাল ইন্দ্রনাথ।

বললে বিস্বাদ বিকৃত মুখে—'মিস্টার গজানন গম্ভীর, খুনের চেষ্টা আর টাকা চুরি—এই দুই অপরাধে আপনি অভিযুক্ত। আত্মসমর্পণ করুন।'

ইন্দ্রনাথ রুদ্র এখন বসে রয়েছে বেলেঘাটায় নিজের বাড়িতে। বিরাট আড্ডা জমেছে হিরো-কে ঘিরে।

খেঁকিয়ে বলছে ইন্দ্রনাথ, 'কী আশ্চর্য! এখনও মাথায় ঢুকল না আপনার?'

'আজ্ঞে না,' সবিনয়ে স্বীকার করলেন ডক্টর বাগচি।

'আমার মাথাতেও ঢোকেনি,' সানাইয়ের পোঁ ধরে গেল ভ্রমর সরকার। তার মুক্তো চোখে এখন অত্যাশ্চর্য বিচ্ছুরণ ঘটে চলেছে। একেই বলা হয়, হিরো ওয়ারশিপ। বীরপূজা।

'পুরো ট্রিক রয়েছে একটা ড্রাগের মধ্যে। যে ড্রাগ পেটে গেলেই মাথার ভেতরটায় হঠাৎ এমন রক্তচাপ বেড়ে যাবে যার ফলে মনে হবে যেন দমাস করে বাড়ি মারা হয়েছে মাথায়। যন্ত্রণা আচমকা ফেটে পড়বে, কানের মধ্যে যেন প্রলয় নিনাদ শোনা যাবে, মুহূর্তের মধ্যে সংজ্ঞা লোপ পাবে। ডক্টর বাগচি, ড্রাগটার নাম বলতে চাইছি না। আপনি তো বুঝেছেন? থাক, থাক, নামোচ্চারণে দরকার নেই। সারা দিনে গজানন গম্ভীর বেশ কয়েকটা সুযোগ পেয়েছিল ফোয়ারা-সাইফনের জলে বিশেষ এই ড্রাগটা ঢেলে দেওয়ার। জলের মতো তরল ড্রাগ, বিরঙ, নির্গন্ধ—কিন্তু মিশিয়েছে সান্যাল সাহেব যে সময়ে লাস্ট হুইস্কি পান করেন—তার ঠিক আগে। মিস সরকার, এ-ব্যাপারে আপনার সাহায্য পেতে পারি?'

'অবশ্যই,' ভ্রমর সরকারের দুই চোখে এখন যেন তুর্কি-নাচন চলেছে।

'আপনি আর গজানন গম্ভীর মহাশয় দু-জনে বসেছিলেন লাইব্রেরি ঘরে?'

'হ্যাঁ।'

'এইমাত্র আমি দেখে এলাম, শ্রীযুক্ত গজানন গম্ভীর যে চেয়ারে বসতেন, সেই চেয়ারে বসলে, আর স্টাডি রুমের দরজা খোলা থাকলে, সটান দেখা যায় টয়লেট রুমের দরজা। ঠিক বলছি?'

'হ্যাঁ, বলছেন।'

'ন-টা বাজবার কিছুক্ষণ আগে গজানন গম্ভীর উঠে গিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ঢুকেছিল। ওরকম প্রায়ই যায়—'

'বেরিয়ে এসে স্টাডিরুমের দরজা কি নিজে টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ —'

'আপনি যেখানে বসেন, সেখানে বসে দেখে এলাম, স্টাডির দরজা খোলা থাকলে, টয়লেটের দরজা দেখা যায় না। কারেক্ট?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তাহলে শুনুন, গজানন গম্ভীর নিজের চেয়ারে বসে লক্ষ্য রাখছিলেন টয়লেটের দরজার ওপর। বয়স হয়েছে সান্যাল সাহেবের। হাই ব্লাড সুগারের রুগী। ইনসুলিনও নিয়েছিলেন। ঘনঘন টয়লেট যেতে হয়। ব্লাডারের স্ট্রেস্থ কমে যায় এই বয়েসে। একটু বেশি সময় লাগে ব্লাডার খালি করতে। গজানন দেখেছিলেন, কখন টয়লেটে ঢুকলেন সান্যাল সাহেব। দরজা বন্ধ করলেন। সঙ্গে

সঙ্গে উঠে গিয়ে, টেবিল থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে, টাকা ভর্তি ব্যাগ আর দুটো ফাইল বের করে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন বাগানের ঝোপে। চাবি যথাস্থানে রেখে দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়ে এসে বসেছিলেন নিজের জায়গায়। আসবার আগে ফোয়ারা—সাইফনে মিশিয়ে দিয়ে এসেছিলেন মারাত্মক সেই ড্রাগ। অল ক্লিয়ার?'

ভ্রমর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে শুধু বললে, 'মাই গড।'

ইন্দ্রনাথ বলে গেল, 'আর একটা স্টেপ বলতে ভুলে গেছি। মই ছিল জানালার বাইরে—দেওয়ালে সাঁটানো—আগে থেকেই বেখে দিয়েছিলেন গজানন। বেরিয়ে আসবার আগে সেই মই রেখে দিয়েছিলেন হেলিয়ে—যাতে মনে হয়, চোর মই বেয়ে উঠে এসেছে—জানালা খোলাই ছিল।

'রাত ন-টা নাগাদ লাস্ট ড্রিংক গলায় ঢাললেন সান্যাল সাহেব, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন, অনেক কিছুই ঠিকরে ফেলে দিলেন কার্পেটে, নিজেও ঠিকরে গেলেন মাথার মধ্যে আচমকা রক্ত ছুটে যাওয়ায়! হাই ব্লাডপ্রেশারের পেশেন্ট। নাক মুখ চোখ দিয়ে রক্ত ছিটকে যাবেই। তাই মনে হয়েছে, মাথায় ডাণ্ডা পড়েছে, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, মাথায় ডাণ্ডা হাঁকড়ালে তো এইরকম অবস্থাই দাঁড়ায়।

'মিস সরকার, দরজা খুলতে চাইছে না—এই ব্যাপারটায় ভালো অভিনয় করে গেছেন শ্রীযুক্ত গজানন গম্ভীর, এমন ভান করেছেন যেন দরজা ফুলে উঠে সেঁটে গেছে। আসলে সময় নিচ্ছিলেন। যাতে আপনাব মনে হয়, কল্পনায় গড়া চোর সিন্দুক ফাঁক করে চম্পট দেওয়ার সময় পেয়েছে যথেষ্ট। তারপর বীর হনুমানেব মতো লম্ফ দিয়ে, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছেন। সান্যাল সাহেবকে চিৎ করে শোযানোর সময়ে জামার ভেতরে লুকিয়ে রাখা ঝাঁটা রূপী ডাণ্ডা চালান করে দিযেছিলেন সান্যাল সাহেবের বডির তলায়। হাত সাফাই শেষ করেই নাটকীয়ভাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেদিকে। ধবে নিচ্ছি, আপনি তখন জানলা-টানলা খুলছিলেন বেশি হাওয়াব জন্যে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—'

'তার পরেই, সান্যাল সাহেবের মাথার পেছনদিকে হাত বুলিয়ে ন্যাকামি ঠাসা আতঙ্ক-চিৎকার ছেড়েছিলেন—যাতে আপনি ঘাবড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, ডাক্তারকে ফোন করতে। কারেক্ট?'

'ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস—'

'ফলে, স্টাডি রুমে এক্কেবারে একলা থেকে গেলেন শ্রীযুক্ত গজানন গম্ভীর। তখন কী করলেন?'

'কী করলেন?'

'ডাণ্ডা দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে মাথায় মেরে তিনটে চোটের চিহ্ন ফুটিয়ে তুললেন। সান্যাল সাহেব তখন তো অজ্ঞান আর আপনি করছেন টেলিফোন।'

'তারপরেই গাড়ির চাবির রিং থেকে সিন্দুকের চাবি খুলে নিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলেন সিন্দুকের ফোকরে—যাতে সবার নজর যায় সিন্দুকের দিকে এবং দেখা

যায় সিন্দুক লুঠ হয়ে গেছে—অবশ্যই সেই তস্করের দ্বারা যে মেরেছে ডাণ্ডা সান্যাল সাহেবের মাথায়।'

এক সেকেণ্ড মুগ্ধ চোখে চেয়ে থেকে বললে মাধুরী মেশানো মেয়ে—'গজানন দ্য গ্রেট ঠিক ওইদিন ড্রাগ আনবে কেন? সান্যাল সাহেব তো আগের দিনও বলেননি আমাদের চাকরি যাবে?'

'আঃ!' বিরক্ত হল ইন্দ্রনাথ—'একদিন না একদিন সিন্দুক লুঠ করতই। প্ল্যান ছকা ছিল অনেক আগে নইলে ঝট করে মই পেল কোথায় বাগানে? সেটাও এনে রাখা ছিল অনেক আগে। লাইব্রেরিয়ানের চাকরি বিরল এই বেকার-যুগে—বিশেষ করে যখন বিয়ের ইচ্ছে ঘুরছিল মাথার মধ্যে—'

'থাক সে কথা', ঝটিতি বললে ভ্রমর—'তারপর কী করল গজানন?'

'হুইস্কি—গেলাসে তখনও যে-টুকু হুইস্কি ছিল—ড্রাগ মেশানো হুইস্কি ফেলে দিলেন টয়লেটের ওয়াশ বেসিনে—গেলাস ধুয়ে নিয়ে এসে তাতে ঢাললেন সামান্য নির্বিষ হুইস্কি, বোতল থেকে গড়িয়ে দিলেন কার্পেটে। কান ছিল আপনার উচ্চকণ্ঠে টেলিফোনে কথাবার্তার দিকে। যেই শুনতে পেলেন, কথা শেষ হয়েছে—ফোয়ারা-সাইফনের ড্রাগ মেশানো জল টয়লেটে ফেলে দেওয়ার সময় আর নেই—চোখে মুখে ভয়ানক ভয় আর উদ্বেগ ফুটিয়ে চেয়ে রইলেন স্টাডি-রুমের দরজার দিকে—যে দরজা দিয়ে ঢুকছেন আপনি আর ডাক্তার বাগচি। ভালো কথা, বুদ্ধিমান গজানন এত কাণ্ড সেরেছিল হাতে রুমাল জড়িয়ে—তাই আঙুলের ছাপ কোথাও পড়েনি। আমার কথা শেষ হয়েছে।'

ক্ষণেক মৌনী থেকে বললেন ডক্টর তুষার বাগচি—'আপনি তাহলে বলতে চান, সান্যাল সাহেব মই-টা দেখেছিলেন, তাই জানলা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। মস্ত জাহাজ সামাল দিয়ে যিনি নিয়ে গেছেন সমুদ্রের পাহাড় প্রমাণ ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে, কিন্তু অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্পন্ন পুরুষ সিংহ। জানলার বাইরে মই লাগানো দেখেই চোরের আবির্ভাব ঘটতে পারে ভেবে নিয়ে জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভেতর থেকে। শ্রীযুক্ত গজানন গম্ভীর দেখেছিলেন কেঁচে যেতে বসেছে তাঁর নকশাবাজি—কিন্তু জানলা খুলে দেওয়ার আর সময় পাননি। ডক্টর বাগচি, আপনি অবশ্যই জেনে গেছেন, মিস ভ্রমর সরকার ইজ আ ভেরি পজিটিভ ইয়ং লেডি। মাথা আর চোখ চলে সমান তালে। তাই উনি চোখ মেলে দেখেছিলেন, জানলার পাল্লা বন্ধ। জানলায় যে ছিটকিনি তোলা, তাও দেখে নিয়েছিলেন। এবং সেটা দেখেই হট্টগোল সত্ত্বেও জানলা খুলে রাখার সাহস আর হয়নি গজানন গম্ভীরের। মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না—বিশেষ করে যে মেয়ের নাম মিস ভ্রমর সরকার।'

আরক্তকপোলা মুক্তানয়নার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফের বলে গেল ইন্দ্রনাথ—'একটা বিষয়ে অবশ্য ভাগ্য সহায় হয়েছিল শ্রীযুক্ত গজানন

গম্ভীরের। আর একটা বিষয়ে হয়নি। যে বিষয়টায় হয়নি, সেটা আগে বলে নিই, পুলিশ স্টাডিরুমে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় ফোয়ারা সাইফনের ড্রাগমেশানো জল ফেলে দেওয়ার সেকেণ্ড চান্স আর পাননি ভদ্রলোক—'

ফট করে বলে ফেললেন ভ্রমর সরকার—'ছোটোলোক'।

কর্ণপাত না করে ইন্দ্র বলে গেল—'যে বিষয়টায় লাক ফেভার করেছিল, তা এইঃ সান্যাল সাহেব পেছনদিকে কখনো কোনো পায়ের আওয়াজ শোনেননি।'

জোড়া জোড়া চাহনি নিবদ্ধ ইন্দ্রনাথের মুখের ওপর। এ আবার কী কথা? সান্যাল সাহেব নিজে বলেছেন, পায়ের শব্দ শুনেছিলেন পেছনে—!

ইন্দ্র বলে যাচ্ছে, 'কার্পেট যখন অত পুরু, পায়ের শব্দ সেখানে জাগ্রত হয়? না। তাহলে? উনি তো মিথ্যুক নন। তাহলে কী? উনি পরে মনে করে নিয়েছিলেন, মাথায় যে ডাণ্ডা হাঁকিয়েছে, সে নিশ্চয়ই উড়ে আসেনি—হেঁটে এসেছে—অতএব, পায়ের শব্দ শুনেছেন। ফের বলছি, এটা একটা মতিভ্রম। বাইরের প্রকৃতির রুদ্রতাল-মনের ভেতর দোলা দেয়, গাছপালার দুলুনির সোঁ ফট ফট শব্দ আর মাথার ভেতরে অকস্মাৎ ডাণ্ডা হাঁকড়ানোর মতো প্রলয়-অনুভূতি—এই দুই মিলে যে হ্যালিউসিনেশন—তা থেকেই ওঁর মনে হয়েছে, আততায়ীর পদশব্দও শুনেছেন। ওঁর মতো দিলখোলা মানুষের সঙ্গে একটু কথা বললেই উনি বুঝে নেবেন, মনগড়া মিথ্যের উৎপত্তিটা কী কারণে আর কী পরিবেশে। তবে হ্যাঁ, উনি বড়ো বেশি বড়াই করেন নিজের ভাইটালিটি নিয়ে—সেইটাই ওঁকে মেরেছে। এই বয়েসে একটু ব্রেক কষে চলা দরকার—কিন্তু উনি বড়ো একরোখা। নার্ভ-এর অবস্থা শোচনীয়—কিন্তু কিছুতেই তা স্বীকার করবেন না। সমুদ্রের ধারেই ওঁর একবছর থাকা দরকার—মেরিন ড্রাইভে অথবা জুহু বিচে অথবা মালাবার হিলে। জানলার সামনে মই দেখে, চোরের কথা সেই যে ভাবতে শুরু করেছিলেন—সেই ভাবনার গাছই ফল আর ফুল ছড়িয়ে গেছে পরেও—মিথ্যে কল্পনার ফল আর ফুল।'

আড়চোখে ডক্টর বাগচির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে ভ্রমর সরকার—'টাকার ব্যাগ জানলা দিয়ে বাগানের ঝোপে ফেলে দিয়েছিল গজানন। তাই তো বললেন?'

'হ্যাঁ, তাই বলেছি।'

'সে টাকা কোথায়?'

'ডাক্তার আর পুলিশ যখন সান্যাল সাহেবকে নিয়ে ব্যস্ত, তখন, সেই হট্টগোলের মধ্যে, ঝোপের মধ্যে থেকে ব্যাগ আর ফাইল দুটো হাওয়া করে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত গজানন—'

'সে টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ?'

'করেছে। গজাননের গজাবাস থেকে।'

এবার সরাসরি ডক্টর বাগচির চোখে চোখ রেখে বললে ভ্রমর, 'কিন্তু আমি যে চাপা ধপ ধপ ধপ আওয়াজ তিনটে শুনেছিলাম—'

'আফটার থট,' জবাবটা দিল ইন্দ্রনাথ, 'আপনার উদ্বেগ মেশানো ঝোড়ো রিপোর্টে একটু ফ্যানট্যাসি-কল্পনা ঢুকে গেছিল। বাগানের গাছের শাখার ঝটপট আওয়াজকে ধপ ধপ আওয়াজ মনে করে অজ্ঞাতসারে আমাদের কানে তা চালান করে দিয়েছিলেন।'

ডাক্তারের চোখ থেকে তখনও চোখ সরায়নি ভ্রমর। সরাননি ডাক্তার সাহেবও।

এই অবস্থাতেই একটু নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললে ভ্রমর, 'কিন্তু গজানন যে স্বর্গ মরীচিকা দেখেছিল আমাকে ঘিরে—'

'তাই কি হয়?' বললেন ডাক্তার—'আমি যে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন আপনার জন্যেই ঠিক করে রেখেছি।'

কাহিনির 'কাট' এখানেই।

নেপথ্য কৌশল

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কৌটিল্য লিখেছিলেন 'অর্থশাস্ত্র'। চল্লিশ রকম দুর্নীতির লিস্ট বানিয়ে দিয়েছিলেন। আড়াই হাজার বছর পরে চল্লিশ রকম ঘুষ কম করেও চারশ রকমের ঘুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াবেই। ঘুষ নেওয়া বন্ধ করা যায় না। কেননা, দক্ষতা দেখানোর জন্যেই ঘুষ নেওয়া। ঘুষ দিলে দক্ষতা বাড়ে। ঘুষ যে নিচ্ছে, সে দক্ষতা দেখাবে বলেই ঘুষ নিচ্ছে, ঘুষ যে দিচ্ছে, সে-ও দক্ষতা দেখিয়ে লাভ বাড়াবে বলেই ঘুষ দিচ্ছে। কাটমানি অথবা ঘুষ অথবা উৎকোচ অথবা দুর্নীতি—'কৌশল' নামক এক শার্দুলের বিভিন্ন নাম। অর্থনৈতিক ইন্দ্রজালের আর এক প্যাঁচ। কৌটিল্য তো লিখেই গেছিলেন—'জিভে মধু (বা বিষ) পড়লে তার স্বাদ না নিয়ে কি থাকা যায়?' কোটি কোটি টাকা যার হাত দিয়ে যাচ্ছে আর আসছে, তার হাতে টাকার গুঁড়ো তো লেগে থাকবেই। জলের মাছ জল পান করবে না?

কোরাপশন সমর্থনের নিবন্ধ এটা নয়। কোরাপশনকে কব্জায় এনে এক রাজপুরুষ ঐন্দ্রজালিক কুবের বনে গেছিলেন। কিন্তু চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতায় সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখলেন—একে ভোগ করতে দেওয়া হবে না। একে নিঃসন্তান করা হোক। একে নির্বংশ করা হোক।

তাই হলো। ক্রাইম করলে পানিশমেণ্ট পেতেই হবে। ঐন্দ্রজালিক ঘুষখোর এমন এক সুন্দরীকে বিয়ে করলেন যিনি বিউটি কনটেস্টে নামলে অনায়াসেই ছায়াপথ সুন্দরী, মানে, গ্যালাক্সি বিউটি হতে পারতেন। কিন্তু চিত্রগুপ্তের অদৃশ্য রায় অজান্তেই তাঁকে মাথা পেতে নিতে হলো। বংশে বাতি দেওয়ার জন্যে কাউকেই তিনি ধরায় নিয়ে আসতে পারলেন না।

বিষয় বিষ। এই বিষ ছুঁয়ে গেল ঐন্দ্রজালিক রাজপুরুষকেও। তিনি অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন। ল্যাংটো হয়ে এসেছিলেন, ল্যাংটো হয়ে চলে গেলেন। জগৎবাসীকে মনে করিয়ে গেলেন গীতার সারাংশ—তুমি যা নিয়েছ, এখান থেকেই নিয়েছ। এখানকার জিনিস এখানেই রেখে যাচ্ছ। তোমার যা ছিল, গতকাল তা অন্য কারও ছিল, আগামীকাল তা অন্য কারও হবে।

ডানাকাটা পরী চায়না চাকী বিধবা হলেন বটে, কিন্তু পৃথিবীটা যেন পায়ের তলায় রয়েছে—এই রকম একটা ভাব নিয়ে চলতে লাগলেন। প্রেম সাগরে খেল্ দেখিয়ে গেলেন জলকন্যা কৌশলে—ধরা দিলেন না কোথাও। অনেককে ডোবালেন, নিজে ডুবলেন না।

সূর্যকেও দিনের শেষে তেজ হারাতে হয়। যৌবন শেষে চায়না চাকীও রূপের তেজ হারালেন। কিন্তু টাকার গরবে দাপিয়ে চলতে লাগলেন। কিন্তু জরা আর ব্যাধি টাকার তোয়াক্কা রাখে না। তাই বাহাত্তর বছর বয়েসে তিনি ক্রনিক হাঁপানিতে আক্রান্ত হলেন।

তাঁর কুবের স্বামী গোটা ভারত জুড়ে বিষয় আশয় গুছিয়ে রেখেছিলেন। পর্বতময় জঙ্গলাকীর্ণ রিয়েল এস্টেট কিনে রেখেছিলেন মার্কারা-য়—যেখানে জেনারেল কারিয়াপ্পার বাসভূমি—সেখান থেকে আরও পশ্চিমে—ম্যাঙ্গালোর যাওয়ার পথে। এই সেই মনোরম পার্বত্য অঞ্চল যেখানে এসে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন,—'সূর্য ওঠে টাইগার হিলে, নেমে যায় মার্কারা-র পাহাড়ে!' তাঁর এই উক্তি স্থানীয় ব্যক্তিরা আজও স্মরণ করে।

ম্যাডাম চায়না চাকী কুবের স্বামীদেবতার রুচির তারিফ করেন বটে, কিন্তু হাঁপানির টান ধরার পর থেকে এত উঁচু জায়গায় আর থাকতে পারেন না।

নেমে এসেছেন ম্যাঙ্গালোরে। আরব সাগরের পাশে। এখানকার মানুষরা প্রায় সবাই ফর্সা। কথা বলে কোঙ্কানি ভাষায়—যা হঠাৎ শুনলে মনে হবে যেন বাংলা ভাষা। সুরেলা, মিষ্টি, ঝঙ্কারময়। একটু একটু মিলও আছে। তার কারণও আছে। কিন্তু সে ইতিহাসে ঢোকবার জন্যে নয় এই কাহিনি।

ম্যাঙ্গালোর সোনাদানার জায়গাও বটে। সুদীর্ঘ পশ্চিম উপকূল রীতিমত অরক্ষিত বলেই সোনা স্মাগলিং-এর মস্ত কেন্দ্র এই ম্যাঙ্গালোর। এইখানেই একটা সুন্দর বাগানবাড়ি জলের দরে কিনেছিলেন ম্যাডাম চায়না চাকী। সেখানে তিনি একা থাকেন। গ্যারেজের গাড়ি একাই চালান। নির্জন আর নিতান্ত প্রাইভেট সমুদ্রতীরে একা হাওয়া খান। 'রেসক্যু স্কোয়াড' পুষে রেখেছেন নিজের পয়সায়। বালুকাবেলায় অথবা সমুদ্রে স্নান করতে কদাচিৎ কেউ এলে তাদের সেবা করে, কিন্তু 'রেসক্যু স্কোয়াড' এর আসল কাজ ম্যাডাম চাকীর দেখাশুনা। বিটকেল ব্যারামটা মাথা চাড়া দিলে যখন নিজে সামলাতে না পারেন, তখন 'রেসক্যু স্কোয়াড' তাঁকে নিয়ে গিয়ে তোলে 'কুবের হসপিটালে'।

হসপিটালের নাম কুবের? খটকা লেগেছে নিশ্চয়। প্রাঞ্জল করা যাক।

ম্যাডাম চায়না চাকীর স্বামীদেবতা এক দুষ্ট চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছিলেন। এই ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করা সহজ, বেরোনো দুঃসাধ্য। তাই অকালে মহাপ্রয়াণ করেছিলেন।

ম্যাডাম চায়না চাকী তা বুঝেছিলেন। যৌবনের প্রলয়বন্যা যখন দেহেমনে আছড়ে পড়ে, তখন অনেক মেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ম্যাডাম চাকী হারাননি। শরীরের ধর্মরক্ষা করেছেন, কিন্তু আত্মবিস্মৃত আর বেইমান হন নি। টাকায় টাকা বাড়ে। ঘুষের টাকা আরও তাড়াতাড়ি বাড়ে। কিন্তু ম্যাডামের দেহমনে ছিল পরমাশ্চর্য এক উপাদান। মনোবিজ্ঞানী আর জীববিজ্ঞানীরা তা নিয়ে গবেষণা করলে পেতেন নতুন এক 'রসায়নে'র সন্ধান যা মানুষকে অন্য এক জীবনে নিয়ে যেতে পারত।

দুষ্ট স্বামীকে তিনি ভালবাসতেন। ঘুষের টাকা সমাজকল্যাণে অকাতরে ব্যয় করে গেছেন ম্যাডাম চাকী। প্রতিটি ব্যয় মানে স্বামীর পাপক্ষয়। এখানকার মণিপাল হসপিটালের সঙ্গে টেক্কা মেরে গড়েছেন 'কুবের হসপিটাল'। সেই

হাসপাতাল গড়া হয়েছে ইংরেজী E এর গড়নে। তিনটে সমান্তরাল উইং-এর ফাঁকে যে দুটি 'স্পেশ' রয়েছে, তার একটিতে আছে সুইমিংপুল, আর একটিতে আছে রত্নগর্ভ কুবেরের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তর মূর্তি। ব্যাঙ্গালোরের ধনপতিরা আকাশপথে উড়ে এসে এই ম্যাঙ্গালোরে নামে তাদের উপাস্য দেবতাকে দেখে যাওয়ার অভিপ্রায়ে। কুবেরের স্ট্যাচু আর কেউ গড়েছে বলে তাদের জানা নেই। কেননা, পুরাণের এই যক্ষরাজের চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। হিমালয়ে তপস্যা করতে করতে তাঁর মতিভ্রম হয়েছিল। চোখ খুলে দেবী রুদ্রানীকে দেখে ফেলেছিলেন। চোখের তারায় নিশ্চয় কামনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। ফলে, তাঁর ডান চোখটা গেল পুড়ে, আর বাঁ চোখটা ধুলোয় নোংরা হয়ে গিয়ে পিঙ্গল বর্ণের হয়ে গেল। শুধু এক পিঙ্গল হলেও রক্ষে ছিল। চেহারাটাও মোটেই খুবসুরৎ ছিল না। কুৎসিত বললেও কম বলা হয়। দেব-দানব-মানুষ—এদের সবার থাকে দুটো পা আর বত্রিশ পাটি দাঁত। কুবেরের ছিল তিন তিনটে পা আর মাত্র আটখানা দাঁত।

তেপায়া আর অষ্টদন্ত কুবেরকে দেখতে তাই টুরিস্টরা আসত সমুদ্রের এই নির্জন তীরে। একটু দূরে তাদের জন্যে সারি সারি কটেজ বানিয়ে দিয়েছিলেন ম্যাডাম চাকী। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁকে ম্যাডাম আহুতি বললে কিন্তু চটে যেতেন। আহুতি তো কুবেরের বউয়ের নাম।

অথচ, নিজের ছোট্ট বাগানবাড়ির নাম রেখেছেন, 'চৈত্ররথ', পাহাড়ের কেল্লাপতির অট্টালিকার নাম রেখেছেন 'কৈলাস', ব্যাঙ্গালোর ভবনের নাম দিয়েছেন 'অলকা'। সবই পুরাণ থেকে নেওয়া নাম। কুবের কাহিনী যারা জানে, তারা চমৎকৃত হয় নাম চয়নের মাধ্যমে স্বামীর প্রতি ম্যাডাম চাকীর ভালবাসার বিকাশ দেখে। উনি অবশ্য ক্ষেপে যেতেন কেউ ধরিয়ে দিলে।

সবচেয়ে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছিলেন নিজের প্রাইভেট প্লেনের নামকরণে। ব্যাঙ্গালোর থেকে মোটর রুটে ম্যাঙ্গলোর আসতে গেলে মার্কারা-র পাহাড় টপকে একটানা বারো ঘণ্টা ড্রাইভ করতে হয়। তাই এয়ার রুট আছে বিত্তবানদের জন্যে। ম্যাডাম চাকী ব্যাঙ্গালোর-ম্যাঙ্গালোর যাতায়াত করেন নিজের প্লেনে। প্লেনের নাম রেখেছেন 'পুষ্পক'। কুবের তো 'পুষ্পক' উপহার পেয়েছিল দেবতাদের কাছ থেকে। স্টেপ-ব্রাদার রাবণ কেড়ে নিয়েছিল গায়ের জোরে—তাইতে চাপিয়ে সীতাকে নিয়ে...।

যাক গে, এ কাহিনি রামায়ণের উপাখ্যান নয়। 'পুষ্পক' প্রসঙ্গে আসতে হলো একটাই কারণে। কাহিনিটা রুধিররঞ্জিত হলেও 'পুষ্পক'-এর ভূমিকা আছে তার মধ্যে।

এবারে চলে আসা যাক ম্যাডাম চাকীর হাঁপানির টান ওঠার দিনটিতে। ব্লাড সুগার বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তার বদ্যিরা বলেছিলেন—'হাঁটুন, হাঁটুন, রোজ অন্তত আধঘণ্টা হাঁটুন'। উনি সেদিন রোদ ওঠার আগেই হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। নিস্তরঙ্গ আরব সাগর দেখতে দেখতে আর মিঠে হাওয়া খেতে খেতে ফাঁকা সৈকত বেয়ে

অনেকদূর চলে গেছিলেন। ইতিমধ্যে তপনদেব সাত ঘোড়া হাঁকিয়ে উঠে এসেছেন আকাশে। তখন ওঁর টনক নড়েছে। রোদ মাথায় নিয়ে যখন বাগানবাড়ি 'চৈত্ররথ'য়ে ফিরলেন, তখন বুক যেন চৌচির হয়ে যেতে চাইছে অক্সিজেনের অভাবে—অথচ, দেদার অক্সিজেন রয়েছে তাঁকে ঘিরে। চোখে প্রায় ধুতরোফুল দেখছিলেন বলে 'রেসক্যু স্কোয়াড'কে ডাকবারও সময় পেলেন না—অথবা, ইচ্ছে হলো না। তিনি যে পরমাশ্চর্য উপাদানে গড়া। নিজেই নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে চান। পুরুষ জাতটাকেও টপকে যেতে চান—

'কুবের হাসপাতাল' তো মাইল পাঁচেক। কতক্ষণই বা লাগবে। সম্পূর্ণ মনের জোরে ড্রাইভ করে পৌঁছে গেলেন কুবের হসপিটালে। রিসেপসনিস্ট হুইল চেয়ার এনে তাঁকে পৌঁছে দিল দু'নম্বর কেবিনে। উনি খবর পাঠালেন ডক্টর শান্তনু খাস্তগীরকে—এই হাসপাতালের কর্ণধার। আমেরিকা তাঁকে ছাড়তে চায়নি কিন্তু ম্যাডাম চাকীর ডাক,তিনি ফেলতে পারেন নি। 'কুবের হসপিটালে'র আত্মা তিনি।

কিন্তু চেম্বারে নেই ডক্টর খাস্তগীর—হাসপাতালেই নেই।

কষ্ট আর সইতে পারছিলেন না ম্যাডাম চাকী। নার্সকে বললেন—'এখুনি চাই একটা ইঞ্জেকশন। ওয়ান থাউজেণ্ড এপিনেফ্রিন-জিরো পয়েণ্ট থ্রি সিসি ডোজ। কুইক।'

হুস হুস শব্দ ছেড়ে এই টুকুই শুধু বলতে পেরেছিলেন একদা দুর্দান্ত যৌবনা চায়না চাকী। বুক উঠছে আর নামছে প্রবল বেগে। চোখের সামনে যেন সাদা সাদা ফুটকি দেখছেন। ভেতরটা যখন অক্সিজেনের অভাবে খাই খাই করতে থাকে, তখনকার কষ্ট মুখে বোঝানো যায় না...

ভয়ে ভয়ে নার্স বললে—'ডক্টর সেন-কে ডাকব?'

হু-উ-উ-স শব্দে চায়না বললেন, 'ডাকুন...কুইক।'

ডক্টর সবুজ সেন এই হাসপাতালের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ছিলেন এমারজেন্সিতে। চলে এলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। দীর্ঘকায় পুরুষ। রগের ওপর চুলে পাক ধরেছে—যদিও তিনি বিলক্ষণ যুবাপুরুষ। মেদহীন চাবুক চেহারা। ইনটেলিজেন্ট চোখ, বাটালির মতন চিবুক, ভোজালির মতন নাক।

বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ—এক নজরেই মালুম হয়।

চায়নার চোখে তখন ধোঁয়া ভাসছে। তার মধ্যে দিয়েই তিনি দেখে নিলেন, নার্সের হাত থেকে একটা অ্যামপুল টেনে নিয়ে লেবেল যাচাই করে নিলেন ডক্টর সেন। পয়েণ্ট থ্রি সিসি ইঞ্জেকশন দিলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল ম্যাডাম চায়না চাকীর। অক্সিজেন যাচ্ছে হার্টে।

বললেন 'বেশি রোদ লাগানোর ফল।'

'কণ্ডিশনটা যখন ক্রনিক, সঙ্গে অ্যাম্পুল আর সিরিঞ্জ রাখবেন।' বিনীত জবাব ডক্টর সেনের।

'সর্বনাশ। নিজের গায়ে ছুঁচ ফোটাবো? না ফুটিয়েই বাঁচব দেড়শ বছর।'

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইঞ্জেকশন দেওয়ার নির্দেশ দিলেন ডক্টর সেন।

গেলেন বাইরে। পেছন থেকে চায়না চাকী দেখতে পেলেন তাঁর ঘাড়ের পেছন আর পাশ। সেলাই করা বীভৎস একটা ক্ষতচিহ্ন।

শুধু দেখতে পেলেন না নিজের আয়ু। আর মাত্র পনেরো ঘণ্টা।

ব্যাঙ্গালোরে গেছিলেন ডক্টর শান্তনু খাস্তগীর। ফিরলেন ইভনিং রাউণ্ডের সময়ে। দেখলেন চায়না চাকীকে। মণিবন্ধে আঙুল রেখে বললেন—'ফাইন। পাল্‌স্ গুড। হার্ট রেগুলার অ্যাণ্ড স্ট্রং। কালকেই বাড়ি যাবেন।'

ঘষা গলায় ম্যাডাম বললেন—'যেতেই হবে। সামনেই ইলেকশন। অনেক কাজ।'

'ইলেকশনে নামছেন নাকি?'

'নামাচ্ছি।'

'কাকে?'

'দ্যাটস্ আ সিক্রেট।'

বিদায় নিলেন ডাক্তার। ম্যাডাম চায়না চাকী তাঁর স্বামীর ঘুষের টাকার সুদ ভেঙে যদি দেশসেবা করতে চান উত্তম পরিকল্পনা। টাকার জোর নেই বলে কত ভাল ক্যানডিডেট ইলেকশনে কনটেস্ট করতে পারছে না। দেশ গোল্লায় যাচ্ছে। ম্যাডাম অন্তরালে থাকতে চান—থাকুন।

রাতের খাওয়া বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন ম্যাডাম। রাত আটটায় নিলেন এপিনেফ্রিন ইঞ্জেকশন।

বাকি রইল সাত ঘণ্টার আয়ু।

সকালবেলা তাঁর ডেডবডি পাওয়া গেল রিসেপসনিস্টের চেয়ারে।

দু'নম্বর কেবিনে নয়। একতলার কেবিন থেকে তাঁকে এনে রবার ব্যাণ্ড দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে রিসেপসনিস্টের চেয়ারে। হাসপাতালের ঢিলে পোশাকটাও গায়ে রাখা হয় নি। চেয়ারের পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে রবার ব্যাণ্ডের গিঁট। সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে রবার ব্যাণ্ড যেন চামড়া কেটে বসে গেছে বক্ষোদেশের ঠিক নিচে। মৃত্যুকালে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন নিশ্চয়। ঘেমেছিলেন। মুখ দিয়ে রক্তও বেরিয়েছিল। দাঁতে জমে রয়েছে রক্ত।

ডাঃ সেন এলেন। ডেথ সার্টিফিকেটে লিখলেন—কারডিয়াক অ্যারেস্ট। মৃত্যু এসেছে হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ায়।

ডাঃ শান্তনু খাস্তগীর এলেন। দেখলেন বীভৎস দৃশ্য। নার্সদের ডাকলেন। জানতে চাইলেন—ডেডবডি কে এনেছে কেবিনের বাইরে? কে এই বৃদ্ধার অঙ্গ থেকে বসন অপসারণ করেছে? কে তাঁকে এই রকম বর্বরভাবে বেঁধে রেখে গেছে?

কেউ তা জানে না।

থমথমে মুখে চলে এলেন নিজের চেম্বারে। ফোন করলেন থানায়।

দারোগা অট্টহাস আয়েঙ্গারের ঘরে বসেছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সে ব্যাঙ্গালোরে এসেছিল একটা কম্পিউটার কোম্পানির জোচ্চুরি ধরতে। কলকাতার স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজ কোম্পানিগুলোকে ঠকিয়ে যাচ্ছিল ভারতবিখ্যাত এই কোম্পানিটি। কারখানা খুলে বসেছে ব্যাঙ্গালোরে—আগে এই শহরের নাম ছিল 'গার্ডেন সিটি অফ ইণ্ডিয়া'। এখন নতুন নাম হয়েছে 'ইলেকট্রনিক সিটি অফ ইণ্ডিয়া'। এখানে বসে ভারত জোড়া ইলেকট্রনিক টুপি পরানোর কারবার চালিয়ে যাওয়া খুব সোজা।

ইন্দ্রনাথ কলকাতার সেই ছোট্ট কোম্পানিটিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। দেনার দায়ে আর বাড়ি বিক্রি করতে হবে না।

অট্টহাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে বন্ধুত্ব ডিটেকটিভ লাইনে থাকার দরুণ। কলকাতার সেন্ট্রাল ডিটেকডিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময়ে চুটিয়ে আড্ডা মারতেন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। উদ্দেশ্যটা ছিল মহৎ। বাংলা ভাষা ঝালিয়ে নেওয়া। অট্টহাসের মা ছিলেন বীরভূমের অট্টহাস শক্তিপীঠের মেয়ে। মা হওয়ার পাঁচ বছর পর দেহ রাখেন। তাই, ব্যাঙ্গালোরের কাজ শেষ করে ব্যাচেলর গোয়েন্দা এল ব্যাচেলর পুলিশ অফিসারের কোয়ার্টারে—হ্যমপনকাট্টার কাছেই। যেদিন এল, তারপরের দিন সকালেই শুনল ম্যাডাম চায়না চাকীর কাহিনি।

সবশেষে 'অট্টহাস বললেন—'খুবই মর্মন্তুদ মৃত্যু। ম্যাডামের বাঙালিপ্রীতি ছিল অসাধারণ। কুবের হসপিটালের সমস্ত স্টাফ বাঙালি। ডাক্তার থেকে নার্স পর্যন্ত। অথচ, তাঁর মৃত্যু হলো বাঙালিদেরই হাতে। ডেডবডির অসম্মানও করল হসপিটাল স্টাফ—বাঙালি।'

'বাঙালি জাতটা খুব পরশ্রীকাতর,' বলল ইন্দ্রনাথ—'ম্যাডাম অত উপকার করতে গেছিলেন বলেই এই ঘটনা ঘটল। তোমার কি মনে হয় অট্টহাস? ন্যাচারাল ডেথ, না, মার্ডার?'

'মার্ডার বলেই তো মনে হয় আমার। অটোপ্সি করলেই ধরা পড়বে।'

'ম্যাঙ্গালোরে সে ব্যবস্থা আছে?'

'নেই। ব্যাঙ্গালোরে বডি চলে যাচ্ছে এখুনি—ম্যাডামেরই প্রাইভেট প্লেনে। পুষ্পক রথে।'

চুপ করে রইল ইন্দ্র। তারপর বললে—'মার্ডার কেন?'

'ডাঃ খাস্তগীর জানালেন, এপিনেফ্রিন ইঞ্জেকশনটা মাপা ডোজে অ্যাম্পুলে থাকে। নিরাপদ মাত্রায়। বেশি দিলে তবে হার্ট অ্যাফেক্টেড হয়। এপিনেফ্রিন ছাড়া ম্যাডাম সুস্থ থাকতেন না। ডোজেজ উনি নিজেও জানতেন। বেশিমাত্রায় দিলে যে হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে, তা জানতেন। সুতরাং, পরের পর অ্যাম্পুল থেকে কেউ ইঞ্জেকশন দিতে গেলে ইনি বাধা দিতেন।'

'এপিনেফ্রিন দিয়েই যে তাঁকে মার্ডার করা হয়েছে, এই কনক্লুশনে আসছেন কেন ডাঃ খাস্তগীর?'

'হসপিটালের সুনাম বজায় রাখার জন্যে। রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরবে একটু পরেই। উনি আসল ব্যাপারটা জানতে চান। অটোপ্সি না করলে তাঁকে রেহাই দেওয়া হবে না। ম্যাডাম চায়না চাকী ইজ আ নেম ইন এনটায়ার মাইশোর স্টেট। তাঁর ডেডবডি নিয়ে কে এই নোংরামি করেছে, এটাও পাবলিককে জানানো দরকার। এই হসপিটাল তৈরিই হয়েছে তো ওঁর টাকায়।'

'স্যাড, ভেরি স্যাড।' বলল ইন্দ্রনাথ।

ব্যাঙ্গালোর দ্রুত নাম করেছে ইণ্ডিয়ায়। অকারণে নয়। এ-ওয়ান-সিটি করার দাবিও উঠেছে। দাবিটাও অহেতুক নয়। কলকাতায় শব ব্যবচ্ছেদ করানোর অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না ব্যাঙ্গালোরের পোস্টমর্টেম করার স্পীড। 'পুষ্পক' থেকে ডেডবডি লাশ কাটা টেবিলে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কাটাকুটি।

রিপোর্ট নিয়ে 'পুষ্পক' ফিরে এল ম্যাঙ্গালোরে। ইতিমধ্যে...

সাত সকালেই ইন্দ্রনাথকে নিয়ে কুবের হসপিটালে পৌঁছে গেলেন অট্টহাস আয়েঙ্গার।

কুবের স্ট্যাচুর সামনেই পার্কিং স্পেশ। পুলিশ জীপ থেকে নামতে নামতে বললেন—'হে বন্ধু নয়ন সার্থক করো।'

পায়ে পায়ে স্ট্যাচুর দিকে এগিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। বিশাল মূর্তি। প্রকৃতই কুৎসিত। দেখলে শুধু ভয় নয়, সম্ভ্রমবোধও জাগে। এত বড় পাথরের মূর্তি—উচ্চতায় বারো ফুট তো বটেই, অথচ অসাধারণ। যেন চিতার ক্ষিপ্রতা ঠিকরে বেরচ্ছে তিনটে পা থেকে—আটখানা দাঁতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রবল প্রতাপের ইশারা, এই বুঝি কিলবিলিয়ে নড়ে উঠবে তিন-তিনটে পা একই সঙ্গে—একই সঙ্গে দাঁতের বাদ্যি বেজে উঠবে আটখানা দাঁতের দংষ্ট্রা বিকাশের মুহূর্তে। ঝিলিক মারবে মাথার মুকুট—ঘুরে যাবে একটি মাত্র পিঙ্গল চক্ষু—অপর চোখটি তো দগ্ধ। তপস্যার সময়ে দেবীরুদ্রানীকে দেখেছিলেন হিমালয়ে—চোখ তো যাবেই।

কিন্তু, প্রাণময় মহাচঞ্চল একটা সত্তাকে যেন সহসা বেঁধে ফেলা হয়েছে পাথরের বুকে। ভাস্কর নিজেই বুঝি দেবপুরুষ—নইলে কঠিন শিলার বুকে এমন প্রাণের স্পন্দন জাগাতে পারতেন না।

ইন্দ্রনাথ গোয়েন্দাগিরিকে বেছে নিয়েছে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পাবে বলে—দুরূহ ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে এই প্রফেশনে নিত্যনতুন ছকের কিস্তিমাতের কথা মাথায় আনতে হয়—বাঁধাধরা গদ্যময় জীবনে সেই চ্যালেঞ্জ কোথায়? মনের মধ্যেও তাই খেলে কবিতার ছন্দ, চোখের তারায় ভাসে কবিতার

কথা। মুখের ভাবে কাব্য সুষমা। হিরো ও এই সব কারণেই। পোশাকে-আশাকেও খাঁটি বাঙালি। ধুতি পাঞ্জাবির আদর্শ মডেল বলা চলে তাকে।

ওর জীবনের আদর্শই হলো, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

কুবের মূর্তির দিকে অনিমেষে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর তাই বলেছিল—'এ মূর্তির ভাস্কর কে?'

মুচকি হেসে অট্টহাস বললেন—'রতনে রতন চিনেছে। হে বন্ধু, বিষয়টা নিয়ে আমিও ভেবেছি। কিছু গোয়েন্দার গবেষণাও করেছি।'

'গোয়েন্দা-গবেষণা।'

'জী হ্যাঁ। আশ্চর্য এই মূর্তি ভিসুয়ালাইজ করার ক্ষমতা এই যুগের কোনও ভাস্করের আছে কিনা—গবেষণাটা তাই নিয়ে।'

'যথার্থ বিষয়। খট্‌কা লেগেছে আমারও। তারপর?'

'তারপর গোয়েন্দাগিরি আর গবেষণা একই সঙ্গে চালালাম। এই চাকরির দৌলতে ভারতের মেগাসিটিগুলোর অনেককেই চিনি। কুবের মূর্তি কেউ গড়েন নি। তবে হ্যাঁ, এরকম একটা মূর্তি পাওয়া গেছিল বটে পাহাড় রাজ্যে। মার্কারার অত্যন্ত দুর্গম একটা পাহাড়ি জায়গায়। সেখানে যাওয়ার কোন পথ নেই। সেখানে দোতলা-তিনতলা সমান অতিকায় পাথরের বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে সাতটা আগুনের শিখা আজও লকলক করে জিভ দেখায়। আজও নাকি সেই পাথর আর বোল্ডার সরালে মাটির তলায় যক্ষরাজের রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু পাহারা দিচ্ছে ওই আগুন। স্থান অপবিত্র করতে যে যাবে, তাকে মরতেই হবে। দুঃসাহসটা দেখিয়েছিলেন এক নারী। তাঁর নাম ম্যাডাম চায়না চার্কী।'

'স্ট্রেঞ্জ।'

'মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড, এই মাইশোর স্টেটে এমনি অনেক স্ট্রেঞ্জ মিস্ট্রি রয়ে গেছে আজও। ম্যাডামের স্বামী অকারণে পাহাড়ঘেরা অঞ্চলটা কিনে নেন নি। তিনিও শুনেছিলেন কিংবদন্তি। কুয়াশা সেখানে সবসময়ে বিরাজ করে, দলে দলে মেঘ ভেসে যায় পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেতে খেতে। এইখানে ম্যামথগুহার মতন এক বিশাল গুহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল এই কুবের বিগ্রহ।'

'বিগ্রহ?'

'ইয়েস মাই ফ্রেণ্ড। কুবের কি উপাস্য হতে পারেন না? ম্যাডাম চায়না চার্কী কারও অভিসম্পাতের ধার ধারেন নি। মূর্তি তুলে এনে বসিয়েছিলেন হাসপাতালে—দেখুন টুরিস্টরা—পাহাড়ের নৈরাজ্যে আগুন প্রহরীদের আতঙ্কের মধ্যে মেঘ বাহিনীর অদ্ভুত আঁধারে এমন মূর্তি কে দেখতে যাবে? ভাল কাজ করেননি?'

'অবশ্যই করেছেন। কিন্তু অভিসম্পাত এড়াতে পারলেন না।'

গুম হয়ে গেলেন আয়েঙ্গার। মন তরঙ্গময় হলেই টেকো মাথায় হস্তসঞ্চালন করা তাঁর একটা মুদ্রাদোষ। যদিও তাঁর বয়স এমন কিছু নয়। মাথাতেও টাক

তেমন জায়গা এখনও জবরদখল করতে পারে নি। সামনের দিকে চুল পাতলা হয়েছে—টাক যে আসন্ন তা বোঝা যাচ্ছে। তিনি নিজে সেটা বেশি বুঝেছেন। তাই মন চঞ্চল হলেই চুল গুণে দেখেন, আর কদ্দিন দেরি।

চুল অপ্রতুল বলে তিনি অসুন্দর নন। রীতিমত হ্যাণ্ডসাম। পাক্কা ছ'ফুট হাইট। গৌরবর্ণ। চোখ-মুখ কাটা-কাটা। গোটা বডিটা বুঝি কামারশালায় পিটোনো। প্রত্যুষে ব্যায়াম করা তাঁর একটা বদভ্যেস। পাঁচজনের কাছে সাফাই দেন—পুলিশের চাকরি, এক্সারসাইজ তো করতেই হবে। নিকটজনেরা অবশ্য জানে, অট্টহাস আয়েঙ্গার বডি ঠিক রাখেন ভাবী বউয়ের কাছে বাহাদুরি নেবেন বলে। বিয়ে করার শখ তাঁর প্রবল মাত্রায়—কিন্তু পার্টনার আর পাচ্ছেন না। পার্টনার কি রকম হওয়া উচিত সে ব্যাপারে মনে মনে ভেবে রেখেছেন। কুমোরটুলিতে অর্ডার দিয়ে একটা মারকাটারি নারীমূর্তি কিনে এনে নিজের শোবার ঘরে রেখেছেন। কলকাতার এক বইমেলায় তিনি এই নারীমূর্তি দেখেছিলেন। বন্দিনী-নির্যাতিতা সেই রমণীর দুই হাত শৃঙ্খলাবদ্ধ। চোখে জল। নতজানু হয়ে বসে স্বল্পাবাস সেই সুন্দরী মুক্তি প্রার্থনা করছে। হুবহু এই মূর্তি তিনি শিল্পীকে দিয়ে গড়িয়ে এনে রেখেছেন শয়নকক্ষে। কিন্তু আজও সেই নির্যাতিতা সুন্দরীর মতো সুন্দরীর সন্ধান পান নি।

এসব বৃত্তান্ত ইন্দ্রনাথ জানে। বিয়ে পাগলা বন্ধুর পেছনেও লাগে। ক্লিষ্ট হেসে অট্টহাস শুধু বলে—'এ জীবনে আমার বউ জুটবে না। পুলিশকে কেউ মেয়ে দেয় না। পুলিশের চাকরিতে পয়সা নেই—অভিশাপ আছে।'

ঠিক এই কথাটাই কুবের হসপিটালের পার্কিং স্পেশে অট্টহাসকে স্মরণ করিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ—'অভিশাপ জিনিষটা তাহলে পাথরের মূর্তিও দিতে পারে?'

ফুঁসে উঠলেন অট্টহাস—'ওই মাটির মূর্তির অভিশাপের জন্যেই তো বউ পাচ্ছি না। ওটাকে এবার বিদেয় করব।'

'তোমার বউই বিদেয় করবে।'

'আর বউ।' সখেদে পাতলা চুলে ফের হাত বুলোলেন অট্টহাস 'পরচুলা পরলে যদি বউ আসে।'

'আসবে, আসবে,' সান্ত্বনা দিল ইন্দ্রনাথ—'ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী চায়না চাকীর মৃত্যুরহস্য ভেদ করতে পারলেই বউ খুঁজে পাবে।'

'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

ইন্দ্রনাথ বোধহয় বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। তা না হলে...

ডক্টর সবুজ সেন পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছিলেন নিজের ঘরে। কোটপ্যাণ্ট পরেই। পায়ের জুতো পায়েতেই রয়েছে।

নিঃসাড় নিদ্রা। যেন একটা মড়া।

মুখ ফিরিয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে। ঘাড়ের পাশ দরজা থেকে দেখা

যাচ্ছে। বড়সড় অপারেশনের জুড়ে যাওয়া দগদগে ক্ষতচিহ্ন। মাংস-চামড়া দলা পাকিয়ে গুটিয়ে গেছে।

দরজার কাছে সেই দৃশ্য দেখছেন অট্টহাস আয়েঙ্গার। পাশে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

পাল্লায় নক করলেন পুলিশ অফিসার। নিদ্রা রইল অটুট। হাঁক দিলেন গলা চড়িয়ে—'ডক্টর সেন।'

সাড়া নেই।

'কুম্ভকর্ণ নাকি?' বললেন ইন্দ্রনাথ।

দীর্ঘ পদক্ষেপে খাটের পাশে হাজির হলেন অট্টহাস। ডাক্তারের বাহুমূল খামচে ধরে কানের কাছে গলা নিয়ে গিয়ে ছাড়লেন পুলিশি হুঙ্কার—'ডক্টর সেন! ডক্টর সেন!'

অতি কষ্টে চোখ মেললেন ডক্টর সবুজ সেন। ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইলেন সাদা দেওয়ালের দিকে। চিৎ হলেন আস্তে আস্তে। মুখের কাছে পুলিশি চাহনি দেখেই কেটে গেল চোখের আঁবিলতা। ধড়মড় করে উঠে বসলেন—'হু ইউ?'

'বাংলায় জবাব দিচ্ছি,' অকস্মাৎ বিনয়ের অবতার হয়ে গেলেন অট্টহাস—'আমার ড্রেস জবাব দিচ্ছে আপনার প্রশ্নের। ম্যাঙ্গালোর পুলিশ স্টেশনের অফিসার ইন চিফ—অট্টহাস আয়েঙ্গার। আর ইনি,' ইন্দ্রনাথকে দেখিয়ে—'প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

সবুজ সেনের ঘোর কেটে গেল পুরোপুরি। বিলক্ষণ অপ্রস্তুত। খাট ছেড়ে নামতে নামতে চেয়ার দেখিয়ে জড়ানো ভারি গলায় বললেন—'বুঝেছি। বসুন।'

কিন্তু কেউই বসলেন না। দাঁড়িয়ে তিনজনেই। মুখোমুখি। এক ত্রিভুজের তিন কোণের পয়েন্টে।

সকৌতুকে বললেন ইন্দ্রনাথ—'ডেথ সার্টিফিকেট লিখে এমন ঘুম?'

সবুজ সেন নিরুত্তর। হাসবার চেষ্টাও করলেন না।

অট্টহাসের প্রশ্ন—'ম্যাডাম চাকীর ডেডবডি নিয়ে এই ধরনের অশালীন আচরণ কার দ্বারা সম্ভব, ডক্টর সেন?'

চোখে চোখে চেয়ে বললেন সবুজ সেন—'ম্যাডামের ওপর তার রাগ ছিল মনে মনে।'

'সে কে?'

'আপনারা তদন্ত করে দেখুন।'

'ও,' একটু থমকে গেলেন অট্টহাস। তাঁর কণ্ঠস্বরে এখন ধাতব কাঠিন্য। 'তাহলে আপনাকে দিয়েই তদন্ত শুরু করা যাক।'

'করুন।'

'ম্যাডামের মৃত্যু কি স্বাভাবিক?'

'অস্বাভাবিক।'

'কেন?'

'এপিনেফ্রিন ইঞ্জেকশন তাঁকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়া হয়েছে—চামড়ার ঠিক

নিচে। ছুঁচের দাগগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় পুরোনো হয়েছে। অর্থাৎ একটা করে অ্যাম্পুলই ফোঁড়া হয়েছে। তাতে তাঁর আরও সুস্থ হয়ে ওঠার কথা।'

'তাহলে মারা গেলেন কেন?'

'আমার তো মনে হয়, লিদ্যাল ডোজে, আই মীন, মারণ ডোজে এপিনেফ্রিন দেওয়া হয়েছিল।'

'অনেকগুলো অ্যাম্পুল একসঙ্গে? না, পর পর?'

'দেখুন, পর পর দিতে গেলে উনি বাধা দিতেন। চেঁচাতেন। নাইট ডিউটির স্টাফ তা শুনতে পায় নি। তাছাড়া, অনেকগুলো ছুঁচ ফোটানোর দাগও থাকত—তাও নেই। মানে, একই সঙ্গে অনেক ইঞ্জেকশনের চিহ্ন নেই। অস্বাভাবিক সম্ভাবনাটা তাহলে বলেই ফেলি?'

'এক্সট্রিমলি কনসেনট্রেটেড সলিউশন অফ এপিনেফ্রিন?' আস্তে বলল ইন্দ্রনাথ।

'এগজ্যাক্টলি'। সবুজ সেন এখন চোখ রেখেছেন ইন্দ্রনাথের স্বপ্নালু চোখের ওপর—'কিন্তু মিস্ট্রিটা সেইখানেই। ওই জিনিস আমরা রাখি না—শুধু অ্যাম্পুল থাকে—সেফ ডোজের।'

'তাহলে তো বলতে হবে, মৃত্যু হয়েছে অন্য কারণে।' অট্টহাসের প্রশ্ন—'কারণটা আপনি আন্দাজ করতে পারেন?'

'না।'

'ডেথ সার্টিফিকেট লিখেই মড়ার মতন ঘুমিয়ে পড়লেন কেন?' প্রশ্ন তো নয়, যেন বুলেট ছুঁড়লেন অট্টহাস।

পাল্টা বুলেট ছুঁড়ে জবাব দিলেন সবুজ সেন—'যন্ত্রণা কমানোর জন্যে।'

'ঘাড়ের যন্ত্রণা?'

'ঘাড় থেকে সমস্ত শরীরে।'

'কি হয়েছিল ঘাড়ে?'

'টিউমার। ক্যানসার।'

কর্কট রোগটা প্রকৃতই ভীতি সঞ্চারক। দুঁদে অফিসার অট্টহাসও একটু থমকে গেলেন। এর পরের প্রশ্নমালা বিছোলেন যখন, সুর অনেক নরম হয়ে গেছে।

'সেরে তো গেছে?'

'অপারেশন সাকসেসফুল। বাট—'

'বাট?'

'আই উইল ডাই।'

'এটা আপনার হতাশা।'

নিবিড় হলো সবুজ সেনের দুই চোখ—'আমি ডাক্তার। আমি জানি আমি বাঁচব না।'

নরম গলায় বললে ইন্দ্রনাথ—'যন্ত্রণা প্রায়ই হয়?'

'হ্যাঁ।'

'যন্ত্রণা কমান ঘুমিয়ে? ওষুধ নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'কি ওষুধ?'

'অপারেশনের পর নিতাম ডেমেরল। পাওয়াই যায় না এখানে। এখন নিই বেনাড্রিল ইঞ্জেকশন।'

'ইঞ্জেকশন?'

'জোগাড় করতে হয়,' হাসবার চেষ্টা করলেন সবুজ সেন।

'ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে গেছেন?'

'মরতেই যখন হবে—'

'অন ডিউটি এটা কি ঠিক?'

'ঠিক বেঠিকের বাইরে চলে গেছি।'

'আপনি ম্যারেড?'

'না।'

'কাউকে হৃদয় দিয়েছেন মনে হচ্ছে? ব্যর্থতা? রাগ করবেন না, প্লীজ।'

'হ্যাঁ,' দিয়েছি। তাকে পাবো না। ক্যানসার যার হয়েছে, সে অচ্ছুত।'

'সরি, 'ইন্দ্রনাথের স্বরে শুধু নয়, চোখেও বেদনা। 'আমাকে বন্ধু হিসাবে নিন, যদি পারেন। আপনার কষ্টের কিছুটা আমাকে দিয়ে হাল্কা হয়ে যান।'

'আর কি জানতে চান?'

'এই কেস সম্পর্কিত কিছু নয়। আপনার ওল্ড ফ্লেম-এর নামটা জানতে পারি? ঠিকানা?'

'জেনে কি করবেন?'

'দেখা করব। বলব, নারী হয়ে পুরুষকে কষ্ট দিয়ে কি আনন্দ পান?'

অপলকে ইন্দ্রনাথের বেদনাঘন চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন সবুজ সেন—'তার নাম ফিরোজা সুলতানা। ঠিকানা এই হসপিটালে। স্টাফ নার্স। কাল নাইট ডিউটিতে ছিল। ম্যাডামের কেবিনের চার্জে ছিল। তার কাছে আপনাদের যেতেই হবে। প্লীজ, আমার সম্পর্কে কিছু বলবেন না। লেট মি ডাই পিসফুলি।'

'টেক রেস্ট।' ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুই বন্ধু।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন অট্টহাস—'কোনও ফ্যানাটিক হিন্দুর রাগ থাকতে পারে ম্যাডামের ওপর। কুবের বিগ্রহ সরিয়ে এনে খেপিয়েছিলেন অনেককে।'

'সে রকম কেউ কাল রাতে ম্যাডামের ঘরে হানা দিয়েছিল কিনা বলতে পারবে নাইট ডিউটির নার্স ফিরোজা সুলতানা।'

কিন্তু ফিরোজা ডিউটি-অন্তে গেছেন কোয়ার্টারে।

এদিকে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এসে গেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে। থানার লোক চলে এসেছে হসপিটালে। সবুজ সেনের সন্দেহ সঠিক। অতিরিক্ত

মাত্রায় এপিনেফ্রিন দেওয়া হয়েছিল ম্যাডামকে। রক্তসংবহ তন্ত্র ফেটে পড়েছে রক্তচাপে।

ডক্টর খাস্তগীর তাঁর চেম্বারে বসেই রিপোর্ট শুনলেন। বললেন—'ডক্টর সবুজ সেন বলেছেন হাই কনসেনট্রেশনের এপিনেফ্রিন হসপিটালে থাকে না?'

'তাই তো বললেন,' অট্টহাসের জবাব।

'ঠিক বলেন নি।' গুম হয়ে গেলেন ডক্টর খাস্তগীর—'এক বোতল রাখা হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাতলা সলিউশন বানিয়ে পেসেণ্টকে শোঁকানোর জন্যে।'

'কোথায় আছে বোতলটা?'

'ডক্টর সবুজ সেনের জিম্মায়।' চোখ নামিয়ে বললেন ডক্টর খাস্তগীর। কাঁচের গোল পেপারওয়েট ঘোরাচ্ছেন ডান হাতে—'যে স্টীল আলমারিতে থাকে, তার চাবি থাকে ডক্টর সবুজ সেনের কাছে।'

অট্টহাস হতভম্ব। ইন্দ্রনাথ নিথর।

দরজা ভেজিয়ে রেখে ফের ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ডক্টর সবুজ সেন। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। যেন মড়া।

চিৎ করে শুইয়ে দিলেন অট্টহাস—এবার ডাকাডাকি নয়।

দুচোখ খোলা ডাক্তারের। নিষ্প্রাণ চাহনি।

স্পন্দন নেই নাড়িতে।

'সুইসাইড নাকি?' ভুরু কুঁচকে গেছে অট্টহাসের।

'আর একটা ময়না তদন্ত হোক।' শক্ত ঠোঁট ইন্দ্রনাথ—'তার আগে খোঁজা যাক স্টীল আলমারি, যার মধ্যে আছে এপিনেফ্রিনের বোতল।'

স্টীল আলমারি পাওয়া গেল মেডিসিন রুমে। চাবি নিয়ে আসা হল ডক্টর সবুজ সেনের ঘরের টেবিল-ড্রয়ার থেকে। পাওয়া গেল না শুধু এপিনেফ্রিনের বোতল।

'অতঃপর?' অট্টহাসের প্রশ্ন ইন্দ্রনাথকে।

দুই হাতে পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে পাল্লা খোলা আলমারির দিকে চেয়েছিল ইন্দ্রনাথ। দুই ভুরু ঘনসন্নিবদ্ধ।

বললে—'মার্ডারারের ডাক্তারি সেন্স আছে। ইঞ্জেকশন দিতে জানে।'

পেছন থেকে বললেন ডক্টর খাস্তগীর—'মারণ ডোজে এপিনেফ্রিন ইঞ্জেকশন দিতে গেলে দশ সিসির সিরিঞ্জ চাই। আমরা রাখি শুধু দু সিসি আর পাঁচ সিসি-র ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ।'

ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ—'তাহলে এবার যাওয়া যাক ম্যাডামের কেবিনে।'

অ্যাটাচড্ বাথরুমে নোংরা ফেলার প্লাস্টিক পটে পাওয়া গেল দশ সিসি-র ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ।

সেই সঙ্গে একটা পাঁচ সিসি-র সিরিঞ্জ।

গন্ধ শুঁকলেন ডক্টর খাস্তগীর। দুটোরই।

বললেন থমথমে মুখে—'দশ সিসি-তে ছিল এপিনেফ্রিন—এক্সট্রিমলি কনসেনট্রেটেড।'

'পাঁচ সিসি-তে?' অট্টহাসের প্রশ্ন।

'বেনাড্রিল।' ঈষৎ হতচকিত ডক্টর খাস্তগীর—'ইঞ্জেকশন ফর্মে? কে নিয়েছিল?'

'ডক্টর সবুজ সেন,' ভারী গলায় বললেন অট্টহাস—'দেখা যাক খালি অ্যাম্পুল পাওয়া যায় কিনা?'

প্লাস্টিক পটে তাও পাওয়া গেল।

ইন্দ্রনাথ শূন্য চাহনি মেলে তাকিয়েছিল কমোডের ওপরদিকে—বন্ধ কাঁচের জানালার সামনের মোজেক তাকে বসানো একটা বোতল। ফিনাইলের লেবেল লাগানো।

ঘুরে দাঁড়ালো ডক্টর খাস্তগীরের দিকে—'সব কেবিনেই কি থাকে ফিনাইলের বোতল?'

'না তো,' বিমূঢ় স্বরে এল জবাব—'জমাদার সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। এখানে রেখে গেল কেন?'

'গন্ধটা শুঁকবেন?'

শুঁকলেন ডক্টর খাস্তগীর। রক্তহীন মুখে বললেন—'এটা ফিনাইল নয়। এপিনেফ্রিন। হাইলি কনসেনট্রেটেড।'

'ফিনাইলের বোতলে এপিনেফ্রিন,' স্বগতোক্তি করে গেল ইন্দ্রনাথ।

'ডাক্তারির অনেক কিছুই জানতে হয় নার্সদের। কাল নাইট ডিউটিতে এই কেবিনের চার্জে ছিলেন ফিরোজা সুলতানা—যাঁকে ভালবাসতেন জাস্ট প্রয়াত ডক্টর সবুজ সেন।'

'মাই গুডনেস,' চিকচিক করছে অট্টহাসের চোখ—'সি ইজ দা মার্ডারার। চাবি সরিয়েছে ডক্টর সেনের ঘর থেকে—টু ফিক্স হিম।'

ফিরোজা সুলতানা নাইট ডিউটি সেরে কোয়ার্টারে ফিরেই টয়লেটে ঢুকেছেন। দরজা খুলে আপ্যায়ন জানাল মস্তান আকৃতির এক যুবা পুরুষ। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। পরনে লুঙ্গি। চোখ লাল। গাত্রবর্ণ মসীকৃষ্ণ। চোখ দেখেই মনে হয়, লোক ভাল নয়। নাম, আবু হাসান। পুলিশ অফিসারকে সবাই খাতির করে। অট্টহাসও পেলেন। ইন্দ্রনাথকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না আবু হাসান। শুধু চেয়ার দেখিয়ে দিল।

বললে—'বসুন, খবর দিচ্ছি।'

করিডর ধরে চলে গেল ফ্ল্যাটের পেছন দিকে। গলা নামিয়ে কি যেন বললে টয়লেটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। নারীকণ্ঠের অস্পষ্ট জবাব শোনা গেল। খোলা কলও বন্ধ হল তখুনি।

ফিরে এল আবু হাসান।

খাঁটি বাংলায় বললে ইন্দ্রনাথ—'বাংলায় কথা বললেন শুনলাম। আপনিও বাঙালি?'

'রাজাবাজারের,' বাইসেপ ফুলে উঠল আবু হাসানের।

'তাই বলুন।' মাখন ঝরছে ইন্দ্রনাথের গলায়—'কয়েকবছর আগে শুনেছিলাম আপনার নামডাক। মজিদ মস্তানের ডান হাত ছিলেন। তাই না? চেম্বার নিয়ে ঘুরতেন?'

লাল চোখে খুন চাপিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে আবু হাসান,—'কে আপনি?'

'আপনাদের লাইন থেকে বেলাইন করাটা আমার কাজ। নাম জেনে লাভ নেই। ফিরোজা সুলতানাকে বিয়ে করে এখানে লুকিয়ে আছেন?'

পায়ের আওয়াজ করিডরে। চোখ ঘুরে গেল তিনজনেরই। ঘরে পা দিলেন ফিরোজা সুলতানা।

ঘরে যেন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। খাটো চুল ভিজে। মুখে জলের বিন্দু। ল্যাভেণ্ডার রঙের শাড়ি ব্লাউজেও জলের ছিঁটে। ফর্সা মুখের ঈষৎ চৈনিক চোখে অপরিসীম স্নিগ্ধতা।

আর দৃঢ়তা।

দৃঢ়তা রয়েছে চিবুকেও। যেন পাথর কুঁদে গড়া।

মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিল ইন্দ্রনাথ। পাশ ফিরে দেখল। চোখের পাতা পড়ছে না অট্টহাস আয়েঙ্গারের।

হাতের ইঙ্গিতে একটা শূন্য চেয়ার দেখিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ—'বসুন।'

বসলেন অপরূপা। শরীর শক্ত।

কথা বললেন, কিন্তু তার-সানাইয়ের সুরে—'আপনিও বাঙালি?'

'আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ।' একটু চমকেছেন ফিরোজা।

বুকের খাঁচা ফুলে উঠেছে আবু হাসানের। সজোরে নিশ্বাস নেওয়ার শব্দও শোনা গেল—'টিকটিকি?'

চোখ ঘুরে গেল ফিরোজার—'ইউ শাট আপ।'

যেন একটা ধাক্কা খেল আবু হাসান। উঠে দাঁড়াল পরক্ষণেই। কামরাঙা চোখে আগুনের ঝলক—'খুবসুরৎ আদমি দেখেই গলে গেলি নাকি? বেশরম—'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন ফিরোজা। দুটো চোখ এখন পাথরের মতন শক্ত—'তোমার জুলুম অনেক সয়েছি। আর নয়। বেরিয়ে যাও—এখুনি। আর যেন মুখ দেখতে না পাই।'

মুঠো শক্ত করেছে আবু হাসান। ঠিকরে যেতে চাইছে ফিরোজার দিকে—কিন্তু অট্টহাস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোয় সামলাচ্ছে নিজেকে।

কাঠ চেরা গলায় বললেন অট্টহাস—'ম্যাডাম, হাজব্যাণ্ডকে তাড়াচ্ছেন কেন?'

ঠোঁট বেঁকে গেল ফিরোজার—'হি ইজ নট মাই হাজব্যাণ্ড।'

'দেন?'

'উই লিভ টুগেদার। আমাকে বাধা করা হয়েছে। নইলে আমার টুটিতে ক্ষুর চালাবে। কিন্তু আর আমি সইতে পারছি না।'

'কেন পারছেন না? ম্যাডামকে খুন করতে বাধা করেছে বলে?'

ভাবলেন ফিরোজা—অট্টহাসের চোখে চোখে চেয়ে—বললেন তারপর—'আমি খুন করিনি। কিন্তু এই খুনেটার হাত থেকে আমাকে বাঁচান। মিথ্যে মার্ডার চার্জে আমাকে আরও ব্ল্যাকমেল করবে।'

'খুনে?'

মিহি গলায় এতক্ষণ পরে কথা বলল ইন্দ্রনাথ—'খুন আর ডাকাতির চার্জে কলকাতার পুলিশ ওকে খুঁজছে—মজিদ মস্তানের রাইট হ্যাণ্ড।'

রিভলভার চলে এল অট্টহাসের হাতে—'ম্যাডামকে তুমিই খতম করেছ—ব্ল্যাকমেল করে এখানেই থাকবে—এই মতলবে?'

ফুলছে আবু হাসান। ফুলে ওঠে নাকের পাটা। মূর্তিমান যমদূত। রিভলভার না দেখলে নিশ্চয় ক্ষুর চালিয়ে দিত এতক্ষণে...

আবু হাসান এখন পুলিশ লকআপে।

ফিরোজা সুলতানার ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছে দুই বন্ধু।

ফিরোজা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দুই হাত কোলের ওপর রেখে বসে আছেন প্রতিমার মতন।

কেশে গলা সাফ করে নিলেন অট্টহাস—'কাল রাতে আপনি নাইট ডিউটি দিয়েছিলেন। দু-নম্বর কেবিনে ছিল আপনার চার্জ। অথচ ম্যাডাম খুন হলেন কি করে?'

'বলতে পারব না।' একটুও গলা কাঁপল না ফিরোজার।

'সন্দেহ কিন্তু আপনাকেই।'

'আমি নিরুপায়।'

অট্টহাসের মুখ দেখে বোঝা গেল তিনিই নিরুপায় হয়ে পড়েছেন। একটুও টলাতে পারেন নি পাথরপ্রতিম ফিরোজাকে। একটু যেন অসহায় চোখে চাইলেন ইন্দ্রনাথের দিকে।

ইন্দ্রনাথ প্রথমে একটু মুচকি হাসল।

বলল তারপর—'ফিরোজা সুলতানা নামটা খুব মিস্টি। আপনার বাইরেটাও মিস্টি, ভেতরটা ইস্পাত। তাই ডক্টর সবুজ সেন আপনার মন পেলেন না। আত্মহত্যা করলেন।'

ছাইয়ের মতন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন ফিরোজা—'আত্মহত্যা?'

'আপনি চলে আসার পরেই সুইসাইড করেছেন। নিশ্চয় জানতে পেরেছিলেন, নিশুতি রাতে আপনিই তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘর থেকে স্টীল আলমারির

চাবি সরিয়েছেন, এপিনেফ্রিনের বোতল সরিয়েছেন। তাই সুইসাইড করে দোষ কাঁধে নিয়ে আপনাকে আড়াল করতে চাইলেন। ব্যর্থ প্রেমিক নিজের জীবন দিয়ে আপনাকে বাঁচাতে চাইলেন।'

নিমেষে ফের শক্ত হয়ে গেলেন ফিরোজা—'আমার মোটিভ কী? কেন খুন করতে যাব ম্যাডামকে?'

একথার জবাব ইন্দ্রনাথের জানা নেই। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল অন্য খাতে।—'এই পৃথিবীর সজীব ব্ল্যাক হোল হলো নারী। বিজ্ঞানীরা কোন দিন জানতে পারবে না তাদের মনের রহস্য। তাদের এক চোখে ভাসে রহস্য কুয়াশা, আর এক চোখে সিরাজি। জটিল সিলিকন চিপ দিয়ে গড়া তাদের হৃদয় আর মগজ। পুরুষকে অকারণে ফালা ফালা করে পায় তারা বহুৎ আনন্দ—পুরুষ শুধুই দিয়েই যায়, যেমন দিয়ে গেলেন ডক্টর সবুজ সেন। যেমন দেবে আরও অনেকে,' বলে থামল ইন্দ্রনাথ। ফিরে চাইল অট্টহাসের দিকে।

সে ভদ্রলোকের দুই চক্ষু তখন গোল গোল হয়ে উঠেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে ঝিকিমিকি চোখে বললে ইন্দ্রনাথ—'এখন তো আপনি আপদমুক্ত। ঋণী থাকবেন আমার এই পুলিশবন্ধুর কাছে।'

চলন্ত জীপে খেঁকিয়ে উঠলেন অট্টহাস—'আমার বেডরুমে মৃণ্ময় মূর্তিটার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে ফিরোজা সুলতানার—একথাটা তোমায় বলে ভুল করেছিলাম।'

'কিছু ভুল করোনি, বন্ধু। তুমি মরেছ।'

'ডক্টর খাস্তগীর,' ইন্দ্রনাথ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল ডাক্তারের অফিস চেম্বারে পৌঁছেই—'স্টাফদের বায়োডাটা রাখেন নিশ্চয়?'

'রাখতেই হয়—অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে আসে।'

'আমাকে দেখাবেন?'

'আনিয়ে দিচ্ছি।'

ফাইল বন্ধ করে বললে ইন্দ্রনাথ—'জানা হয়ে গেছে। ডাকুন শাহজাহান হাফিজকে।'

'ওয়ার্ডবয়?'

'হ্যাঁ।'

নিরেট স্বাস্থ্য শাহজাহানের। পরনে ব্লু জিনস্ আর শার্ট। চওড়া কপাল আর চকচকে চোখ দেখে বোঝা যায় মগজে বস্তু আছে।

ইন্দ্রনাথ তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে প্রশ্ন-তীর নিক্ষেপ করে গেল এইভাবে ঃ

'তোমার অ্যাম্বিশন ডাক্তারি শেখা?'

'কে বলল?'

'তুমিই লিখেছ তোমার বায়োডাটায়।'

'হ্যাঁ। অ্যাম্বিশন থাকাটা দোষের নয়।'

'সেই অ্যাম্বিশন ফুলফিল করাটা ধর্মের পথে করা যায়, অধর্মের পথেও করা যায়।'

'অবশ্যই।'

'তোমার চেষ্টাটা হয়েছে অধর্মের পথে।'

'যেমন?'

'ডক্টর সবুজ সেন হসপিটালের ডিসিপ্লিন ব্রেক করে ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়েছিলেন। কাল রাতে ম্যাডাম চায়না চাকীর কেবিনের অ্যাটাচড্ টয়লেটে বেনাড্রিল ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন। ম্যাডাম তা দেখেছিলেন। ডিসিপ্লিন ব্রেক করার জন্য শাসিয়েছিলেন ডক্টর সবুজ সেনকে। বলেছিলেন, সকাল হলেই বলে দেবেন ডক্টর খাস্তগীরকে। সবুজ সেন কথাটা তোমাকে বলেছিলেন—কারণ,' বলে একটু থামল ইন্দ্রনাথ তারপর—'তুমি তাঁর বেনাড্রিল এনে দিতে, তুমি তাঁর টাকায় ইনফ্লুয়েন্সে ডাক্তারী শিখতে চেয়েছিলে—ম্যাডাম তোমাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন বলে ম্যাডামের ওপর তোমার রাগ ছিল। ডক্টর সবুজ সেনকে তিনি ফাঁসাতে চান জেনে রাত ভোর হওয়ার আগেই—'

থামল ইন্দ্রনাথ। চেয়ে রইল শাহজাহানের দিকে। তার গোটা শরীরটায় এখন শার্দুলের টান টান ভাব চলে এসেছে। চোখ পারার মতন পিছলে পিছলে যাচ্ছে ঘরের প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে। এখন বললে চাপা গলায়—'কে বলেছে?'

'ডক্টর সবুজ সেন। তারপর সুইসাইড করেছেন।'

'বাজে কথা। ইলেকশনের জন্য একটা পার্টি টাকা চেয়েছিল। পায়নি। তারাই ম্যাডামকে—'

'তারা কি করে জানবে কতটা এপিনেফ্রিন দিয়ে ম্যাডামকে মারতে গেলে দশ সিসি-র ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ লাগবে? এ জ্ঞান শুধু তোমারই আছে। ফিনাইলের যে বোতলে এপিনেফ্রিন ঢেলে রেখেছিলে, তাতে তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। দশ সিসি-র সিরিঞ্জেও তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট—'

যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল ঘরের মধ্যে। ইন্দ্রনাথের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসিটা ভালই চালিয়েছিল শক্তিমান শাহজাহান—

তবে সে জানত না, ইন্দ্রনাথের ধুতি-পাঞ্জাবির আড়ালে লুকিয়ে থাকে বাঘ আর বিদ্যুৎ।

'পুরো ব্লাফ মেরে গেলে?' শাহজাহানকে লকআপে ঢুকিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন অট্টহাস। তাঁর শিরদাঁড়া টনটন করছে। শাহজাহানের লাথি ঘুরে গিয়ে পিঠ দিয়ে সামলেছেন—লিভারে পড়লে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরিয়ে যেত।

নস্যগ্রহণ সমাপ্ত করে হৃষ্ট মুখে জবাব দিল ইন্দ্রনাথ—'কথায় সব হয়। মানুষ মারা যায়, মানুষ বাঁচানো যায়। বাকশক্তি দিয়ে বিশ্বজয় করা যায়। সম্ভাব্য সত্যি ভেবে নিয়ে বলেছি—মিথ্যে বলতে যাবো কেন?'

'বাকশক্তি।' ভাবিত হলেন অট্টহাস আয়েঙ্গার—'বাকশক্তি যাদের থাকে, তারা নাকি বাকসিদ্ধ হয়?'

'হয় নাকি?'

আড়মোড়া ভাঙলেন। ককিয়ে উঠলেন শিরদাঁড়ায় লাগতেই। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন—'যাই একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

'ফিরোজা হাওয়া।'

জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেলেন অট্টহাস।